মাসুদ রানা
মায়ান ট্রেজার
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মায়ান ট্রেজার

প্রাচীন একটা অ্যান্টিক গোল্ড ট্রে বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিগুয়েল বয়কট ওর খুন হয়ে গেল চোখের সামনেই। বন্ধু কেন খুন হলো জানার জন্যে লন্ডন থেকে একটা ট্রেইল ধরে মেক্সিকোর ইউকাটান-এ পৌঁছুল রানা।

কিন্তু গভীর অরণ্যে লুকানো আছে অনেক অজানা রহস্য। এক সময় রানা একেবারে একা হয়ে গেল।

ISBN 984-16-7624-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
MAYAN TREASURE

JANMOBHOOMI
Two Thriller novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একান্ন টাকা

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

বিনা অনুমতিতে
সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

মায়ান ট্রেজার

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

বলা নেই কওয়া নেই, অপ্রত্যাশিতভাবে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা দেড় মাসের লম্বা এক ছুটি দিয়েছে রানাকে। ছুটি পেয়ে ইংল্যান্ডে চলে এসেছে, কিন্তু এখনও ঠিক করতে পারেনি কোথায় যাবে বা কি করবে। এই মুহূর্তে রানা এজেন্সির একটা শাখা অফিসে রয়েছে ও। রিজেন্টস্ পার্কের কাছাকাছি লন্ডনের দ্বিতীয় শাখা এটা, অফিস কাম রেসিডেন্স। লন্ডনে এলে এখানে রানা একাই থাকে ও অফিস করে, ওকে সাহায্য করে প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরী। স্বাতী, পিয়ন কায়সুল আর গার্ড মোজাম্মেল, আনআর্মড কমব্যাটে তিনজনেরই ট্রেনিং নেয়া আছে। রানার অনুপস্থিতিতে এক নম্বর শাখায় ডিউটি দেয় ওরা। অত্যাধুনিক সিকিউরিটি ও অ্যালার্ম সিস্টেম ফিট করা আছে, তিনতলা বাড়িটায় কেউ ঢুকতে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি পুলিস স্টেশনে খবর পৌঁছে যাবে।

আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর লন্ডনের ছিঁচকাঁদুনে আকাশ দেখে মনটা তেতো হয়ে গেছে। তবু ওই বৃষ্টির মধ্যেই রিজেন্টস পার্কের ভেতর পাঁচ মাইল দৌড়েছে রানা। ফ্ল্যাটে ফিরে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে, অভ্যাসবশত সুটেড-বুটেড হয়ে ডাইনিং রুমে বসেছে স্বাতীর নিজের হাতে তৈরি নাস্তা খাবার জন্যে, তারপর কোন কাজ করার বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও ঠিক ন'টার সময় ফ্ল্যাট থেকে অফিস সেকশনে চলে এসে নিজের চেম্বারে বসেছে।

ঝকঝকে তকতকে চেম্বার, কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা শেষ বার দেখে নিয়ে বেরিয়ে যাবে স্বাতী, এই সময় রানা ভেতরে ঢুকল। সেন্টের মিষ্টি একটা গন্ধ দেহ-মনে ভাললাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিল, সেটা গোপন করার জন্যেই তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। পিছন থেকে আওয়াজ হলো, 'বৃষ্টি কি এখনও পড়ছে?'

চঞ্চলা হরিণী অকস্মাৎ থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে রানা, তারপর একটা জানালার দিকে তাকাল স্বাতী। ইতিমধ্যে ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসেছে রানা। 'দেখছি,' বলে ঘুরল স্বাতী, ধূসর কার্পেটের ওপর দিয়ে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে জানালার সামনে চলে এল, পর্দা সরিয়ে রাস্তা আর পার্কের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, টিপটিপ করে পড়ছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও,' বলে ডেস্কের ওপর পা তুলে দিল রানা।

ওকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল স্বাতী,

দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। সচেতন ভাবে কিছুই লক্ষ করেনি রানা, তবু স্বাতী চলে যাবার ত্রিশ সেকেন্ড পরও তার চলে যাবার দৃশ্যটা মন থেকে মুছে যাচ্ছে না দেখে বিস্মিত হলো—সরু কোমর, সুগঠিত পিঠ, গুরুনিতম্ব, সর্পিল বেণী। ভুরু কোঁচকাল রানা, দেরাজ খুলে ব্যক্তিগত নোটবুকটা বের করে লিখল, 'খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে স্বাতীর এখনও বিয়ে হচ্ছে না কেন।'

পাঁচ মিনিটও পেরোয়নি দরজা খুলে আবার ভেতরে ঢুকল স্বাতী। চেহারায় সামান্য অপ্রতিভ ভাব, খানিকটা সন্ত্রস্তও মনে হলো, হ্যান্ডব্যাগের ভেতর কজি ডুবে আছে। 'মাসুদ ভাই, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। যতই বলছি যে আজ দেখা হবে না…'

স্বাতীকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই চেম্বারে ঢুকে পড়ল লোকটা। স্যুটের ওপর রেইনকোট চড়িয়েছে, কলার দিয়ে মুখ আর কান প্রায় ঢাকা বলে প্রথমে রানা চিনতে পারল না। এক পলক তাকিয়েই কয়েকটা জিনিস খেয়াল করল ও। লোকটার হাতে কালো একটা ব্রীফকেস, হাতলের সঙ্গে আটকানো হ্যান্ডকাফ কব্জিতে লক করা। ডান হাতে চাবির একটা রিঙ। কার্পেটের ওপর পানি জমছে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসা স্বাতীর হাতে ছোট্ট রূপালি পিস্তলটা টিউবলাইটের আলোয় চকচক করছে।

'দোস্ত, সরি।' প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছে লোকটা। 'আমার খুব বিপদ, কাজেই এভাবে ঢুকতে হলো।'

গলার আওয়াজ চিনতে পেরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'মিশুয়েল? তুমি?' স্বাতীর দিকে তাকিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। পিস্তলটা হ্যান্ডব্যাগে ভরে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্বাতী। 'কেন, কি বিপদ?'

রেইনকোট থেকে এখনও পানি ঝরছে, কার্পেট ভিজিয়ে দিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল মিশুয়েল বয়কট, ডান হাতের রিঙটা ডেস্কের ওপর ফেলে জরুরী তাগাদার সুরে বলল, 'সব কথা পরে এসে বলব, আগে তুমি ব্রীফকেসটা খুলে জিনিসটা বের করো।'

'জিনিস? কি জিনিস?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে একবার তাকাল বয়কট। 'জলদি, রানা! প্লীজ! ওরা আমার পিছু নিয়েছিল, কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছেছি। জিনিসটা আপাতত তোমার কাছে থাক, পরে ফিরে এসে সব কথা বলব।' রানা ইতস্তত করছে দেখে ডেস্ক থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে নিজেই ব্রীফকেসের তালা খুলল সে। 'ওরা আমাকে এখনও খুঁজছে, চাই না আমার গাড়িটা ওরা দেখে ফেলুক।'

ব্রীফকেসের ঢাকনিটা হাত বাড়িয়ে রানাই খুলল। ভেতরে একটাই জিনিস রয়েছে, ব্রাউন পেপারে মোড়া। লম্বায় সেটা দুই ফুট হবে, চওড়ায় দেড় ফুট—চারকোনা। 'কি এটা? তার আগে বলো, তোমার বিপদটা কি? কারা তোমার পিছু নিয়েছে? এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, মিশুয়েল। বিপদের ভয় থাকলে এখানেই শান্ত হয়ে বসো, আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দেব।'

ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটটা ডেস্কের ওপর রেখে ব্রীফকেস বন্ধ করল

বয়কট। প্যাকেটে টোকা দিল সে, বলল, 'আমার চেয়ে এটার গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। জানি একমাত্র তোমার কাছেই নিরাপদে থাকবে, তাই রেখে যাচ্ছি। আজ বা কাল সুযোগ পেলেই আবার আসছি···' ব্রীফকেস নিয়ে ঘুরল সে, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে চেম্বার থেকে।

'এই, আশ্চর্য, থামো—মিগুয়েল, শোনো!' কিন্তু না, চিৎকার করেও বয়কটকে থামানো গেল না। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চারকোনা প্যাকেটটা হাতে নিল রানা। মোড়কটা খুলবে কি খুলবে না ভেবে ইতস্তত করছে ও। জিনিসটা কী, বলে যায়নি বয়কট। শুধু বলল, ওর পিছনে লোক লেগেছে। তার মানে জিনিসটা দামী কিছুই হবে। আরেকটা চিন্তার ডালপালা গজাবার আগেই জড় কেটে ফেলল রানা। বয়কট ওর বিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন। সে ওকে কোনও ফাঁদে ফেলতে পারে, এটা চিন্তা করা নিজেকে ছোট করার সামিল। প্যাকেটটা খুলবে স্রেফ কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

মোড়কটা খুলছে, বয়কটের সঙ্গে সম্পর্কটা মনে পড়ে গেল। পাঁচ বছর আগে একটা ইয়টিং প্রতিযোগিতায় ইংলিশ চ্যানেলে ওদের পরিচয়। পুরোটা সময় বয়কটের ইয়ট এগিয়ে ছিল। একেবারে শেষদিকে পাল সাজানোর কৌশল ও কেরামতি দেখিয়ে রানার চার্টার করা ইয়ট ওটাকে পিছনে ফেলে দেয়। অপ্রত্যাশিতভাবে ও অল্পের জন্যে হেরে গিয়ে বয়কট উপযাচক হয়ে ওর সঙ্গে পরিচিত হয়, কৌতুক করে বলে, 'কে হে ভুমি, বাঙালী হয়ে ইংরেজদের জাত মেরে দিলে? আমি মিগুয়েল বয়কট···'

'মাসুদ রানা। মিগুয়েল? তুমিও তো মনে হচ্ছে ইংরেজ নও—অন্তত খাঁটি নও।'

নয়, স্বীকার করেছিল বয়কট। ওদের পরিবার দেড়শো বছর আগে মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় চলে আসে, তারপর আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে। লন্ডনের উপকণ্ঠে বিশাল এস্টেট কেনে তারা, অভিজাত সমাজের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। প্রথম পরিচয়েই পরস্পরকে ভাল লেগে যায় ওদের। তারপর জানা গেল বয়কট টেনিস থেকে বিলিয়ার্ড, সব রকম খেলাতেই আগ্রহী—রানার মতই। রানা লন্ডনে এলেই খবর পায় বয়কট, টেলিফোনে কোন ক্লাব বা রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারার আমন্ত্রণ জানায়। লন্ডনে ওদের বাড়িতেও কয়েকবার গেছে রানা। সয়-সম্পত্তির কোন অভাব নেই, তবে পরিবারটি একেবারে ছোট—স্ত্রী আর ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে একাই থাকে সে। এস্টেট থেকে প্রচুর আয় হয়, শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসাও আছে। সৌখিন মানুষ, খেলাধুলো আর শখ-সাধ নিয়ে মেতে থাকে।

বয়কট চলে যাবার পর আধ মিনিটও পেরোয়নি, চেম্বারে ঢুকল স্বাতী। 'উনি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, আবার ছুটে বেরিয়েও গেলেন—কি ব্যাপার, মাসুদ ভাই?'

মোড়কটা খুলে জিনিসটা দেখছে রানা। পিতলের একটা ট্রে। এই ট্রে আগেও বয়কটের বাড়িতে দেখেছে ও, যতদূর মনে পড়ে কিচেনের একটা সেলফে রাখা ছিল। 'কি জানি, কিছুই তো বুঝলাম না। এটা রেখে গেছে. বলল

পরে এসে সব কথা…'

রানার কথা শেষ হয়নি, অকস্মাৎ একটা গাড়ি ব্রেক করায় কংক্রিটের সঙ্গে ঘষা খেলো টায়ার, কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠল শরীর। ট্রে-টা ছেড়ে দিয়ে এক ঝটকায় দেরাজ খুলল রানা, ডেস্কের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে কার্পেটে পড়ল, এক ছুটে চলে এল জানালার সামনে, হাতে একটা ওয়ালথার পিপিকে।

রাস্তার দু'দিকের ফুটপাথেই বেশ কয়েকজন পথিক দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকের মাথায় ছাতা। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, রাস্তার ওপারে, রেইলিং ঘেরা পার্কের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ রঙের একটা প্রাইভেট কার—টয়োটা। গাড়িটা চিনতে পারল রানা। বয়কটকেও দেখতে পেল, রাস্তা পেরিয়ে টয়োটার দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় আর মাত্র একটা গাড়ি, কালো রঙের মার্সিডিজ, বাঁক ঘুরে এইমাত্র পার্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাড়িটাকে দেখেই ছুটল বয়কট, তাড়াতাড়ি নিজের টয়োটার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করছে। আরেকবার তীব্র ব্রেক করল মার্সিডিজ, টায়ারের কর্কশ আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার, 'বয়কট, লাফ দিয়ে পার্কে ঢোকো!'

রানা এজেন্সির বিল্ডিং থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। ড্রাইভার নয়, নিচে নামল একজন আরোহী, হাতে একটা অটোমেটিক স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন্। রানার চিৎকার শুনতে পেয়েছে বয়কট, মুখ তুলে জানালার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল এক সেকেন্ড, তারপর কি মনে করে পার্কের দিকে না গিয়ে টয়োটার দরজা খোলার জন্যে হাতল ধরে টান দিল।

মার্সিডিজ থেকে নেমে আসা লোকটা দীর্ঘদেহী, কালো স্যুটের ওপর নীল রেইনকোট পরে আছে। লোকটা অটল পাহাড়ের মত, এক চুল নড়ছে না। মাত্র দশ হাত দূর থেকে হাত লম্বা করল সে, আচরণে কোন রকম ইতস্তত ভাব বা অস্থিরতা নেই, ভয় তো নেই-ই। পেশাদার খুনী, বুঝে নিল রানা। সে হাত লম্বা করতেই গুলি করল রানা; লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে জানে, এ-ও জানে যে পথিকরা কেউ আহত হতে পারে।

কোত্থেকে গুলি হয়েছে তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজনবোধ করল না লোকটা। ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানল সে। টয়োটার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে বয়কট। গুলিটা লাগল বাম শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচে, বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরুবার আগে হৃৎপিণ্ড ছাতু করে দেয়ার কথা।

রানার গুলি লোকটাকে লাগেনি। পথিকরা কেউ কেউ রাস্তায় ও ফুটপাথে শুয়ে পড়েছে। অসহায় আক্রোশে পরপর আরও দুটো গুলি করল রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল টয়োটায় অর্ধেক ঢুকে পড়া বয়কটের শরীর পিছলে নেমে এল রাস্তার ওপর।

আততায়ী এবার রানার দিকে একবার তাকাল। স্পষ্ট বোঝা গেল না, ঠোঁটে যেন বিদ্রূপাত্মক ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে। শান্ত অথচ দৃঢ় পায়ে বয়কটের দিকে এগোল সে, অটোমেটিকটা রেইনকোটের পকেটে রেখে

দিচ্ছে। ওই একই পকেট থেকে হাতে বেরিয়ে এল একটা ম্যাশেটি। লন্ডনের রাস্তায়, প্রকাশ্য দিবালোকে, এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না; রানার মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে। এত দূর থেকে গুলি করে লাভ নেই, বুঝতে পেরে ছুটল ও ছাতের সিঁড়ি লক্ষ্য করে। ছাদে উঠে এসে ছুটল ও। বয়কটের সামনে এসে ঝুঁকল লোকটা, মাথার ওপর ম্যাশেটি তুলে এক কোপে আলাদা করে ফেলল বয়কটের ডান হাত। খণ্ডিত হাত থেকে ব্রীফকেসটা বের করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে মার্সিডিজে। মার্সিডিজের কাছে পৌঁছে গেছে খুনী। দরজা খুলে মাথা নিচু করল ভেতরে ঢোকার জন্যে। গাড়িটার সরাসরি ওপরে এসে গেছে রানা, লক্ষ্যস্থির করে একটা মাত্র গুলি করল। টার্গেট খুব ছোট, খুনীর মাথাটা, লাগবে বলে আশা করেনি। ফলাফল দেখে বিস্ময় বোধ করল ও—লোকটার চাঁদি বিস্ফোরিত হয়েছে। ঠিক এই সময় বিল্ডিঙের ঠিক নিচে থেকে পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। মার্সিডিজের ভেতর থেকেও পাল্টা জবাব দেয়া হচ্ছে। কি ঘটছে বুঝতে পারল রানা। নিচে নেমে গেছে স্বাতী, সে আর গার্ড বিল্ডিঙের গেট থেকে গুলি করছে মার্সিডিজ লক্ষ্য করে। গাড়িটার পাশে পড়ে গেছে খুনী, হাত থেকে খসে পড়েছে বয়কটের ব্রীফকেসটাও। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত, ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হলো।

কানে চিৎকার-চেঁচামেচির অস্পষ্ট আওয়াজ, ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে এসে স্বাতীকে একপাশে ডেকে নিল রানা। 'ট্রে-টা ভল্টে তুলে রাখো,' নির্দেশ দিল ও। 'ওটার কথা কাউকে বলার দরকার নেই। পুলিসের সঙ্গে আমি কথা বলব। এক নম্বর শাখা থেকে তিনজন অপারেটরকে ডেকে নাও, পালা করে বাড়িটা পাহারা দেবে ওরা।'

ওয়ালথারটা পকেটে ভরে বিল্ডিঙ থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তা পেরিয়ে বয়কটকে পরীক্ষা করল। যা ভেবেছিল, তাই। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। খুনী হাত কেটেছে লাশের, বয়কট কোন ব্যথা পায়নি। খুনীর লাশটা পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল ও। চেহারাটা চেনা চেনা লাগতেই চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল।

পুলিস না আসা পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে বন্ধুর পাশে বসে থাকল রানা। ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়, পাথরের একটা মূর্তি বললেই হয়। কব্জিসহ কাটা হাতটা অশ্লীল লাগছিল, রুমাল দিয়ে সেটা ঢেকে দিয়েছে ও। আতঙ্কিত কয়েকজন পথিক দূর থেকে ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে।

পরবর্তী তিনটে দিন খুব ঝামেলা আর ব্যস্ততার মধ্যে কাটল রানার। প্রথম দিন ঘটনার বর্ণনা দিতে হলো পুলিসকে। স্থানীয় পুলিস স্টেশনের ইন্সপেক্টর জন ক্লিফোর্ড। রানা এজেন্সির সুখ্যাতি সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না। এই অফিস থেকে বয়কট বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়েছে, ব্যাপারটাকে রহস্যময় ও সন্দেহজনক বলে ঘোষণা করল সে। আকারে-ইঙ্গিতে বলতে

চেষ্টা করল খুনীরা বয়কটের হাত কেটে ব্রীফকেস নিয়ে যাওয়ার একটাই অর্থ করা যেতে পারে—রানার কাছ থেকে কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছিল বয়কট, সেটা নিশ্চয়ই কোন ড্রাগস হবারই বেশি সম্ভাবনা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেও, না বোঝার ভান করে চুপ করে থাকল রানা। পুলিসকে ঘটনার লিখিত বিবরণ দিল, তাতে ট্রে-টার কথা থাকল না। এ-ও লিখল না যে বয়কটের খুনীকে সে চিনতে পেরেছে।

পুলিসকে বিদায় করে দিয়ে প্রথমে বয়কটের স্ত্রী লুসি বয়কটকে ফোন করল রানা, তারপর ওদের বাড়িতে হাজির হলো। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গেও অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক ওর, ফোনে শুধু বলেছে—'অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে, মনটাকে তোমার শক্ত করতে হবে।' গাড়ি নিয়ে লন্ডনের উপকণ্ঠে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা সময় লাগল, বয়কটের বাড়িতে ঢুকে দেখে চাকর-বাকরদের চোখ ছলছল করছে। ড্রইং বা লিভিং রূমে নয়, লুসিকে পাওয়া গেল বেডরূমে—স্বামীর একটা বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে পাথুরে মূর্তির মত বসে আছে। দোরগোড়ায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ভেতরে ঢুকল না। লিভিং রূমে ফিরে এসে বাটলারকে প্রশ্ন করে জেনে নিল বয়কটের মেয়ে টুসি কোন বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। বাটলারই ওকে জানাল যে মিনিট বিশেক আগে ইন্সপেক্টর জন ক্লিফোর্ড টেলিফোনে মিসেস বয়কটকে দুঃসংবাদটা জানিয়েছে। ইন্সপেক্টর তার জবানবন্দী নেয়ার জন্যে আজই একবার আসতে চেয়েছিল, কিন্তু লুসি জানিয়ে দিয়েছে আজ বা আগামী কাল কারও সঙ্গেই সে কথা বলতে পারবে না।

বোর্ডিং স্কুল থেকে সাত বছরের ছোট্ট টুসিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল রানা। রানা আংকেল, বাটলার থেকে শুরু করে চাকর-বাকররা সবাই তাকে অতি মাত্রায় আদর করছে দেখে দিশেহারা বোধ করল বাচ্চা মেয়েটা, বারবার জানতে চাইল, 'আব্বু কোথায়? আম্মু কোথায়?' প্রৌঢ় বাটলার, এ-বাড়িতে ত্রিশ বছর ধরে কাজ করছে, টুসিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার আব্বু স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে চলে গেছেন, আর তাই তোমার আম্মু তাঁর জন্যে প্রার্থনা করছেন।' অবোধ শিশু কি বুঝল কে জানে, চোখ ভরা পানি নিয়ে বলল, 'আব্বুকে আমি দেখব।' বেডরূমে, মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। মাকে জড়িয়ে ধরে সেই একই কথা বারবার বলতে লাগল, 'আমাকে আব্বুর কাছে নিয়ে চলো।'

বেডরূমের দোরগোড়া থেকে সরে এসে মর্গে ফোন করল রানা। জানা গেল পোস্ট মর্টেমের কাজ শেষ হতে চলেছে, সনাক্তকরণের পর বয়কট পরিবার এক ঘণ্টার মধ্যে লাশ নিয়ে যেতে পারবে।

মা ও মেয়েকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে এক ঘণ্টা পর মর্গে এল রানা। পথে কোন কথা হলো না। স্বামীর লাশ সনাক্ত করার সময় একবার শুধু মাথা ঝাঁকাল লুসি, তারপর ছাপা একটা ফর্মে সই করে বেরিয়ে এল লাশকাটা ঘর থেকে। রানাই সব ব্যবস্থা করল, এস্টেট-এর কাছাকাছি একজন আন্ডারটেকারকে ফোন করতে লাশ গ্রহণের জন্যে নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিল

সে, আগামীকাল কবর দেয়ার সব আয়োজন তার কর্মচারীরাই করবে। আপাতত লাশ রাখা হবে কোল্ডস্টোরে।

মর্গ থেকে টুসি আর তার মাকে নিয়ে এস্টেটে ফিরল রানা। বেশ রাত পর্যন্ত বাড়িটায় থাকল ও, যতক্ষণ না টুসিকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে পারিবারিক ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে, তিনি লুসিকে পরীক্ষা করলেন ও অল্প কথায় সান্ত্বনা দিলেন। নিজের হাতে একজোড়া ঘুমের ট্যাবলেটও খাওয়ালেন। ডাক্তার তখনও বিদায় নেননি, লুসিকে রানা বলল, 'কাল সকালেই আবার আসছি আমি। আর তিনজন গার্ডকে রেখে যাচ্ছি, বাড়িটা ওরা পাহারা দেবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লুসি, কথা বলল না।

পরদিন সকালেই রানার অফিস কাম ফ্ল্যাটে হাজির হলো ইন্সপেক্টর জন ক্লিফোর্ড। আজ সে সরাসরি জেরা শুরু করল। বয়কটকে নিশ্চয়ই রানা কিছু দিয়েছিল—কি সেটা? বয়কটের খুনীকে সনাক্ত করা গেছে কিনা, রানার এই প্রশ্নে উত্তর এড়িয়ে জানতে চাইল, রানার সঙ্গে বয়কটের আর্থিক কোন লেনদেন ছিল কিনা। বিরক্তিকর জেরা চলছে, এই সময় একটা ফোন এল।

ফোন করেছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো। বয়কট কিভাবে কোথায় খুন হয়েছে, আজকের কাগজে তার বিবরণ পড়ে ফোন করছেন তিনি। বিএসএস-এর অনারারি উপদেষ্টা রানা, কাজেই ও কোন তিক্ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল কিনা ভেবে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কোন সাহায্য লাগবে কিনা।

জবাবে রানা বলল, 'শুধু এইটুকু সাহায্য করলেই হবে—কেসটা তদন্ত করবার দায়িত্ব এমন কাউকে দেয়া হোক, যে আমার পিছনে অযথা সময় নষ্ট করবে না।'

'আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি কেসটা যাতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চকে দেয়া হয়,' বললেন বিএসএস চীফ। 'তোমাকে ভাল করে চেনে, এমন কাউকে পাওয়া গেলে তাকেই ওরা পাঠাবে। ঠিক আছে?'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।' ফোন নামিয়ে রেখে ক্লিফোর্ডকে রানা বলল, 'আমি তো আর সময় দিতে পারি না, এখুনি আমাকে মিসেস লুসির ওখানে যেতে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, তৈরি থাকবেন, পরে আবার আসব আমি,' বলে চেয়ার ছাড়ল ইন্সপেক্টর।

'তার বোধহয় আর দরকার হবে না,' বলল রানা। 'কেসটা ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের হাতে চলে যাচ্ছে।'

বেলা দশটার মধ্যেই বয়কটের শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। এস্টেটের ভেতরই নিজেদের কবরস্থানে মাটি দেয়া হলো তাকে। কবরের পাশে যত্ন করে ফুলগাছের দুটো চারা পুঁতল টুসি। লুসির হাতে ছিল ফুলের একটা তোড়া,

সেটা সে কবরের মাথার কাছে আস্তে করে নামিয়ে রাখল। কৃষ্ণবসনা লুসি নিঃশব্দে কাঁদছে, কেউই তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছে না।

ফেরার পথে রানার একটা হাত ধরল টুসি। লুসি পিছিয়ে পড়েছিল, তার জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। তারপর এক সঙ্গে বাড়িতে ফিরল।

বাড়িতে ঢুকে নিজের বেডরুমে চলে গেল লুসি, দরজা বন্ধ করে একা একা কাঁদল কিছুক্ষণ। আধ ঘণ্টা পর বেরুল সে, রানা তখন লিভিং রুমে বসে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের তরুণ অফিসার ডেভিড ডুগার্ডের সঙ্গে কথা বলছে। বিএসএস চীফ তাঁর কথা রেখেছেন—ডেভিড ডুগার্ড রানাকে তো চেনেই, বয়কট পরিবারের সঙ্গেও তার ভাল পরিচয় আছে। দু'দিনের জন্যে লন্ডনের বাইরে ছিল সে, তাই এতবড় একটা দুঃসংবাদ শুনেও লুসিকে সান্ত্বনা দিতে আসতে পারেনি। আজ সকালে বাড়ি ফিরেছে সে, ফিরেই অফিস থেকে একটা ফোন পায়—ফোন মানে নির্দেশ, বয়কট হত্যাকাণ্ড তদন্ত করার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। দায়িত্বটা পেয়ে আর দেরি করেনি সে, কাপড় পাল্টেই চলে এসেছে। রানাকে এখানে পাবে বলে আন্দাজ করেছিল, সত্যি তাই পেয়েও গেছে।

লিখিত জবানবন্দীতে ট্রে-টার কথা উল্লেখ করা হয়নি, কারণটা ডুগার্ডকে ব্যাখ্যা করল রানা। বয়কট যে ট্রে-টার জন্যেই খুন হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যেই গোপন রাখা দরকার ওটা এখন কার কাছে বা কোথায় আছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, লন্ডনের লোকাল পুলিস স্টেশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে-কোন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। আরেকটা কারণ, বয়কটের খুনীকে রানা চিনতে পেরেছে। প্রথম দেখায় সন্দেহ হয়, তারপর কমপিউটরে অপরাধীদের তালিকা চেক করে নিশ্চিত হয়েছে। লোকটা আমেরিকান, নাম মিক নোয়ামি। মাফিয়া ডন ডায়নামো ডিকানডিয়ার পোষা কসাই সে, পেশাদার খুনী।

সমর্থনসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে ডুগার্ড বলল, 'আমরা সন্দেহ করছি মাফিয়া ডন ডিকানডিয়া নাম পাল্টে ইংল্যান্ডে এসেছে। তার ছদ্মনাম অনেকগুলো, তার মধ্যে একটা রয় হেনেস। এই নামে এক লোক হপ্তা দেড়েক আগে হিথরোতে নেমেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অর্থাৎ আমরা তাকে খুঁজছি।'

'রয় হেনেস?' মৃদুস্বরে এই প্রথম কথা বলল লুসি।

'কেন, নামটা তুমি আগে কখনও শুনেছ, লুসি?' জানতে চাইল রানা। 'বয়কটের মুখে?'

'গত পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে তিনজন আমেরিকান ওর সঙ্গে দেখা করে,' বলল লুসি। 'তার মধ্যে রয় হেনেস নামেও একজন ছিল।'

'তিনজন আমেরিকান দেখা করে—কেন?'

'ট্রে-টা কেনার জন্যে।'

'এই ট্রের রহস্যটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বয়কটের মুখে শুনেছি, তার জানামতে ওটা এই পরিবারেই দেড়শো বা তারও বেশি বছর ধরে আছে। সাধারণ পিতলের একটা ট্রে, ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু কি এত বেশি যে বয়কটকে

খুন করে সেটা কেউ পাবার চেষ্টা করবে?'

মাথা নেড়ে ডুগার্ড বলল, 'ওটা পিতলের নয়, সোনার।'

চট করে একবার লুসির দিকে তাকাল রানা। ওর সামনের সোফায় বসেছে সে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে রানার দিকে তাকাল। কথা না বলে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল একবার।

'তুমি জানলে কিভাবে ওটা সোনার?' ডুগার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর সোনারই যদি হবে, আজেবাজে জিনিসের সঙ্গে কিচেনে কেন রেখে দেয়া হবে?'

'আমি একা নই, লন্ডনের অনেকেই জানে—বিশেষ করে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে তারা তো সবাই জানে। কিচেনে ফেলে রেখেছিল, কারণ ওরা জানত না যে ওটা সোনার। ঠিক আছে, আমি যতটুকু জানি বলছি। বাকিটুকু মিসেস লুসি বলবেন।'

ছোট্ট একটা ঘটনা। ব্রিটিশ মিউজিয়াম তাদের নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে, বলা হয় সেখানে শুধু লন্ডনের প্রাচীন পরিবারগুলোর পুরানো জিনিস-পত্র রাখা হবে। খবরটা শুনে বয়কট অনেকটা খেয়ালের বশেই প্রদর্শনীতে ট্রে-টা দিয়ে আসে। দু'দিন পর মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ফোনে ওকে বিস্ময়কর একটা খবর দেন। তা হলো, একজন দর্শক ট্রে-টাকে সোনার বলে মন্তব্য করায় তাঁরা ওটা পরীক্ষা করে দেখছেন। জিনিসটা সত্যি সোনার। ফোন পেয়ে তাড়াতাড়ি মিউজিয়ামে হাজির হয় বয়কট। গিয়ে দেখে খবরটা ইতিমধ্যে রটে গেছে, ভিড় করে লোকেরা দেখছে ট্রে-টা, বেশ কয়েকজন ফটো-সাংবাদিক ছবিও তুলছে। কি মনে করে বয়কট ওটা বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। পরদিন লন্ডনের প্রায় সব কাগজেই ট্রে-র ছবি সহ খবরটা ছাপা হয়।

ডুগার্ড থামতে রানা লুসিকে অনুরোধ করল, 'এবার বলো তুমি কি জানো।'

থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল লুসি। তিনজন আমেরিকানের নাম বলল সে, রানা ও ডুগার্ড যে যার নোটবুকে নামগুলো লিখে নিল। রয় হেনেসের নাম আগেই জেনেছে ওরা। বাকি দু'জন আমেরিকানের নাম হলো—নাথান বেলফোর্স ও আলফাঁসো রিমরিগো। না, একসঙ্গে নয়, এরা সবাই আলাদাভাবে বয়কটের সঙ্গে দেখা করে ট্রে-টা কিনতে চেয়েছে। টেলিফোন করে প্রায় রোজই ওরা আসত, এমন কি শেষ দিকে বয়কট মানা করা সত্ত্বেও। সবাই একটা কথাই বলত, বয়কট যদি ট্রে-টা বিক্রি করে, দাম যা-ই হোক, তার কাছেই যেন বিক্রি করা হয়। কৌতূহলের বশে বয়কট প্রথমে রয় হেনেসকে জিজ্ঞেস করে, কত দিতে চায় সে। বিশ হাজার পাউন্ড থেকে শুরু করে হেনেস। একই প্রশ্ন করায় আলফাঁসো রিমরিগো জবাব দেয়, সে দশ হাজার পাউন্ডের বেশি দিতে পারবে না। কিন্তু বৃদ্ধ নাথান বেলফোর্স বলেন, তিনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে ট্রে-টা কিনতে চান। তারপর বেলফোর্স আর হেনেস পাল্লা দিয়ে দাম আরও বাড়াতে শুরু করল। রয় হেনেস এক লাখ

পাউন্ড পর্যন্ত উঠল। স্বামীকে লুসি বলেছিল, এত যখন দাম পাওয়া যাচ্ছে, জিনিসটা বেচেই দাও। কিন্তু বয়কট রাজি হয়নি। তার ধারণা হয়, ট্রে-টার মধ্যে কোন রহস্য আছে, তা না হলে ওটা পাবার জন্যে ওরা এরকম পাগলামি শুরু করত না। বিক্রি যদি করতেই হয়, আগে তাকে জানতে হবে রহস্যটা কি।

এরপর এক রাতে ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। এস্টেটে প্রচুর গার্ড, তাসত্ত্বেও ডাকাতরা গুলি করতে করতে বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভেতরে ঢুকতে পারেনি। গুলি বিনিময়ের সময় বয়কটের তিনজন গার্ড আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকাল পুলিস স্টেশনে খবর দেয়া হয়। পুলিস আসে অনেক দেরি করে, সব শোনার পর তারা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি ব্যাপারটা। এত বেশি গার্ড, দলাদলির কারণে নিজেদের মধ্যে মারামারি করাও অসম্ভব নয়, এ-ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায় তারা। তারপর থেকে বয়কট বাইরে বেরুলেই একেক সময় একেকটা গাড়ি তার পিছু নিতে শুরু করল। বেশ ভয় পেয়ে গেল সে। পুলিস স্টেশনে গিয়ে ডায়েরী করল আরেকটা। তারপর এক গভীর রাতে ওদের বেডরুমে ঢুকল এক লোক। ট্রে-টা তখন ওখানেই ছিল। ভেতর থেকে জানালা-দরজা বন্ধ ছিল, লোকটা ভেতরে ঢোকার জন্যে জানালা ভাঙে। ওই ভাঙার শব্দেই জেগে ওঠে বয়কট, চোরকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে। পরে সবাই হতভম্ব হয়ে দেখল যে চোর আর কেউ নয়, ওদের পুরানো এক গার্ড। ধরা পড়ে কান্না জুড়ে দিল সে। জেরা করে জানা গেল, স্থানীয় এক বারে নোয়ামি নামে এক আমেরিকানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, সে-ই প্রস্তাব দেয় যে ট্রে-টা চুরি করে এনে দিতে পারলে তাকে নগদ পঁচিশ হাজার পাউন্ড দেয়া হবে। যতই কাঁদুক, যতই পুরানো লোক হোক, বেঈমানী সহ্য করার মত মানুষ বয়কট ছিল না। পুলিস ডাকে সে, তাদের হাতে গার্ডকে তুলে দেয়।

কিন্তু এই ঘটনার দু'দিন পরই বয়কটের গাড়ির ব্রেক ফেল করে। এটা যে স্যাবোটাজ, তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারে লুসি। এবার সে জেদ ধরে, পুলিস যেহেতু প্রোটেকশন দিতে পারছে না, ওই আপদ তুমি বাড়ি থেকে দূর করো। লুসির প্রস্তাব ছিল ট্রে-টা কোন ব্যাংকের ভল্টে রেখে আসুক বয়কট। কিন্তু বয়কট ইতিমধ্যে ওটার রহস্য জানার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠছে। কাজেই প্রথমে সে খবর নেয় রানা লন্ডনে আছে কিনা। যখন জানল আছে, ট্রে-টা নিয়ে রওনা হলো সে। তার পরের ঘটনা সবারই জানা।

সবশেষে লুসি রানাকে বলল, 'মিগুয়েলকে আমি আর ফিরে পাব না। কিন্তু আমি জানতে চাই, কেন ও খুন হলো। ট্রে-টার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। রানা, তুমি ভাই যদি সেই রহস্য উদ্ধার করতে পারো, ওর আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। ওই ট্রে আমার দরকার নেই। ওটা ভাই আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। আর, তোমার কাছে আমার একটাই দাবি—তুমি দেখবে মিগুয়েলের খুনীরা যাতে শাস্তি পায়।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' উত্তরে বলল রানা। 'মিঁগুয়েল আমার বন্ধু ছিল, এটা আমি ভুলছি না।'

নোটবুক বন্ধ করে ডুগার্ড বলল, 'আপনি এবার বিশ্রাম নিতে যেতে পারেন, মিসেস লুসি। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের তরফ থেকে আমিও কথা দিচ্ছি, মূল অপরাধীকে ধরার জন্যে যথাসাধ্য করব আমরা।'

রানা এজেন্সি আর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ সেদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিল। তিন দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পরও রয় হেনেসকে কোথাও পাওয়া গেল না। অসমর্থিত এক তথ্যে জানা গেল, বেনামে একটা ইয়ট কিনে সমুদ্রপথে ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছে সে। তবে ধারণা করা হলো ব্রীফকেসের ভেতর ট্রে-টা না পাওয়ায় নিজের কয়েকজন লোককে সে লন্ডনে রেখে গেছে।

আলফাঁসো রিমরিগো আর নাথান বেলফোর্স সম্পর্কে অল্প কয়েকটা তথ্য দিতে পারল লুসি, তবে তা থেকেই ওদের পরিচয় এবং বয়কট খুন হবার সময় কে কোথায় ছিল তা তদন্ত করে জেনে নিতে পারল রানা এজেন্সির এজেন্টরা। রিমরিগো সম্পর্কে জানা গেল, তার বয়েস মাত্র আটাশ, আর্কিওলজিতে মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছে। বয়কট যখন খুন হয় তখন সে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা লাইব্রেরিতে ছিল। আর নাথান বেলফোর্স সম্পর্কে তথ্য এল কমপিউটরের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে। তিনিও একজন আর্কিওলজিস্ট, পিএইচডি করেছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওয়াশিংটনের একটা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক ছিলেন। তবে পেশায় তিনি ব্যবসায়ী। 'সুইট হোমস' নামে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা আছে, প্লট আর অ্যাপার্টমেন্ট ভবন বিক্রি করেন। কয়েকটা অয়েল কনসেশনও আছে তাঁর। ঘটনার সময় তিনি হোটেলেই ছিলেন।

দু'জনের কাউকেই ডেকে পাঠাতে হলো না, নিজেরাই তারা টেলিফোনে যোগাযোগ করল সরাসরি রানার সঙ্গে। প্রথমে ফোন করলেন বৃদ্ধ নাথান বেলফোর্স। রানার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে খুবই ব্যগ্র মনে হলো তাঁকে। খবরের কাগজে বয়কট খুন হবার ঘটনা পড়েছেন তিনি, জানেন একটা ব্রীফকেস ছিনতাই হয়েছে। বারবার জিজ্ঞেস করলেন, ব্রীফকেসে পুরানো একটা ট্রে ছিল কিনা। রানা তাকে প্রশ্ন করল, ট্রে-টা সম্পর্কে তাঁর এত আগ্রহের কারণ কি। উত্তরে তিনি বললেন, 'ফোনে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, আপনি আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন, প্লীজ।' রানা তাঁকে পরদিন সকাল এগারোটায় সময় দিল।

গত দু'দিন থেকে একটা মেয়েও রানার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে বারবার ফোন করেছে অফিসে, তবে রানার সঙ্গে সরাসরি তার আলাপ হয়নি। আজ বেলফোর্স ফোন করার এক ঘণ্টা পর মেয়েটা আবার ফোন করল। রানাই রিসিভার তুলল, জানতে চাইল কে সে। মেয়েটা বলল, 'আমি মিসেস মারিয়া রিমরিগো। আমার স্বামী আর্কিওলজির ছাত্র।' রানা জানতে চাইল, কেন দেখা করতে চান? মারিয়া জবাব দিল, 'বয়কট খুন হয়েছেন, সেজন্যে আমরা

মর্মাহত। তিনি যে ট্রের কারণে খুন হয়েছেন সেটা সম্পর্কে আমার স্বামীর আগ্রহ আছে। ওটা কি খুনীরা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে?' প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে রানা ওদেরকে পরদিন বেলা ঠিক বারোটার সময় আসতে বলল।

ইতিমধ্যে ভল্ট থেকে বের করে ট্রে-টার বেশ কিছু ফটো তুলে নিল রানা, সেগুলোর কয়েকটা প্রিন্ট করিয়ে রাখল।

দুই

নাথান বেলফোর্স প্রায় ছ'ফুট লম্বা, একহারা গড়ন, তবে হাড়গুলো খুব চওড়া। মাথার একটা চুলও কালো নেই, ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি রানার চোখ এড়াল না। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় তিনি বললেন, 'মি. বয়কট আপনার বন্ধু ছিলেন, কাজেই আপনার শোক আমি উপলব্ধি করি। এ-ও বুঝি যে এই সময় আপনাকে বিরক্ত করাটা একদম উচিত হচ্ছে না। কিন্তু কি করব, আমার সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে, ধৈর্য ধরার উপায় নেই।'

'বুঝলাম না। একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'পরে ব্যাখ্যা দেব, যদি প্রয়োজন হয়,' ভারী গলায় বললেন বেলফোর্স। 'আপনি আমাকে সময় দিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কেন সময় দিয়েছেন তা-ও আন্দাজ করতে পারি। প্রথমত, যার নির্দেশে বয়কট খুন হয়েছেন, আপনি নিজে তাকে ধরতে চান—একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্রধান হিসেবে সেটা চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, ট্রে-টা আপনার কাছে থাক বা খুনীরা নিয়ে যাক, ওটার রহস্য সম্পর্কে আপনি জানতে চান। আলোচনার সুবিধে হবে, তাই আমি ধরে নিচ্ছি, ওটা আপনার কাছেই আছে।'

রানা কথা বলছে না।

হাতের ব্রীফকেসটা পায়ের কাছ থেকে তুলে খুললেন বেলফোর্স। ভেতর থেকে বেশ কয়েকটা সাদা-কালো ফটোগ্রাফ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন কিনা।'

গ্লসি পেপারে প্রিন্ট করা হয়েছে ছবিগুলো, লম্বায় দশ ইঞ্চি, চওড়ায় আট ইঞ্চি। চোখ বুলালেই বোঝা যায়, দক্ষ কোন ফটোগ্রাফারের কাজ। প্রতিটি ছবিই সেই ট্রের, বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা হয়েছে। কয়েকটা ছবিতে ট্রের কিনারায় খোদাই করা সূক্ষ্ম লতাপাতার নকশা পরিষ্কার ধরা পড়েছে।

'এগুলো আপনাকে আরও বেশি সাহায্য করবে,' বলে আরও কয়েকটা ছবি রানার দিকে ঠেলে দিলেন বেলফোর্স। এগুলো রঙিন, ট্রের বৈশিষ্ট্য আরও ভালভাবে ফুটেছে।

রানা মুখ তুলল। 'এ-সব আপনি পেলেন কোথায়?'

'তাতে কিছু আসে যায়?'

'পুলিস জানতে চাইবে,' বলল রানা। 'এই ট্রের জন্যে একজন মানুষ খুন হয়েছেন। তাছাড়া, ট্রে-টা এখন আমার সম্পত্তি। মিসেস বয়কট ওটা আমাকে দান করেছেন। স্বভাবতই আমি জানতে চাইব, আমার ট্রের ছবি আপনার কাছে কেন?'

'আপনার নয়,' শান্তকণ্ঠে বললেন বেলফোর্স, 'আমার।'

বেলফোর্স বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তি, তাসত্ত্বেও কঠিন সুরে রানা বলল, 'মিথ্যেকথা! ট্রে-টা কমপক্ষে দেড়শো বছর ধরে বয়কট পরিবারে রয়েছে, আপনার হয় কি করে?'

হাত তুলে রানাকে শান্ত হতে বললেন বেলফোর্স। 'ফটোগ্রাফে যে ট্রে-টা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমার কাছে আছে। আমার কাছে মানে আমার মিউজিয়ামের নিরাপদ একটা ভল্টে। আমি আপনার কাছে এসেছি স্রেফ এটুকু জানার জন্যে যে আমার ট্রের সঙ্গে মি. বয়কটের ট্রের কোন মিল আছে কিনা। আপনার প্রতিক্রিয়া দেখে জবাবটা আমি পেয়ে গেছি। মিল আছে, সম্ভবত হুবহুই।'

ফটোগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল রানা, নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছে। 'হ্যাঁ, মিলটা হুবহুই মনে হচ্ছে,' বিড় বিড় করল ও।

'এখন আমার একটাই জিজ্ঞাস্য—আপনি কি আপনার ট্রে-টা বিক্রি করবেন? সঙ্গত যে-কোন দামে আমি ওটা কিনতে চাই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উপহার পাওয়া জিনিস কেউ বিক্রি করে না। তাছাড়া, এটা আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর স্মৃতিও বটে।'

চেয়ারের হাতলে আঙুল নাচাচ্ছেন বেলফোর্স। 'বিক্রি না হয় না-ই করলেন, আমার একটা অনুরোধ অন্তত রাখুন—ট্রে-টা আমাকে একবার পরীক্ষা করতে দিন, আমি ওটার কয়েকটা ছবি তুলি। সঙ্গে ভাল একটা ক্যামেরা আছে…'

মাথা নাড়ল রানা, বলল, 'ট্রের রহস্য না জানা পর্যন্ত আপনাদের কাউকেই আমি ওটা দেখতে দেব না। তবে ছবি দেখতে দিতে আপত্তি নেই…'

'আমাদের কাউকে মানে? এর মধ্যে আর কেউ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে নাকি? কে সে?'

'ট্রে-টা সম্পর্কে আর কে ইন্টারেস্টেড, আমার চেয়ে আপনারই তা ভাল জানার কথা,' বলল রানা।

'তার নাম কি আলফাঁসো রিমরিগো?'

'আপনি তাঁকে চেনেন।'

'গোটা সেন্ট্রাল আমেরিকা আর ইউরোপ জুড়ে গত তিন বছর ধরে পরস্পরের ট্রেইল অনুসরণ করছি আমরা, কখনও ও আগে পৌঁছায়, কখনও আমি। আলফাঁসোকে আমি চিনি বৈকি, এক সময় ও তো আমার ছাত্র ছিল।'

'আরেকজন আমেরিকান, ডায়নামো ডিকানডিয়াকেও নিশ্চয়ই চেনেন?'

রানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

অবাক হয়ে মাথা নাড়লেন বেলফোর্স। 'না।'

'রয় হেনেস?'

বেলফোর্স বললেন, 'মি. বয়কটের মুখে তাঁর নাম শুনেছি, কিন্তু পরিচয় হয়নি।'

রানার মনে হলো ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলছেন। 'এমনি জানতে চাইছি, ট্রে-টার দাম কত হওয়া উচিত?'

'খাঁটি সোনা তো আর নয়, পিতল আর রূপো মেশানো আছে। এখন যদি এরকম একটা ট্রে তৈরি করান, দু'হাজার পাউন্ডের বেশি দাম পড়বে না। তবে শিল্পকর্মের আলাদা একটা মূল্য আছে। নিলামে তোলা হলে দশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পেতে পারেন।'

'কিন্তু আর্কিওলজিকাল ভ্যালু?'

হেসে উঠলেন বেলফোর্স। ''ওটা ষোলোশো শতাব্দীর স্প্যানিশ; আর্কিওলজিকাল ভ্যালু কতই বা হতে পারে।'

'আপনিই বলুন। আমাকে একটা প্রস্তাব দিন।'

'আপনাকে আমি এক লাখ পাউন্ড দেব।'

'দামটা জেনে খুশি হলাম। তবে আগেই বলেছি, এটা বিক্রির জন্যে নয়।'

বেলফোর্স অকস্মাৎ কাতর কণ্ঠে বললেন, 'মি. রানা, আমি একজন আর্কিওলজিস্ট, সেন্ট্রাল আমেরিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। গবেষণার কাজে ট্রে-টা আমার খুবই দরকার। বারবার বলছেন, বিক্রি করবেন না। কথাটা কি সত্যি? যত দামই হোক…'

'আপনার মনে হচ্ছে অনেক টাকা মি. বেলফোর্স?'

'হ্যাঁ।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'সেক্ষেত্রে, আপনি আমাকে কথা দিতে পারেন, আমি যদি ট্রে-টা না পাই, তাহলে রিমরিগো বা আর কেউও পাবে না?' চোখ ভরা মিনতি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেলফোর্স।

'না, ওটা আমি কাউকে দিচ্ছি না।'

ঠিক এই সময় নক করে চেম্বারে ঢুকল স্বাতী, জানাল, 'মাসুদ ভাই, এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন, ওঁদেরকে আমি পাশের একটা কামরায় বসিয়েছি।'

কারা এসেছে রানা জানে, স্বাতীকে আগেই নিষেধ করে দিয়েছিল প্রফেসর বেলফোর্সের সামনে সে যেন তাঁদের নাম উচ্চারণ না করে। 'বসুন, আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে। ছবিগুলোও তো দেখাইনি।' চেয়ার ছেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

একটু সতর্ক দেখাল বেলফোর্সকে, ভুরু কুঁচকে উঠল, তবে কিছু বললেন না।

পাশের ঘরে ঢুকতে প্রথমেই রানার চোখ পড়ল মারিয়া রিমরিগোর ওপর। গ্রীক দেবীর মত দেখতে, বয়েস তেইশ কি চব্বিশ, ড্রেসটা সবুজ সিল্ক, শরীর কামড়ে থাকায় যৌবনের সমস্ত খাঁজ-ভাঁজ বিপজ্জনক ভাবে স্পষ্ট। ওকে দেখে এমন হাসি দিল মারিয়া, সে হাসিতে নিরীহ ও নির্মল প্রশ্রয় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে, আর তার স্বামী আলফাঁসো রিমরিগো চেয়ারে বসে দ্রুত তালে পা দোলাচ্ছে। বসে থাকলেও বেশ লম্বা মনে হলো তাকে, কাঠামোটাও বেশ চওড়া। মাথায় বাবরি, জুলফি জোড়া কানের লতি ছাড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে রানার কেন যেন পছন্দ হলো না। অতিরিক্ত নার্ভাস আর আনপ্রেডিক্টেবল বলে মনে হলো।

ডেস্কের পিছনে বসে রানা বলল, 'আপনারাই তাহলে মিসেস ও মি. রিমরিগো। তা আপনাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?'

প্রথমে বয়কট খুন হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করল মারিয়া। তারপর বলল, 'আমাদের ধারণা, যে ট্রের জন্যে তিনি খুন হয়েছেন সেটা এখন আপনার কাছেই আছে।'

'আছে।'

হাত ব্যাগ খুলে কয়েকটা পেপার কাটিং বের করল মারিয়া। 'কাগজে ছবি সহ রিপোর্ট বেরিয়েছে। দেখুন তো, এই ছবিগুলো ওই ট্রেরই কিনা।'

ছবিগুলোর ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

'এবার আমাদের ফটোটা দেখাও ওকে,' স্ত্রীকে বলল আলফাঁসো রিমরিগো। বলার ধরনটা এমনই, যেন কোন চাকরানীকে ধমক দিচ্ছে।

হাত ব্যাগ খুলে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটোগ্রাফ বের করল মারিয়া। 'ছবিটা তেমন পরিষ্কার নয়। দেখুন তো বলতে পারেন কিনা, এটার সঙ্গে আপনার ট্রের কোন মিল আছে?'

ছবিটা নিয়ে ভাল করে দেখল রানা। এ-ও একটা ট্রেরই ছবি, তবে এটা বয়কট পরিবারের ট্রে নয়। সম্ভবত কোন মিউজিয়ামে ছিল ট্রে-টা, কাঁচমোড়া কেসের ভেতর। কাঁচে কিছু একটা প্রতিফলিত হওয়ায় ছবিটা ভাল ওঠেনি। 'হ্যাঁ, কিছুটা মিল আছে। তবে এ ছবি আমার ট্রের নয়।'

'ট্রে-টা এখন তাহলে আপনার?' জানতে চাইল রিমরিগো। তার গলার স্বরই আসলে কর্কশ।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, কোন ব্যাখ্যা দিল না।

মারিয়া বলল, 'মি. রানা, আপনার ট্রে-টা কি আমরা একবার দেখতে পারি?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনারা কি ওটা কিনতে চান?'

'চাই, দামটা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়।'

'যুক্তিসঙ্গত দাম কত হতে পারে বলে আপনাদের ধারণা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা যে ট্রে-টা খুঁজছি সেটা হলে দশ হাজার পাউন্ড দিতে রাজি। তার বেশি হলে আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়।'

'আপনাদের জানার কথা, রয় হেনেস্ ট্রে-টার নাম দিতে চেয়েছিল এক লাখ পাউন্ড।'

'এক লাখ পাউন্ড অসম্ভব দাম। তাছাড়া, অত টাকা আমার স্বামীর নেই।' মারিয়ার চেহারা ম্লান হয়ে গেল।

'এখন প্রফেসর বেলফোর্স নামে এক ভদ্রলোকও ট্রে-টার জন্যে এক লাখ পাউন্ড দিতে চাইছেন,' বলল রানা।

রানা লক্ষ করল, বেলফোর্সের নামটা শোনা মাত্র স্বামী-স্ত্রীর পেশীতে টান পড়ল। দেখে মনে হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মারিয়া। আর রিমরিগো যেন আক্রোশে ফুলছে। শান্ত গলায় মারিয়া বলল, 'প্রফেসরের অনেক টাকা, তাঁর সঙ্গে আমরা পারব না। তিনি কি আপনার ট্রে-টা দেখেছেন?'

'না। নিজে দেখতে পাননি, তাই আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন ওটা আর কাউকেও না দেখাই। অদ্ভুত না?'

'প্রফেসর বেলফোর্স কখনোই অদ্ভুত কিছু করেন না,' তীক্ষ্ণ সুরে বলল মারিয়া। 'প্রতারণা করবেন তিনি, এমন কি ক্রাইমও, কিন্তু অদ্ভুত কিছু করবেন না। যা-ই তিনি করুন, তার পিছনে কোন না কোন কারণ থাকবে।'

'এটুকু অন্তত জানা গেল, ট্রে-টা আমি যদি বিক্রি করি, আপনারা ওটা কিনতে পারছেন না,' বলল রানা। 'এবার বলবেন কি, ট্রে-টা কেন আপনাদের দরকার?'

'আলফাঁসো আর্কিওলজিস্ট, ওটা ওর গবেষণার কাজে লাগবে,' বলল মারিয়া। 'কিনতে তো পারবে না, দয়া করে ট্রে-টা একবার আমার স্বামীকে পরীক্ষা করতে দেবেন, মি. রানা, প্লীজ?'

'বরং এই ফটোগুলো দেখে সাধ মেটান,' বলে কোটের সাইড পকেট থেকে সাদা একটা এনভেলাপ বের করে রিমরিগোর দিকে ঠেলে দিল রানা।

এনভেলাপ খুলে ছবিগুলো বের করল রিমরিগো, রানা লক্ষ করল তার হাত দুটো কাঁপছে। খানিক পর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে, জানতে চাইল, 'এগুলো সত্যি সে-ই ট্রে-টার ছবি, মি. বয়কট যেটার জন্যে খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

স্ত্রীর দিকে ফিরল রিমরিগো। 'এই ট্রে-টাই, মারিয়া—লতাপাতার সূক্ষ্ম কাজগুলো দেখো। ঠিক মেক্সিকান ট্রে-টার মত। আমি সন্দেহমুক্ত।'

মারিয়ার গলায় সামান্য সন্দেহ, 'দেখে প্রায় একইরকম লাগছে।'

'বোকার মত কথা বলো না! প্রায় আবার কি? হুবহু বলো। মেক্সিকান ট্রে-টা আমি যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষা করছি, ফর গড'স সেক! আমাদের ছবিটা কোথায়?' স্ত্রীর কাছ থেকে ফটোটা নিয়ে রানার ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। 'একেবারে পুরোপুরি না মিললেও,' নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'প্রায় সব কিছুই মিলছে। কোন সন্দেহ নেই যে একই হাতে তৈরি।

লতাপাতার শিরাগুলো লক্ষ করো।'

'বোধহয় তোমার ধারণাই ঠিক।'

'আবার বোধহয় বলে!' রানার দিকে তাকাল রিমরিগো। 'মি. রানা, ট্রে-টা আমাকে একবার দেখান না, প্লীজ!'

'কেন দেখাব? আপনারা কি ট্রে-টার রহস্য আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

স্বামী-স্ত্রী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর মারিয়া বলল, 'আমি তো বললামই, ওটা আমাদের গবেষণার কাজে লাগবে···'

'আপনারা কেউই আমাকে সত্যি কথা বলছেন না,' বাধা দিল রানা। 'কাজেই আমি কাউকে ট্রে-টা দেখতে দেব না। আপনারা কৌশল করছেন, কাজেই আমাকেও কৌশল করতে হচ্ছে। দেখা যাক সংশ্লিষ্ট সবাই এক হলে কি ঘটে। স্বাতী, আমার চেম্বার থেকে ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল স্বাতী, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। ত্রিশ সেকেন্ড পর কামরায় ঢুকলেন প্রফেসর নাথান বেলফোর্স। ঘরে ঢুকে দু'পা-ও এগোননি, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখে রিমরিগো রীতিমত একটা ঝাঁকি খেলো, কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'উনি এখানে কি করছেন?'

'আপনাদের মতই, প্রফেসর বেলফোর্সও আমার নিমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত,' হাসিমুখে বলল রানা।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রিমরিগো। 'ওনার সঙ্গে এখানে আমি থাকছি না। চলে এসো, মারিয়া।'

'এক মিনিট, আলফাঁসো। ট্রে-টার কি হবে?'

অদৃশ্য একটা হাত যেন পিছন থেকে টেনে ধরল রিমরিগোকে। ঘুরে প্রথমে রানার দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল সে, তারপর বেলফোর্সের দিকে। 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না!'

রিমরিগো দম্পতিকে দেখে প্রফসর বেলফোর্সও কম অবাক হননি। আরও এক পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'আমারও কি পছন্দ হচ্ছে? তবে ভদ্রলোকদের সামনে তুমি বেয়াদবি না করলেও পারো, আলফাঁসো। সব সময় পিন খোলা গ্রেনেড হয়ে আছ, এটা ঠিক না।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলবেন, মি. রানা?'

'ধরে নিন না এখানে আমি একটা নিলাম ডেকেছি,' বলল রানা।

'তাহলে বলব অযথা সময় নষ্ট করছেন। ট্রে-টা ওরা মিছিমিছি দশ হাজার পাউন্ডে কিনতে চাইবে, কিন্তু আসলে ওদের কাছে এক হাজার পাউন্ডও আছে কিনা সন্দেহ।'

তীক্ষ্ণস্বরে মারিয়া বলল, 'তাহলে আমার ধারণাটাও পরিষ্কার করে বলি—প্রফেসর বেলফোর্স, আপনার সমস্ত সুনাম আসলে টাকা দিয়ে কেনা। এবং, যে জিনিস আপনি কিনতে পারেন না, সেটা চুরি করেন।'

প্রফেসর খেপে গেলেন। 'এই মেয়ে! মুখ সামলে কথা বলো! এত বড় সাহস. তুমি আমাকে চোর বলো!'

'কেন বলব না? অস্বীকার করতে পারেন, দে পেলায়েজ লেটারটা আপনার কাছে নেই?'

স্থির হয়ে গেলেন বেলফোর্স। 'দে পেলায়েজ লেটার সম্পর্কে কি জানো তোমরা?'

'আমরা জানি দু'বছর আগে ওটা আমাদের কাছ থেকে চুরি গেছে। আরও জানি সেটা এখন আপনার কাছে আছে।' রানার দিকে তাকাল মারিয়া। 'এ থেকে কি উপসংহারে আসা যায়, আপনিই বিবেচনা করুন, মি. রানা।'

বেলফোর্সের দিকে ফিরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা কি সত্যি আপনার কাছে আছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন বেলফোর্স। 'আছে, তবে সেটা আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বৈধভাবেই কিনি। প্রমাণ হিসেবে আমি রসিদ দেখাতে পারব। কি আশ্চর্য, ওরা আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করছে! অথচ, অভিযোগ করার কথা আমার। কি, আলফাঁসো, মেক্সিকোয় তুমি আমার কাগজ-পত্র চুরি করোনি?'

'এমন কিছু আমি নিইনি যা আমার ছিল না।' রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে রিমরিগো। 'আর আপনি কি চুরি করেছেন? আপনি চুরি করেছেন আমার কৃতিত্ব। এই পেশায় চোরের অভাব নেই, প্রফেসর বেলফোর্স। তারা অযোগ্য, অন্যের কৃতিত্ব চুরি করে নিজের সুখ্যাতি বাড়ায়। আপনি তাদেরই একজন।'

'ইউ সান অব আ বীচ!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর। 'ছাইপাঁশ লিখে জার্নালগুলো ভরে ফেলেছ, কিন্তু কেউ তোমাকে পাত্তা দেয়নি। যেখানে তোমার বক্তব্যই কেউ বিশ্বাস করছে না, সেখানে তোমার কৃতিত্ব কোথায় হে?'

লড়াকু মোরগের মত পরস্পরের মুখোমুখি ওরা, যে-কোন মুহূর্তে একজন আরেকজনের গলা টিপে ধরবে। 'থামুন!' কঠিন সুরে ধমকে উঠল রানা। দু'জনেই চমকে উঠে ওর দিকে ফিরল। 'সবাই আপনারা শান্ত হয়ে বসুন,' সুর একটু নরম করল ও। 'এভাবে ঝগড়া করলে আপনাদেরকে আমি চলে যেতে বলতে বাধ্য হব।'

একটা চেয়ার টেনে বসলেন বেলফোর্স। 'আমি দুঃখিত, মি. রানা। বেয়াদবি আমি সহ্য করতে পারি না।'

ফিরে এসে রিমরিগোও নিজের চেয়ারে বসল, প্রফেসরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে, তবে কথা বলছে না।

মারিয়ার চেহারা আরও লালচে হয়ে উঠেছে। 'আমরা অন্যায় আচরণ করেছি, মি. রানা, সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই,' বলল সে।

'আপনি শুধু নিজের তরফ থেকে ক্ষমা চাইতে পারেন, মিসেস মারিয়া। অন্যের হয়ে চাইতে পারেন না, এমন কি স্বামীর হয়েও না।' রানা থামল, অপেক্ষা করছে রিমরিগো কি বলে শুনবে। কিন্তু চেহারায় একগুয়েমির ভাব, মুখ খুলতে রাজি নয় রিমরিগো। তাকে অগ্রাহ্য করে প্রফেসরের দিকে তাকাল

ও, বলল, 'আপনাদের প্রফেশনাল আর্গুমেন্ট সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। আপনারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে ভুলে বসে আছেন ওই ট্রে-টার জন্যে এরই মধ্যে দু'জন লোক খুন হয়ে গেছে।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' ম্লান সুরে বলে আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকাল মারিয়া। কিন্তু রিমরিগো ঠোঁটে কুলুপ এঁটে বসে থাকল।

'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন আপনারা,' বলল রানা। 'এত যার গুরুত্ব, সে-ই ট্রে-টা আমার কাছে আছে। ওটা যদি আপনাদের দরকার থাকে, আমি দেখাতে বা ফটো তুলতে দিতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে সব কথা আমাকে বলতে হবে। মি. বেলফোর্স, আপনি রাজি?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বেলফোর্স বললেন, 'আমি রাজি, সব কথাই আপনাকে জানাব, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একা। আলফাঁসো সেখানে থাকতে পারবে না।'

'তা হবে না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল রানা। 'যা বলবেন এখানে, এখনই বলবেন। এই একই শর্ত আপনার বেলায়ও, মি. রিমরিগো।'

ঠাণ্ডা আক্রোশে হিসহিস করে উঠল রিমরিগো, 'এ অন্যায়। কয়েক বছরের গবেষণার ফসল একজন প্রতারকের সামনে কেন আমি প্রকাশ করব?'

'হয় শর্তটা মেনে নিন, আর তা না হলে দরজা খোলা আছে। তবে আপনি চলে গেলে ট্রে-টা দেখার সুযোগ একা শুধু মি. বেলফোর্সই পাবেন।'

চেয়ারের হাত এত জোরে আঁকড়ে ধরল রিমরিগো, আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেল। তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিল মারিয়া। 'আপনার শর্ত আমরা মেনে নিলাম, মি. রানা। আমরা থাকছি।'

আহত বিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল রিমরিগো। মারিয়া ফিসফিস করল, 'ঠিক আছে, আলফাঁসো। আমি জানি আমি ঠিক করছি।'

'প্রফেসর, আপনি কি বলেন?'

'অগত্যা আমিও রাজি,' বেলফোর্স বললেন, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আলফাঁসো কয়েক বছর ধরে গবেষণা করার কথা বলল। আমিও তো তাই করছি। সমস্যাটা সম্পর্কে যা কিছু জানার, আমরা দু'জন তার হয়তো সবগুলোই জানি। যীশুর কিরে, ইউরোপের এমন কোন মিউজিয়াম নেই যেখানে ওদের দু'জনকে আমি দেখিনি। বলতে চাইছি আমার চেয়ে ওরা কম জানে না।'

'বেশি জানি,' তীক্ষ্ণ সুরে বলল রিমরিগো। 'ব্রেন জিনিসটা আপনার একচেটিয়া নয়।'

'থামুন। অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা বা খোঁচা দিয়ে কোন মন্তব্য করা যাবে না,' বলল রানা। 'ঠিক আছে? এবার শুরু করুন।'

তিন

গল্পটা একাধারে বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত। ট্রে আর ফটোগ্রাফগুলো না দেখলে মিথ্যে সাজানো কাহিনী বলে বাতিল করে দিত রানা। তাছাড়া, প্রফেসর বেলফোর্সের মত একজন বিশেষজ্ঞ যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছেন, গল্পটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেয়া সত্যি কঠিন। একা রিমরিগোর মুখ থেকে শুনলে কথা ছিল তার মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে রানার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গল্পটা যখন বলা হচ্ছে, নিজের শর্ত আর নিয়ম খুব কঠিনভাবে প্রয়োগ করল রানা। তারপরও মাঝে মধ্যে রাগে ফেটে পড়ল রিমরিগো, প্রফেসর বেলফোর্সও শার্টের আস্তিন গুটাবার ভঙ্গি করলেন দু'একবার, ফলে রানাকে খুব শক্ত হাতে সব সামাল দিতে হলো। দেখা গেল প্রতিবারই ওর ধমকে কাজ হচ্ছে কারণটাও পরিষ্কার, দুটো ট্রের একটা ওর কাছে।

রানা প্রথমে প্রফেসর বেলফোর্সকে শুরু করতে বলল। আঙুল দিয়ে কানের লতি কচলে তিনি বললেন, 'কোত্থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

রানা পরামর্শ দিল, 'প্রথম থেকে শুরু করুন। আপনি এটার সঙ্গে জড়ালেন কিভাবে?'

কানের লতিতে শেষ একটা মোচড় দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আমি একজন আর্কিওলজিস্ট, আমার একটা মিউজিয়ামও আছে। আমি তখন মেক্সিকোয় কাজ করছিলাম। মি. রানা, মায়াদের সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

'সামান্য,' বলল রানা।

'মায়াদের প্রসঙ্গে পরে আসব,' বললেন প্রফেসর। 'মেক্সিকোয় গবেষণা করার সময় মেক্সিকান একটা পরিবার সম্পর্কে কয়েকটা রেফারেন্স পাই আমি। পরিবারটির নাম দে পেলায়েজ। দে পেলায়েজ আসলে প্রাচীন এক স্প্যানিশ পরিবার...'

কর্টেস-এর আমল সবেমাত্র শেষ হয়েছে, এই সময় সাইমি দে পেলায়েজ মেক্সিকোয় জমি কিনে পরিবারটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিশাল জমি থেকে তাঁর উত্তরপুরুষরা প্রচুর আয় করেন, তা থেকে আরও জমি কিনে জমিদার হন, র‍্যাঞ্চ আর মাইন কিনে মেক্সিকোর অন্যতম ধনী পরিবারে পরিণত হন। তারপর এক সময় তাদের হাতে চলে আসে বিশাল আকৃতির সব শিল্প-কারখানা। টাকা কামাবার দিকে ঝোঁক ছিল, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করায় সাফল্যও পান তাঁরা। ভুল করলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে হাত বাড়িয়ে। মেক্সিকোয় তখন একটা রাজ্য স্থাপন করার পরিকল্পনা করছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, দে পেলায়েজ পরিবার তাঁকে সমর্থন করল। সেটা আঠারোশো ষাট সালের কথা।

রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেলেন তিনি। এরপর মেক্সিকোয় শুরু হলো ক্ষমতার লড়াই। একের পর এক একনায়করা এলেন, বিপ্লবের পর বিপ্লব সংঘটিত হলো, এবং প্রতিবার দেখা গেল অচিরেই যার পতন ঘটবে ভুল করে তাকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে দে পেলায়েজ পরিবার। এভাবে একশো বছর পার হতে দেখা গেল পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু খোঁজ করেও প্রফেসর বেলফোর্স দে পেলায়েজ পরিবারের কোন সদস্যকে খুঁজে পাননি।

গল্পের এখানে প্রতিবাদ জানাল রিমরিগো। সে দাবি করল, তার নামের সঙ্গে দে পেলায়েজ না থাকলেও, সরাসরি দে পেলায়েজ পরিবারেরই সদস্য সে। রানা বাধা দিয়ে বলল, এ বিষয়টি পরে বিশ্লেষণ করার সুযোগ দেয়া হবে। আপাতত প্রফেসর বেলফোর্স গল্পটি শেষ করুন।

দে পেলায়েজ পরিবার মেক্সিকোর অন্যতম ধনী ও সম্পদশালী পরিবার ছিল। পরিবারটি ধ্বংস হতেও একশো বছর সময় নিয়েছে। এই একশো বছরে তাদের সমস্ত মূল্যবান জিনিস-পত্র বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, সেগুলোর মধ্যে এখন যে ট্রে-টা রানার কাছে রয়েছে, সেটাও ছিল।

ট্রে-টা ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দে পেলায়েজ পরিবারের একটা সম্পদ, তাঁরা ওটাকে খুব যত্নের সঙ্গে রেখেছিলেন। বের করা হত শুধু আনুষ্ঠানিক কোন ভোজসভায়। আঠারোশো শতাব্দীতে এমানুয়েল দিদিয়া নামে একজন ফরাসী মেক্সিকোয় বেড়াতে যান, প্যারিসে ফিরে এসে তিনি একটা বই লেখেন। মেক্সিকোয় দে পেলায়েজদের একটা এস্টেটে অতিথি হিসেবে থাকার সুযোগ হয় তাঁর। সে সময় প্রদেশের গভর্নরের সম্মানে একটা ভোজসভার আয়োজন করে দে পেলায়েজ পরিবার। এ প্রসঙ্গে দিদিয়া তাঁর বইতে লিখেছেন, 'এমন কি ফরাসী অভিজাত সমাজেও এভাবে টেবিল সাজাতে দেখিনি আমি। দে পেলায়েজ পরিবারের সমস্ত তৈজস-পত্রই ছিল সোনার। টেবিলের মাঝখানে নানা জাতের ফল রাখা হয়েছিল সোনার তৈরি অনেকগুলো ট্রেতে, তার মধ্যে একটার কথা কোনদিন আমি ভুলব না—ট্রে-টার কিনারায় লতাপাতার সূক্ষ্ম কাজ এত সুন্দর যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দে পেলায়েজ পরিবারের এক ছেলে আমাকে জানালেন, এই ট্রের সঙ্গে একটা কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে—বলা হয়, ট্রে-টা নাকি দে পেলায়েজ পরিবারের কোন এক পূর্ব-পুরুষ নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওটা নাকি গোপন কিছু সূত্রও ধারণ করে, সেই সূত্র ধরে কেউ যদি নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে তাহলে নাকি কল্পনাকে হার মানাবে এমন বিপুল বিত্ত-বৈভব বা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাবে সে।'

এভাবেই, দিদিয়ার বইটা পড়ে, প্রফেসর বেলফোর্স প্রথমে ট্রে-টার কথা জানতে পারেন। পরের বছর দে পেলায়েজ আর তাঁদের ট্রে সম্পর্কে আরও তিনটে রেফারেন্স পান তিনি। সবগুলোতেই বলা হয়েছে যে ট্রে-টাতে গোপন কিছু সূত্র আছে। তারপরও এ বিষয়ে, ষোলোশো শতাব্দীর একটা ট্রে সম্পর্কে, খুব একটা আগ্রহী হয়ে ওঠেননি বেলফোর্স। এর কারণ, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র

ছিল সেন্ট্রাল আমেরিকার প্রি-কলম্বিয়ান সভ্যতা। তবে তথ্যগুলো তিনি একটা ফাইলে টুকে রাখেন। সে-সময় তিনি দক্ষিণ কাম্পেচিতে মাটি খুঁড়ছেন, তাঁর সঙ্গে অনেকেই ছিল, সেই অনেকের মধ্যে একজন আলফাঁসো রিমরিগো। বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাওয়ায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বন্ধ করে সভ্য জগতে ফিরে আসেন তাঁরা। কোন কারণ ছাড়াই তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায় রিমরিগো, এবং টীম ছেড়ে চলে যায়। সেই সঙ্গে গায়েব হয়ে যায় দে পেলায়েজ ফাইলটাও।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে আবার ঝগড়া বেধে গেল। রিমরিগোর বক্তব্য হলো, প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সে গবেষণা চালায় এবং একটা গবেষণা-পত্র রচনা করে, কিন্তু প্রফেসর বেলফোর্স তার গবেষণা-পত্র নিজের ফাইলে রাখেন, তারপর দাবি করেন ওটা তাঁর পরিশ্রমের ফসল। হেসে উঠে প্রফেসর জবাব দিলেন, প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যই তো আমার যোগান দেয়া, তা থেকে সবাই মিলে একটা গবেষণা-পত্র তৈরি করি আমরা, কাজেই ওটা নিজের বলে দাবি করার বা ফাইল থেকে নিয়ে যাবার কোন অধিকার রিমরিগোর ছিল না।

রানার হস্তক্ষেপে আবার শান্তি ফিরে এল। প্রফেসর বেলফোর্স আবার শুরু করলেন।

প্রফেসর বেলফোর্স তখন নিউ ইয়র্কে। আর্টিফ্যাক্ট ডিলার পিটি জেমস তাঁকে ফোন করে ডেকে পাঠাল, পালকের তৈরি একজোড়া আলখেল্লা আর মায়ান চকলেট-জাগ দেখার জন্যে। সব জিনিসেরই দাম খুব বেশি চায় জেমস, তাই মায়ান বিশেষজ্ঞরা তার কাছ থেকে তেমন কিছু কিনতে পারে না। খবর পেয়ে রিমরিগোও ওগুলো দেখে, কিন্তু টাকার অভাবে কিনতে পারেনি। বেলফোর্স তাঁর মিউজিয়ামের জন্যে আগেও অনেক জিনিস জেমসের কাছ থেকে কিনেছেন। তবে এবার আলখেল্লাগুলো দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ওগুলো নকল। শুধু চকলেট জাগগুলো কিনলেন তিনি। তারপর জেমস প্রাচীন একটা পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। পাণ্ডুলিপিটা লিখেছেন একজন স্প্যানিয়ার্ড, যে কিনা ষোলোশো শতাব্দীর প্রথম দিকে মায়াদের সঙ্গে বসবাস করেছিল। জেমস জানতে চায় পাণ্ডুলিপিটা নির্ভেজাল কিনা।

স্প্যানিয়ার্ড লোকটার নাম উলমা দে পেলায়েজ। পাণ্ডুলিপিটা আসলে একটা চিঠি। চিঠিটা উলমা দে পেলায়েজ তাঁর দুই ছেলের নামে লিখেছিলেন।

প্রফেসরের অনুরোধে শেলফ থেকে অ্যাটলাস নামিয়ে মেক্সিকোর ম্যাপ বের করল রানা। ম্যাপটার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রফেসর বললেন, মেক্সিকোর ইতিহাস জানা থাকলে তাঁর বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হবে রানার। মেক্সিকোর ম্যাপে আঙুল রাখলেন তিনি, টামপিকো উপকূলের কাছাকাছি। তারপর তিনি আবার শুরু করলেন। পনেরো শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে স্প্যানিয়ার্ডদের যেখানে নজর পড়েছিল, আজ সেটাই মেক্সিকো নামে পরিচিত। ওই জায়গা সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব গল্প-গুজব প্রচলিত ছিল, বলা হত দুনিয়ার বেশিরভাগ সম্পদ ওখানে জড়ো করা আছে। স্প্যানিয়ার্ডরা সেই লোভেই ওদিকে পাড়ি জমায়। আঙুল দিয়ে গালফ অব মেক্সিকোকে দেখালেন বেলফোর্স।

পনেরোশো সতেরো সালে হার্নান্দেজ দে কর্ডোবা মেক্সিকো উপকূলে অভিযান চালান, পনেরোশো আঠারো সালে আসেন জুয়ান দে গ্রিজালভা। পনেরোশো উনিশ সালে হারনান কর্টেস উপকূল থেকে ভেতর দিকে ঢুকে পড়েন। পরের ঘটনা সবার জানা। আজটেকরা তাঁকে বাধা দিয়ে সুবিধে করতে পারেনি। কর্টেস-এর লোকবল ছিল, ছিল বুদ্ধি আর প্রশাসনিক দক্ষতা। তবে আজটেকদের পরাজিত করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যতটা আশা করেছিলেন ততটা সোনা তাঁকে দিতে পারেনি আজটেকরা। তারপর তিনি জানতে পারলেন দখল করার মত আরও জগৎ আছে। সেগুলো সবই দক্ষিণে, মায়া সভ্যতা নামে পরিচিত—আজকের ইউকাটান, গুয়েতেমালা ও হণ্ডুরাস। তাঁর কানে এল, মায়াদের রাজ্যে সোনার কোন অভাব নেই, যতই লুঠ করা হোক; তা নাকি কোনদিন শেষ হবার নয়। কাজেই পনেরোশো পঁচিশ সালে মায়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরুলেন তিনি। টেনোচিটিটলান, আজকের নিউ মেক্সিকো থেকে রওনা হলেন, উপকূলে পৌঁছুলেন কোয়াটজাকুয়ালান-এর কাছে, ভেতরে ঢুকে লেক পেটান হয়ে পৌঁছে গেলেন কোবান-এ। এত কষ্ট করেও খুব বেশি কিছু পাননি তিনি, কারণ মায়াদের মূল শক্তি আর সম্পদ আনাহুয়াক মালভূমিতে ছিল না, ছিল ইউকাটান পেনিনসূলায়।

এরপর অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয় কর্টেসকে, কারণ স্পেনে ডেকে নেয়া হয় তাঁকে। পরবর্তী অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠানো হয় 'ফ্রান্সিসকো দে মনটেজো'কে, যিনি আগেই সাগরপথে ইউকাটান উপকূল ঘুরে গেছেন। যথেষ্ট শক্তি নিয়েই অভিযানে আসেন মনটেজো, কিন্তু মায়ারা আজটেকদের তুলনায় ঠিক উল্টো আচরণ করে তাঁর সঙ্গে—প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা, পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। মনটেজো তো আর কর্টেস ছিলেন না, প্রথম দিকের কয়েকটা যুদ্ধেই স্প্যানিয়ার্ডরা হেরে ভূত হয়ে যায়।

মনটেজোর সঙ্গে ছিলেন উলমা দে পেলায়েজ। সম্ভবত সাধারণ একজন পদাতিক সৈনিকই ছিলেন তিনি, তবে তাঁর ভাগ্যে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। মায়ারা তাঁকে বন্দী করলেও, খুন করেনি; ক্রীতদাস ও মাস্কট হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে। মনটেজো যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু তিনি ইউকাটান মায়াদের পরাজিত করতে পারেননি। আসলে কখনোই ওরা কারও কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। মায়ারা দুর্বল হয়ে পড়েছে, পিছু হটেছে, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তারা হার মানেনি। বিশ বছর পর, পনেরোশো উনপঞ্চাশ সালে দেখা গেল, ইউকাটান পেনিনসূলার মাত্র অর্ধেকটা দখল করে আছেন মনটেজো। বাকি অর্ধেকটা, অভ্যন্তর ভাগ, মায়াদের দখলে থেকে যায়। এতগুলো বছর সেখানেই বন্দী জীবন কাটান উলমা দে পেলায়েজ।

বন্দী হলেও ছেলেদের নামে একটা চিঠি লেখেন উলমা দে পেলায়েজ, সেই চিঠি লোক মারফত পাঠাতেও পারেন। ব্রীফকেস খুলে ইংরেজিতে অনুবাদ করা চিঠিটা বের করলেন প্রফেসর বেলফোর্স, পড়তে দিলেন রানাকে।

আমার দুই পুত্র, সাইমি ও জুয়ান দে পেলায়েজ, তোমাদের বাবা উলমা দে

পেলায়েজ-এর অঢেল ভালবাসা আর স্নেহ গ্রহণ করো।

বাছারা, বাবা মারা গেছে ভেবে তোমরা শোক পালন করো না। কারণ আমি বেঁচে আছি, বেঁচে আছি বহাল তবিয়তে। তবিয়ত ভাল, তবে মায়ারা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। সেজন্যেই দীর্ঘ এত বছর চেষ্টা করেও তোমাদেরকে নিজের কুশল জানিয়ে কোন বার্তা পাঠাতে পারিনি। এখান থেকে পালিয়ে সভ্য জগতে ফিরে যাবার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমি, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। মায়াদের এই শহরের নাম ওয়াশওয়ানোক, যত দিন বেঁচে আছি এখানেই আমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

হারনান কর্টেস যখন টেনোচিটিটলান দখল করেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তোমাদের জানার কথা কর্টেস আর আমি স্পেনের একই প্রদেশে জন্মেছি। কর্টেসকে স্পেনে ডেকে নেয়া হলো, তারপর আমি ফ্রান্সিসকো দে মনটেজোর সঙ্গে ইউকাটান মায়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরুলাম। সেটা ছিল পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের কথা। কোম্পানীতে আমার পজিশন ভালই ছিল, একদল স্প্যানিশ সৈনিকের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। তারপর দীর্ঘ বারোটা বছর পার হয়ে গেছে।

মনটেজো মানুষ ভাল ছিলেন, আর মায়াদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবার সেটাই আসল কারণ। বাছারা, যুদ্ধে জিততে হলে শঠ, নিষ্ঠুর আর অসৎ হতে হয়। মনটেজোর এসব গুণ ছিল না। কাজেই সামরিক নেতা হিসেবে তাঁকে অযোগ্যই বলতে হবে। তাঁর এই অযোগ্যতার জন্যে ইউকাটানের বাকি অর্ধেক স্পেনের দখলে আসেনি। অথচ এই বাকি অর্ধেকই মায়াদের ধন ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত।

তোমাদেরকে বলি, ইউকাটান দুনিয়ার অন্য কোন এলাকার মত নয়। অভিযানের শুরুতে আমরা যে বনভূমি দেখতে পাই তার সঙ্গে তুলনা চলে এমন বনভূমি পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে বিশ্বাস করি না। আকারে এই বনভূমি এত বিশাল, গোটা স্পেনকে ঢেকে ফেলতে পারে। জঙ্গলের ভেতর বাহন হিসেবে আমরা ঘোড়াগুলোকে ব্যবহার করতে পারিনি, কারণ গায়ে গায়ে লেগে থাকা গাছপালার মাঝে পা ফেলার কোন জায়গা পায়নি ওগুলো। জঙ্গলই প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল সামনে, আমরা এগোবার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। তারপর শুরু হলো ঘোড়াদের মড়ক। অগত্যা ঘোড়া ছাড়াই রওনা হলাম আমরা। জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করে এগোনো, সে যে কি কঠিন কষ্টকর কাজ, বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের আরেকটা দুর্ভাগ্য হলো, বিশাল এই জঙ্গলে পানির সাংঘাতিক অভাব। ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র। যেখানে পানি প্রায় নেই বললেই চলে সেখানে এত ঘন ভাবে গাছপালা জন্মায় কিভাবে? বৃষ্টি হয় বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে, সে পানি নিরেট মাটি সরাসরি শুষে নেয়, ফলে এ-দেশে কোন ঝর্ণা বা নদী সৃষ্টি হতে পারেনি। তবে দু'এক জায়গায় পুল বা কুয়া আছে, মায়ারা সেগুলোকে সিনোট বলে, ওগুলোর পানি বেশ তাজা। যদিও এই পানির উৎস সচল কোন ঝর্ণা নয়, মাটির নিচের ভাণ্ডার থেকে উঠে আসে। এ-ধরনের সিনোট সংখ্যায় যেহেতু কম, মায়ারা তাই ওগুলোকে

পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করে। সিনোটকে ঘিরেই তারা মন্দির তৈরি করে, দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্যও দান করে এই সিনোটেই। সিনোট যেহেতু জীবনদায়িনী পানির উৎস, মায়াদের দুর্গ আর প্রতিরক্ষা পাঁচিলগুলোও সব এখানে। কাজেই পানি পাবার জন্যে মায়াদের সঙ্গে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়।

মায়ারা সাংঘাতিক একগুঁয়ে। পবিত্র ঈশ্বরপুত্রের কথা তারা শুনতে চাইল না, কানে তুলো গুঁজে রাখল। শুধু তাই নয়, আমাদের শান্তির বাণী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল তারা, এবং আমাদেরকে তাড়াবার জন্যে যুদ্ধ শুরু করে দিল।

মায়াদের অস্ত্রগুলো সেকেলে। বর্শা, বল্লম আর তলোয়ারগুলো কাঠের তৈরি, কিনারায় পাথরের ফলা। তবে সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাছাড়া, বনভূমির গোপন পথগুলো নিজেদের তৈরি বলে খুঁজে নিতে ওদের কোন অসুবিধে হত না। প্রতিটি পথে আমাদের জন্যে ফাঁদ পাতল তারা। আমরা সংখ্যায় আরও কমে যেতে লাগলাম। এরকম একটা ফাঁদ এড়াতে গিয়েই, আমি, তোমাদের বাবা, মায়াদের হাতে বন্দী হলাম—লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি।

ধরার পরই আমাকে একটা পোলের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। পোল সহ আমাকে বয়ে নিয়ে এল ওরা। অসংখ্য পথ পার হয়ে এলাম, প্রতিটি বিপজ্জনক আর দুর্গম। প্রতিটি সামরিক ঘাঁটিতে জেরা করা হলো আমাকে। ওদের ভাষা টোলটেক ভাষার চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়, তবে প্রথম দিকে না বোঝার ভান করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলাম আমি। বাছারা, যীশুর আর মেরির কিরে, তোমাদের বাবা স্বদেশের সঙ্গে বেঈমানী করেনি।

আমি ধরে নিয়েছিলাম মায়ারা আমাকে খুন করবে। কিন্তু করেনি মাথার চুলের জন্যে। এরকম সোনালি চুল আগে ওরা দেখেনি কখনও। ওদের একজন পুরোহিত নানাভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় যে চুলগুলো রঙ করা নয়। সর্বশেষ সামরিক ঘাঁটি থেকে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে এল বিশাল এক শহর চিচেন ইটজায়। এই শহরে প্রকাণ্ড এক সিনোট আছে। মায়ান ভাষায় চিচেন শব্দটার মানে হলো কুয়ার মুখ। এই কুয়ার ভেতর কুমারী মেয়েদের ফেলা হয়, দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। এ স্রেফ শয়তানদের নিষ্ঠুর ধর্মীয় আচার!

চিচেন ইটজায় একজন কিসাককে দেখলাম আমি। রাজনৈতিক নেতাদের কিসাক বলা হয়। ইনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, পরনে এমব্রয়ডারি করা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট আর পালকের তৈরি আলখেল্লা। পুরোহিত আর গণ্যমান্য লোক জন সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকেন। ইনি আরেকবার আমাকে জেরা করলেন। কিন্তু আমি না বোঝার ভান করে চুপ করে থাকলাম। তবে এখানেও আমার চুলের খুব কদর পেলাম। পুরোহিতরা চিৎকার করে আমাকে কুলকুলকান বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। টোলটেক ভাষায় কুলকুলকান মানে হলো কোয়েটজাকোটল—শ্বেতাঙ্গ দেবতা, পশ্চিম থেকে যার নাকি

আসার কথা। বিধর্মীদের এই ধারণা আমার জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করল।

চিচেন ইটজায় এক মাস আমাকে একটা সেলে আটকে রাখা হয়, তবে অন্য কোনভাবে নির্যাতন করা হয়নি। ওদের ফলানো শস্য থেকে তৈরি খাবার খেতে দিত, মাংসও দিত, আর দিত তিক্ত একটা পানীয়, ওরা যেটাকে চোকোলাটল বলে। এক মাস পর কড়া পাহারার মধ্যে ওদের প্রধান শহর ওয়াশওয়ানোকে নিয়ে আসা হয় আমাকে। সেখানেই এখন আছি আমি। এখানকার প্রহরীরা অভিজাত বংশ থেকে এসেছে, ব্যবহার বেশ ভাল। তারা সবাই উন্নতমানের বর্ম পরে থাকে। শহরে আমাকে চলাফেরা করতে দেয়া হয়, যদিও পায়ে ভারী চেইন আছে। চেইনগুলো সবই সোনার তৈরি।

ওয়াশওয়ানোক বেশ বড় শহর, বড় আকৃতির বিল্ডিং আর অনেকগুলো মন্দির আছে। কুলকুলকান মন্দিরটাই সবচেয়ে বড়, পালকের তৈরি সরীসৃপ দিয়ে সাজানো। প্রথমে এখানেই আমাকে নিয়ে আসা হয়, পুরোহিতরা যাতে আমাকে পরীক্ষা করে বলতে পারে আমি তাদের প্রধান দেবতা কুলকুলকান কিনা। আমাকে নিয়ে পুরোহিতদের মধ্যে তর্ক বেধে যায়। একদল বলল, আমি যদি তাদের প্রধান দেবতাই হব, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলাম কেন? আরেক দল উত্তর দিল, আমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, অপরাধ আর পাপ আছে, কাজেই কুলকুলকান তো শিষ্যদের নিয়ে আমাদেরকে শাস্তি দিতে আসতেই পারেন। প্রথম দল বলল, চুল সোনালি হলেও, এই লোক আমাদের ভাষা জানে না, কাজেই সে কুলকুলকান হতে পারে না। দ্বিতীয় দল জবাব দিল, কোন দুঃখে দেবতা মর্ত্যলোকের ভাষা ব্যবহার করবেন, তাঁর নিজের ভাষা যেখানে স্বর্গীয়, পবিত্র ও নিখুঁত?

পরীক্ষা চলছে, আর ভয়ে মরে যাচ্ছি আমি। যদি প্রমাণ হয় আমি কুলকুলকান নই, ওরা আমার শরীর থেকে তাজা হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বের করে আনবে। আর আমাকে যদি প্রধান দেবতা বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে সারাজীবন ওদের পুজো পাব। আমার জন্যে দুটোই খারাপ। কারণ একজন সাচ্চা খ্রিশ্চান হিসেবে নিজেকে আমি দেবতা ভাবতে পারি না, ভাবলে সেটা হবে অক্ষমনীয় পাপ।

পুরোহিতরা একমত হতে না পেরে আমাকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে এলেন। রাজা মায়াদের তুলনায় লম্বা, তবে আমাদের তুলনায় তা বলা চলে না। হামিংবার্ডের উজ্জ্বল পালক দিয়ে তৈরি তাঁর আলখেল্লা। তিনি একটা সোনার তৈরি সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর মাথার পিছনে সোনারই তৈরি পালক ও মূল্যবান রত্ন বসানো একটা সরীসৃপ। তিনি তাঁর রায়ে বললেন, আমাকে বলি দেয়া যাবে না, বাঁচিয়ে রেখে মায়াদের ভাষা শেখাতে হবে, এক সময় যাতে নিজেই বলতে পারি আমি কি বা কে।

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল আমার, তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিতের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো আমাকে, তিনি কুলকুলকান মন্দিরে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিন পরই দেখতে

পেলাম শহরে চলাফেরা করতে ওরা আমাকে কোন বাধা দিচ্ছে না, তবে যেখানেই যা-ই সঙ্গে দু'জন প্রহরী থাকে। পায়ে অবশ্য বেড়ি জোড়াও থাকল। বহু বছর পর আমি জানতে পারি ওরা আমাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অনুমতি দিয়েছিল এই ভয়ে যে আমি যদি সত্যি সত্যি কুলকুলকান হই। ওই একই কারণে পায়ে সোনার বেড়ি পরানো হয়—সোনাই তো দেবতাদের ধাতু, তাই না?

ভাষাটা জানাই ছিল, তবু ওদেরকে বুঝতে দিলাম শিখতে আমার সময় লাগছে। এই সময় মন্দিরে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমি। কুলকুলকানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অনেক তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছায় বলি হতে আসত। শুকনো রক্তের দাগ পড়া বেদীতে তোলা হত তাদের, শরীরে তেল মাখানো হত, মাথা ঢেকে দেয়া হত ফুলে ফুলে। পুরোহিতরা জ্যান্ত শরীর থেকে বুক চিরে ছিঁড়ে আনতেন হৃৎপিণ্ড, সেই রক্তঝরা হৃৎপিণ্ড ঝুলিয়ে রাখা হত বেদীতে শুয়ে থাকা তরুণ বা তরুণীর সামনে, ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে যেত তাদের দৃষ্টি। ধর্মবিরোধী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হতাম আমি, প্রহরীরা আমার দুই হাত শক্ত করে ধরে রাখত, ছুটে যাতে পালাতে না পারি। চোখ বুজে যীশু আর মেরিকে ডাকতাম আমি।

শহরের মাঝখানে একটা সিনোট আছে, সেখানেও নানা অজুহাতে লোকজনকে বলি দেয়া হয়। শহরটাকে একটা রিজ পুব ও পশ্চিমে দু'ভাগ করে রেখেছে। রিজ-এর মাথায় এই সিনোটে যে মন্দিরটা আছে তার নাম ইয়াম চ্যাচ। ইয়াম চ্যাচ হলো বৃষ্টির দেবতা। বোকা মায়ারা বিশ্বাস করে এই বৃষ্টির দেবতা সিনোটের তলায় বাস করেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সিনোটে ইয়াম চ্যাচকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অক্ষতযোনি কুমারী বলি দেয়া হয়। পাহাড়-প্রাচীরের নিচে গভীর একটা পুল এই সিনোট, হাত-পা বেঁধে মেয়েগুলোকে ফেলে দেয়া হয়। বর্বর পাষণ্ডদের এই অনুষ্ঠানে আমি কখনও যাইনি।

রাজা রায় দেয়ার পর এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে, এই সময় হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। এখানে উল্লেখ করা দরকার, পাথর আর সোনার কাজে খুব দক্ষ ছিল মায়ারা। কিন্তু পাথর আর সোনা দিয়ে তারা শুধু দেবতাদের মূর্তি বানাত। তাল তাল ভারী সোনা পরত তারা, কিন্তু সেগুলোকে অলঙ্কার বলা যায় না। বাছারা, তোমরা জানো, আমার বাবা অর্থাৎ তোমাদের দাদু সেভিল শহরে স্বর্ণকার হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। ছোটবেলায় আমি তার হাঁটুর ওপর বসে কাজটা শিখি। এখানে বন্দী জীবন কাটাবার সময় আমি লক্ষ করলাম মৌমাছির চাক থেকে পাওয়া মোম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় মায়ারা তা জানে না। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। পুরোহিতদের অনুরোধ করলাম, আমাকে খানিকটা সোনা আর মোম দেয়া হোক, আরও দেয়া হোক সোনা গলাবার জন্যে একটা ফার্নেস।

আমার অনুরোধ রক্ষা করা হলো। আমি কি করি দেখার জন্যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরে কিশোরী এক মেয়ে ছিল, বয়েস চোদ্দর বেশি হবে না, আমার ফাই-ফরমাশ খাটত। প্রথমে মোম দিয়ে তারই একটা মডেল তৈরি

করলাম। মায়াদের কাছে প্যারিশিয়ান প্লাস্টার নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে মাটি আর পানি মিশিয়ে তৈরি কাদা ব্যবহার করতে হলো স্ট্যাচুর চারধারে। স্ট্যাচুর মাথার ওপর একটা ফানেলও তৈরি করলাম, ভেতরে তরল সোনা ঢালার জন্যে।

আমাকে ওরা মন্দিরের কামারশালা ব্যবহার করতে দিল। ফানেল দিয়ে স্ট্যাচুর ভেতর তরল সোনা ঢুকছে, সেই সঙ্গে ভেন্ট হোল থেকে গলে যাওয়া গরম মোম বেরিয়ে আসছে, দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে শোরগোল তুললেন পুরোহিতরা। আমার ভয় ছিল কাদার ছাঁচ ভেঙে যেতে পারে, তবে ভাগ্য ভাল যে ভাঙল না। কিশোরীর স্ট্যাচু দেখে পুরোহিতরা এতই মুগ্ধ হলেন যে আমার দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে রাজ দরবারে ছুটলেন। কিশোরীর স্বর্ণমূর্তি দেখে রাজাও বিস্মিত হলেন, নিজ কন্যাকে মন্দিরে পাঠাতে আপত্তি করলেন না। সময় নষ্ট না করে রাজকন্যারও একটা স্ট্যাচু তৈরি করলাম আমি। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিলাম রাজ-দরবারে। রাজা আমাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি গেলাম না, প্রধান পুরোহিতকে দিয়ে খবর পাঠালাম—আর এক মাস পর আমার বন্দী জীবনের বর্ষপূর্তি হতে যাচ্ছে, সেদিন আমাকে মায়াদের ভাষায় জানাতে হবে আমি কি ও কে, রাজার সামনে দাঁড়াবার জন্যে ওই দিনটাই আমার পছন্দ।

পরবর্তী এক মাসে সোনা গলিয়ে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার বানালাম আমি। এ-ধরনের মনোহর অলঙ্কার মায়ারা কখনও দেখেনি। রাজ-দরবার থেকে নির্দেশ এল, আমি যেন কামারশালার কারিগরদের আমার বিদ্যাটা শিখিয়ে দিই। দিলামও তাই। শহরের গণ্যমান্য লোকজন, কাসিক, বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিত, রাজ পরিবারের সদস্য, সবাই ভিড় করলেন আমার চারপাশে। তাল তাল সোনা নিয়ে এসেছেন তাঁরা, আমাকে দিয়ে অলঙ্কার বানাবেন।

এক মাস পর প্রচুর অলঙ্কার নিয়ে রাজ-দরবারে হাজির হলাম আমি। প্রধান পুরোহিত রাজার সামনে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি মায়ান ভাষায় নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারব? জবাবে আমি বললাম, পারব। সত্যি কথাই বললাম আমি, বললাম যে আমি আসলে কুলকুলকান নই। রাজাকে জানালাম, পুবদিক থেকে এসেছি আমি, অভিজাত বংশে জন্ম আমার, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মহান সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর বিশ্বস্ত একজন প্রজা। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের নির্দেশেই মায়াদের রাজ্যে এসেছি আমি, উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা।

পুরোহিতরা প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধে ফিসফাস শুরু করলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মায়াদের দেবতারা যথেষ্ট শক্তিশালী, কাজেই অন্য কোন দেবতা তাঁদের দরকার নেই। মায়াদের মধ্যে অচেনা ও বিদেশী দেবতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার অপরাধে আমাকে হত্যা করতে চাইলেন তাঁরা।

এবার আমি আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তার পরিচয় দিলাম। রাজাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কন্যার মূর্তি বানিয়েছি আমি, রাজকীয় কামারশালার কারিগরদের অলঙ্কার বানাতে শিখিয়েছি, এবং সৎ সাহসের

পরিচয় দিয়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেছি—নিজেকে কুলকুলকান বলে দাবি করিনি—কাজেই আমি জানতে চাই, আমার মত একজন সত্যবাদী শিল্পীকে আপনিও কি বলি দিতে চান?

উত্তরে হাসলেন রাজা। তারপর নির্দেশ দিলেন। না, আমাকে বলি দেয়া হবে না। আমাকে একটা বাড়ি ও চাকর-চাকরানী দেয়া হবে। আমার কাজ হবে কামারশালার কারিগরদের আরও অলঙ্কার বানাতে শেখানো। তবে একটা ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন তিনি। মায়াদের মধ্যে আমি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে পারব না।

নিজের একটা বাড়ি হলো আমার। চাকরানীরা আমার আরাম-আয়েশের দিকে খেয়াল রাখে। রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে কারিগররা আমার কাছে কাজ শিখতে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে আমার পায়ের বেড়ি খুলে নেয়া হয়েছে।

পরবর্তী এক বছরে দু'বার পালাই আমি, দু'বারই জঙ্গলে পথ হারিয়ে মরতে বসেছিলাম রাজার সৈনিকরা আমাকে খুঁজে বের করে, ফিরিয়ে আনে ওয়াশওয়ানোকে। তবে পালাবার অপরাধে রাজা আমাকে কোন শাস্তি দেননি। পরের বছর আবার আমি পালালাম, এবং আগের মতই সৈনিকদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। এবার রাজা চোখ গরম করে জানিয়ে দিলেন, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছে, কাজেই এরপর পালাতে চেষ্টা করলে সিনোটে আমাকে বলি দেয়ার নির্দেশ দেবেন তিনি।

কাজেই তারপর থেকে আমি আর পালাতে চেষ্টা করিনি। এই শহরে দীর্ঘ বারোটা বছর কাটিয়ে দিলাম। বাছারা, এখন মায়ারা আমাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করে। হাট-বাজারে যখন যাই, প্রহরীরা সঙ্গে থাকে বটে, তবে তারা এখন আমার বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। মায়াদের মন্দিরে এখন আর আমি যাই না। নিজের বাড়ির এক কোণে যীশু আর মেরির নামে ছোট একটা চ্যাপেল বানিয়েছি, সেখানে আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি। আগেই বলেছি, আমার প্রহরীরা সবাই ভাল বংশ থেকে এসেছে, পরম সত্য ও জ্ঞান সম্পর্কে তাদের আগ্রহ আছে। ওদেরকে আর ওদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে যীশু আর মেরির গল্প শোনাই আমি। গোপনে কয়েকজনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছি।

ওয়াশওয়ানোক শহরটা সোনায় ভর্তি। এমনকি মন্দিরগুলোর ছাদে বৃষ্টির পানি নামানোর জন্যে যে নর্দমা তৈরি করা হয়েছে সেগুলোও সোনার তৈরি। শহরের সবাই, আমিও, কিচেনে সোনার তৈজস-পত্র ও বাসন-কোসন ব্যবহার করি। আমার ধারণা, মায়ানদের শরীরে সম্ভবত মিশরীয়দের রক্ত বইছে, কারণ মিশরীয়দের অনুকরণে ওরাও নিজেদের শহরে পিরামিডের ধাঁচে অনেক মন্দির তৈরি করেছে। তবে রাজার প্রাসাদটা চারকোনা বিল্ডিঙ, ভেতর ও বাইরে সোনার পাত দিয়ে মোড়া, এমনকি মেঝেগুলোও তাই। মায়ানরা এনামেলের এত ভাল কাজ জানে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই বিদ্যা তারা আগে শুধু দেবতার মূর্তি তৈরিতে ব্যবহার করত, এখন অলঙ্কার তৈরিতেও ব্যবহার করছে। সোনার কথায় ফিরে আসি আবার। শহরের সাধারণ মানুষের কাছেও

প্রচুর সোনা আছে। কেউ কেউ এত বেশি অলঙ্কার ব্যবহার করে যে সেগুলোর ভারে হাঁটতে কষ্ট পায়। এত সোনা কোত্থেকে আসে, আমি জানি না। প্রহরী আর পুরোহিতদের প্রশ্ন করায় তারা হাসে, ইঙ্গিতে মাটির তলা দেখায় আমাকে। সোনার প্রয়োজন হলে রাজপরিবারের লোকজনকে দেখেছি একদল শ্রমিক নিয়ে খোলা মাঠে চলে যায়। দেখেছি মাটি খুঁড়ে মণকে মণ, টনকে টন সোনা বের করা হচ্ছে। না, এ-সব সোনা মাটির তলায় প্রাকৃতিকভাবে জমা হয়নি, কোথাও থেকে নিয়ে এসে মাটির তলায় জমিয়ে রাখা হয়েছিল। কোত্থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা আনা হয়েছে, আমি জানি না। পুরোহিতরা কিছু বলে না। প্রহরীরাও চুপ করে থাকে। শুধু স্বীকার করে, মাটির তলা থেকে যত সোনাই তোলা হোক, তা কোনদিন শেষ হবার নয়। আরও জানতে পেরেছি, মাটির তলার সমস্ত সোনার মালিক রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যরা।

জীবনটা আমার নির্বিঘ্নেই কেটে যাচ্ছে। রাজা আমাকে প্রায় বন্ধুর মতই গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে নানা ধরনের উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। মাঝে মধ্যে গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন একা একা কাঁদি। কাঁদি দেশের জন্যে, কাঁদি তোমাদের জন্যে। জানি কোনদিন আর আমার স্পেনে ফেরা হবে না। আমি কোনদিনই আমার প্রিয় সন্তানদের আর দেখতে পাব না।

এবার, বাছারা, আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, আমার পাণ্ডুলিপির এই অংশটুকু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে তোমরা। মায়াদের এই রাজ্যে অনেক বিস্ময়কর চিহ্ন আমি দেখেছি। সবচেয়ে বড় বিস্ময়টা হলো সোনার একটা পাহাড়। ওটা দেখে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে যীশুর কোমল হাত দুনিয়ার সবগুলো প্রান্ত জড়িয়ে রেখেছে, তাঁর ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত এলাকা কোথাও নেই। ওই সোনার পাহাড়ে জ্বলন্ত সোনালি চিহ্ন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পাহাড়টা শহরের মাঝখান থেকে মাত্র এক পা দূরে। ওটার উজ্জ্বলতা মায়াদের রাজপ্রাসাদগুলোকে ম্লান করে দেয়। এই চিহ্নের একটাই অর্থ হতে পারে বলে আমার ধারণা। আর তা হলো, খ্রিশ্চানরা এই শহর দখল করবে, বিতাড়িত করবে মূর্তি-পূজারীদের, তাদের মন্দির আর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে যীশুর বাণী প্রচার করবে। ওয়াশওয়ানোকের পাহাড় আর মাটির তলায় কত সোনা আছে আমি জানি না—হয়তো কয়েকশো টন, হয়তো কয়েক হাজার টন। পরিমাণ যাই হোক, পাহাড়ের ওপর চিহ্ন দেখে আমি উপলব্ধি করেছি, এ-সবই খ্রিশ্চানদের প্রাপ্য। আর যেহেতু খ্রিশ্চানদের মধ্যে একমাত্র আমিই ওটা দেখেছি, সেই সূত্রে এসবই আমার পরিবারের প্রাপ্য। অর্থাৎ আমার দুই পুত্র সাইমি আর জুয়ান দে পেলায়েজই এ-সবের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী।

বাছারা, আমি চাই, দে পেলায়েজ পরিবারকে আবার তোমরা সুনাম আর প্রাচুর্যের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করো। আবার বলছি এই কারণে যে, স্পেনে দে পেলায়েজ পরিবার এককালে বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, আমরা

অভিজাত বংশ হিসেবেই গণ্য হতাম। মুররা এসে আমাদের সব সম্পদ কেড়ে নেয়, ফলে সাধারণ ছোটখাট ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় দে পেলায়েজরা। আমার বাবা স্বর্ণকার ছিলেন, ঈশ্বর আর ঈশ্বরপুত্রের প্রশংসা করে বলতে হয় যে বাবার কাজ কিছুটা শেখা ছিল বলে মায়াদের এই রাজ্যে আমার প্রাণ রক্ষা পায়। বেঁচে যখন গেছি, দে পেলায়েজ পরিবারকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করার এই সুযোগ আমি আমার সন্তানদের মাধ্যমে সফল করতে চাই। বাছারা, তোমাদেরকে আমি কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না, শুধু এই রাজ্যের ঠিকানা বাদে।

তবে একটা কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল নেই। তোমরা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি নিয়ে ব্যস্ত থাকো। সে-কারণেই এই রাজ্যের, রাজপ্রাসাদের আর সোনার পাহাড়ের সূত্র আমি দুই ভাগে তোমাদের দুইজনকে পাঠাচ্ছি। এই উপহার দুটো এমন এক চমৎকার কৌশলে বানানো হয়েছে, যে কৌশলটা আমার বাবা একজন আগন্তুকের কাছ থেকে শিখেছিলেন, যে আগন্তুককে মুররা পুবদিক থেকে কর্ডোবায় নিয়ে এসেছিল। কৌশলটা কি তা তোমরা আমার কাছ থেকে জেনেছ, তবে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাতে হবে, তা না হলে উপহার দুটোয় কি আছে দেখতে পাবে না। সূত্র পাবার পর কি করতে হবে নিজেরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। এই রাজ্য জয় করা, তারপর সমস্ত সম্পদ দখল করা, দু'এক বছরের কাজ নয়। হয়তো তোমাদের গোটা জীবন এর পিছনে ব্যয় করতে হবে। কিভাবে কি করলে তোমরা সফল হবে, তা আমি তোমাদেরকে জানাতে পারছি না। তবে সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবার কৌশলটা এখানে কাজে আসতে পারে বলে ধারণা করি। যদি পৌঁছুতে পারো, রাজার বন্ধু হতে চেষ্টা করবে। তোমাদের সোনালি চুল প্রশংসা-পত্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে। রাজার বন্ধু হতে পারলে শহরের গভর্নর হতে পারাটা খুব কঠিন হবে না। তারপর পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে যা করার করবে।

যে উপহার দুটো পাঠালাম, তাতেই সমস্ত সূত্র দেয়া থাকল। যারা এই উপহার তোমাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে তারা আমার শিষ্য, আমি ওদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছি। ওদেরকে আমি গোপনে স্প্যানিশ ভাষাও শিখিয়েছি, ওরা যাতে তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে গিয়ে কোন বিপদে না পড়ে। ওদের যত্ন নেবে তোমরা, যথাযোগ্য সম্মান দেবে।

বাছারা, অভিযানে বেরুবে ঈশ্বরের নাম নিয়ে। জঙ্গলের ভেতর তোমাদের শত্রুরা ফাঁদ পেতে রাখবে, সে-ব্যাপারে সাবধান থেকো। তোমাদের আমি সৈন্যদলে নাম লেখাতে দেখে এসেছি, কাজেই ধরে নিচ্ছি এতদিনে তোমরা যুদ্ধে দক্ষ হয়ে উঠেছ। আরেকটা কথা—অভিযানের নেতৃত্ব তোমাদের দুই ভাইয়ের হাতে থাকা চাই।

এমন হতে পারে যে এই পাণ্ডুলিপি ও উপহার যখন তোমাদের হাতে পৌঁছুবে তখন আর আমি এই দুনিয়ায় থাকব না।

এই পাণ্ডুলিপি লেখা হলো খ্রিস্ট সালের এক হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ বছরে।

উলমা দে পেলায়েজ
আদি নিবাস—স্পেন
হার্নান্দো কর্টেস এবং ফ্রান্সিসকো দে মনটেজোর বন্ধু।

চিঠিটা ফাইলে রেখে দিয়ে রানা বলল, 'এবার শোনা যাক, ওয়াশওয়ানোক শহরটা সম্পর্কে আপনাদের কার কি ধারণা। উলমা দে পেলায়েজের সূত্র ধরে এখনও নিশ্চয়ই শহরটা কেউ আবিষ্কার করেনি?'

'না, সে সুযোগ এখনও কেউ পায়নি,' জবাব দিল রিমরিগো। 'উলমা তাঁর দুই ছেলেকে সূত্রগুলো ভাগাভাগি করে দেন। কিছু তথ্য ছিল প্রথম ট্রেতে, কিছু তথ্য ছিল দ্বিতীয় ট্রেতে। দুটো ট্রে এক করে মিলিয়ে দেখলে তবে সূত্রগুলোর অর্থ বের করা সম্ভব।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'সেজন্যেই ট্রে দুটো খুঁজতে শুরু করি আমি। সতেরোশো বিরাশি সাল পর্যন্ত মেক্সিকান দে পেলায়েজ ট্রে-টার অস্তিত্ব ছিল, কারণ ওই সময়ই দিদিয়া ওটার কথা তাঁর বইতে লেখেন। আমি খোঁজ নিতে শুরু করি তারপর ওটা গেল কোথায়···'

খুক খুক করে কেশে নিঃশব্দে হাসতে লাগল রিমরিগো।

'মানলাম,' রাগ চেপে বললেন বেলফোর্স, 'আমার বোকামি হয়েছে।' রানার দিকে ফিরে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন একটু। 'ট্রে-টার খোঁজে গোটা মেক্সিকো চষে ফেলার পর, অবশেষে ওটা আমি আমার নিজেরই মিউজিয়ামে খুঁজে পাই—বিশ্বাস করুন বা না করুন, বহু বছর ধরে আমিই ওটার মালিক ছিলাম।'

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল রিমরিগো। 'এখানে আপনি আমার কাছে হেরে যান। ওটা যে আপনার মিউজিয়ামে আছে, আমিই তা প্রথমে জানতে পারি।' হঠাৎ অদৃশ্য হলো মুখের হাসি। 'কিন্তু তারপরই আপনি ওটা মিউজিয়াম থেকে সরিয়ে ফেললেন।'

রানা অস্বস্তিবোধ করছে। 'নিজের কাছে আছে, অথচ জানলেন না, এ কিভাবে সম্ভব?'

'কেন, মি. বয়কটের কাছে ছিল না? তিনি কি জানতেন?' প্রফেসর প্রশ্ন করলেন। 'তবে আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমি একটা ট্রাস্ট গঠন করি, আরও অনেক কিছুর মত ওই ট্রাস্ট একটা মিউজিয়ামও পরিচালনা করে। মিউজিয়াম কি কেনে না কেনে সব সময় আমি তা জানতে পারি না। ট্রে-টা কবে বা কার কাছ থেকে কেনা হয়েছে, আমার জানা ছিল না।'

'দ্বিতীয় ট্রের গল্পটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'প্রশ্নটা আমাকে করুন,' দ্রুত বলল রিমরিগো। 'কারণ পারিবারিক সূত্রে আমিই ওটার মালিক।'

রানা অপেক্ষা করছে।

রিমরিগো শুরু করল, 'ব্যাপারটা একটু জটিল। উলমা দে পেলায়েজের দুই সন্তান, ঠিক আছে? সাইমি দে পেলায়েজ আর জুয়ান দে পেলায়েজ। সাইমি মেক্সিকোতেই থেকে যান, প্রতিষ্ঠিত করেন পেলায়েজ পরিবারের মেক্সিকান শাখা। এই পরিবারটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আপনি সব কথা জেনেছেন। এবার জুয়ান দে পেলায়েজের প্রসঙ্গে আসুন। তিনি স্পেনে ফিরে যান, এবং নামের আগে আলফাঁসো লাগিয়ে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চাশ বছর বয়েসে একটা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট হন তিনি। তাঁর অনেকগুলো ছেলে ছিল, তার মধ্যে একজন আলফাঁসো সারমাক দে পেলায়েজ। জাহাজ ক্রেনা-বেচার ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামান তিনি। পরে অনেকগুলো জাহাজের মালিকও হন…'

সংক্ষেপে রিমরিগোর গল্পটা হলো এরকম:

একটা সময় এল যখন ইংল্যান্ড আর স্পেনের মধ্যেকার বিরোধ চরম আকার ধারণ করল। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ সিদ্ধান্ত নিলেন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন তিনি। শুরু হলো আর্মাডা। আলফাঁসো সারমাক দে পেলায়েজ দ্বিতীয় ফিলিপকে নিজের একটা জাহাজ, 'সান জুয়ান দে হিউয়েলভা' দিয়ে সাহায্য করলেন, স্কিপার হিসেবে থাকলেন নিজেই। আর্মাডার সঙ্গে রওনা হলো জাহাজ, কিন্তু কোন দিন আর ফিরল না, সেই সঙ্গে চিরতরে হারিয়ে গেলেন আলফাঁসো সারমাক দে পেলায়েজও। তাঁর নিখোঁজ হবার পর জাহাজ ব্যবসা বন্ধ হয়নি, এক ছেলে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। আইনের বিচারে আলফাঁসো সারমাক দে পেলায়েজের অন্যান্য ভাইরাও এই জাহাজ ব্যবসার অংশীদার, কিন্তু তাদেরকে সারমাকের ছেলেরা বঞ্চিত করে। ভাইদের একজন, আলফাঁসো ইস্কিকো আমেরিকার নিউ ইয়র্কে চলে যান, সম্ভবত অভিমানবশতই দে পেলায়েজ উপাধিটা বাদ দিয়ে নতুন পরিচয়ে জীবন শুরু করেন। ওদিকে সারমাক দে পেলায়েজের ছেলে এবং তার উত্তরসুরিরা জাহাজ ব্যবসাটা ভালই চালাতে থাকেন—অন্তত আঠারোশো শতাব্দীর শেষদিকেও তাঁদের ব্যবসার অস্তিত্ব ছিল। ভাগ্যই বলতে হবে যে সারমাক পরিবার সমস্ত ঘটনার রেকর্ড রাখতে অভ্যস্ত ছিল। সেই রেকর্ড থেকে রিমরিগো জানতে পারে যে সারমাক দে পেলায়েজ তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখে একটা ট্রে পাঠাতে বলেছিলেন। তাঁর ভাষাটা ছিল এরকম— 'সেই ট্রে-টা পাঠাবে, যেটা আমার দাদু মেক্সিকোয় বানিয়েছিলেন'। ইংল্যান্ডের উদ্দেশে আর্মাডা রওনা হবার সময় তাঁর জাহাজেই ছিল ট্রে-টা। জাহাজের সঙ্গে সেটা ডুবে যায় বলেই ধরে নিয়েছিল রিমরিগো।

সারমাকের যে ভাই নিউ ইয়র্কে চলে আসেন, আলফাঁসো ইস্কিকো, রিমরিগো তাঁকে নিজের পূর্ব-পুরুষ বলে দাবি করছে। এ-ব্যাপারে প্রফেসর বেলফোর্সের মতামত চাওয়া হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রিমরিগোর এই দাবি সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে তার এই দাবির স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ সে দিতে পারবে কিনা আমার

সন্দেহ আছে।'

রানা বলল, 'কিন্তু দ্বিতীয় ট্রে-টা তো সত্যি সত্যি জাহাজের সঙ্গে ডুবে যায়নি। ওটা আমার কাছে রয়েছে। প্রশ্ন হলো, বয়কট পরিবারে ওটা এল কিভাবে?'

'রিমরিগোর মত আমিও জানতে পারি যে দ্বিতীয় ট্রে-টা জাহাজের সঙ্গে সাগরে ডুবে গেছে,' বললেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'কিন্তু ভুল ভাঙল লন্ডনে ছুটি কাটাতে এসে। অক্সফোর্ডের একটা কলেজে ছিলাম, আর্কিওলজির এক অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার সময় স্পেনে আমার অনুসন্ধান সম্পর্কে তাঁকে একটা ধারণা দিই। তিনি আমাকে ডিক ল্যাম্পনিকে লেখা একটা চিঠির কথা বলেন।'

'ডিক ল্যাম্পনি? আপনি কবি···'

'হ্যাঁ, বিখ্যাত কবি ডিক ল্যাম্পনির কথাই বলছি। ডীন প্রায়ার-এর রেক্টর ছিলেন তিনি, শহর থেকে দূরে। ক্যাসন নামে এক লোক তাঁকে একটা চিঠি লেখে। ক্যাসন স্থানীয় ব্যবসায়ী, গুরুত্বপূর্ণ কেউ না। ল্যাম্পনিকে লেখা বলেই তার চিঠি দীর্ঘ এত বছর যত্ন করে রেখে দেয়া হয়।'

রিমরিগোকে সতর্ক দেখাল। 'এই ব্যাপারটা আমার জানা নেই। বলে যান।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে? ট্রে-টা এখন কোথায় আমরা জানি।'

'তবু শুনি,' বলল রানা।

'রেক্টর হিসেবে তেমন কোন কাজ ছিল না, অবসর সময়ে সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ল্যাম্পনি। ক্যাসনের মুখে যা-ই তিনি শুনে থাকুন, নিশ্চয়ই খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তা না হলে ক্যাসনের কাছ থেকে লিখিত বক্তব্য চাইতেন না।'

সংক্ষেপে গল্পটা হলো, ক্যাসনের পূর্ব-পুরুষদের পারিবারিক নাম ছিল গ্যাসন, এবং তার দাদু সান জুয়ান নামে একটা জাহাজের নাবিক ছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের অভিযানে এই জাহাজটাও অংশ নেয়, ক্যাপটেন ছিলেন আলফাঁসো সারমাক দে পেলায়েজ। যুদ্ধে নয়, জাহাজগুলো একের পর এক সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যায়—স্টার্ট পয়েন্ট-এর কাছেই। ক্যাপটেন সারমাক দে পেলায়েজ আগেই মারা যান জ্বরে—টাইফয়েডে। জাহাজডুবির ঘটনায় গ্যাসন বেঁচে যায়। শুধু বাঁচেনি, সঙ্গে করে সারমাক দে পেলায়েজের ট্রে-টাও নিয়ে আসে। গ্যাসনের নাতি, ক্যাসন, ট্রে-টা ডিক ল্যাম্পনিকে দেখায়ও। সেটা বয়কট পরিবারে কিভাবে এল, প্রফেসর বেলফোর্সের তা জানা নেই।

প্রফেসর থামতে রিমরিগো বলল, 'অথচ আমি আদাজল খেয়ে জানতে চেষ্টা করছিলাম সান জুয়ান কোথায় ডুবেছে। এই তথ্য পাবার জন্যেই লন্ডনে আসি আমি, তারপর এখানকার খবরের কাগজে ট্রে-টার ছবি দেখতে পাই।'

'ভাগ্যের খেলা,' বলে মুচকি হাসলেন বেলফোর্স।

'প্রফেসর বেলফোর্স,' বলল রানা. 'আপনার ট্রে-টা নিশ্চয়ই আপনি খুঁটিয়ে

পরীক্ষা করেছেন। কি পেয়েছেন বলবেন আমাদের?'

'যা-ই পেয়ে থাকি, দুটো ট্রে এক না করলে অর্থ বের করা সম্ভব নয়,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন বেলফোর্স। 'এখন আমার জানার কথা হলো, আপনি কি আপনার ট্রে-টা বিক্রি করবেন? কি দাম চান বলুন, এখুনি একটা চেক লিখে দিই আমি···'

'আপনার এত টাকা নেই যে আমার চাওয়া দামে আপনি ট্রে-টা কিনতে পারবেন,' কঠিন সুরে বলল রানা, শুনে বিস্ময়ে চোখ মিটমিট করলেন বেলফোর্স। 'আমি নগদ টাকায় দাম না-ও চাইতে পারি। আপনি বসুন, আমার কি বলার আছে মন দিয়ে শুনুন।'

ধীরে ধীরে চেয়ারটায় আবার বসলেন বেলফোর্স, রানার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। রিমরিগো আর মারিয়ার দিকে ফিরল রানা, ওরাও ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। 'তিন শর্তে ট্রে-টা আমি হাতছাড়া করতে রাজি আছি,' বলল ও। 'চিন্তা করে দেখুন শর্তগুলো আপনারা মানবেন কিনা।'

'কি শর্ত বলুন, অন্তত শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই,' বললেন বেলফোর্স।

রিমরিগো উত্তেজিত ও আড়ষ্ট হয়ে আছে, কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'প্রফেসর বেলফোর্সের প্রচুর টাকা, সেটা আমাদের কাজে লাগবে। আমার প্রথম শর্ত হলো, ওয়াশওয়ানোক শহরটা খুঁজে বের করার জন্যে আমরা যে অভিযানে বেরুব, তার সমস্ত খরচ উনি দেবেন। এতে আপনার আপত্তি করার কোন কারণ নেই, প্রফেসর। এমনিতেও খরচটা করবেন আপনি। তবে অভিযানটায় আপনাদের সঙ্গে আমিও থাকব। রাজি?'

'অভিযানটা হবে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ওখানে আদিবাসী চিকলেরোরা আছে, ধরতে পারলে জ্যান্ত পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে। আর রেইন-ফরেস্ট সম্পর্কে কি বলব, ভয়ে স্থানীয় লোকজনই ওই জঙ্গলে ঢোকে না। আপনার মত শহুরে একজন সৌখিন ইনভেস্টিগেটর ওখানে···'

'সেটা আমার ব্যাপার,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'আপনি যদি ঝুঁকি নিতে রাজি থাকেন, আমার কিছু বলবার নেই।'

'আমার দ্বিতীয় শর্ত, বয়কটকে যারা খুন করেছে তাদেরকে শায়েস্তা করার কাজে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন।'

'কিন্তু আমরা যদি অভিযানে বেরুই, মি. বয়কটের খুনীকে সেখানে কিভাবে পাচ্ছি?'

'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না? যার হুকুমেই বয়কট খুন হয়ে থাকুক, ট্রে-টা তার দরকার ছিল। সে জানে ট্রেতে কোন্ সূত্র আছে। আমাদের ওপর নজর রাখছে সে। আমরা যেখানেই যাই, সে-ও আমাদের পিছু নেবে।'

'তা হতে পারে,' বিড়বিড় করলেন বেলফোর্স।

'আমার তৃতীয় শর্ত, আমাদের সঙ্গে রিমরিগোও থাকবেন।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বেলফোর্স হুঙ্কার ছাড়লেন, 'অসম্ভব! ওই বাঁদরটার সঙ্গে নিজেকে আমি কোনভাবেই জড়াব না।'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলুন!' তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল রিমরিগো।

'সবাই চুপ!' কড়া ধমক দিল রানা। নিস্তব্ধতা নেমে আসতে কঠিন সুরে বলল, 'আপনাদের আচরণে আমি অসুস্থ বোধ করছি। যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন থেকে আপনারা আর ঝগড়া করতে পারবেন না। এটাও আমার একটা শর্ত।'

রিমরিগো শান্ত হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু প্রফেসরকে একগুঁয়ে দেখাচ্ছে।

'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন, প্রফেসর,' বলল রানা। 'রিমরিগোকে বাদ দিয়ে আমরা যদি অভিযানে বেরুই, কি ঘটবে ভাবুন। উনি আর ওনার স্ত্রী আমাদের পিছু নেবেন। যেখানেই আমরা যাব, ওঁরা আমাদের ট্রেইল অনুসরণ করবেন। এখন, প্রফেসর, আপনি যদি রিমরিগোকে সঙ্গে রাখতে না চান, তাহলে ট্রে-টা ওকে না দিয়ে আমার উপায় থাকবে না। তার ফলে আপনাদের দু'জনের কাছেই একটা করে ট্রে থাকবে। অ্যাকাডেমিক ডগ-ফাইটে কেউ আপনারা কারও চেয়ে কম যান না, দ্বিতীয় রাউন্ড খুব ভালভাবেই জমাতে পারবেন। এবার বলুন, আপনি রাজি?'

বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকালেন বেলফোর্স। 'অগত্যা।'

'রিমরিগো?'

'আমি আপনার যে-কোন শর্তে রাজি।'

তারপর ওরা দু'জন একযোগে জানতে চাইলেন, 'ট্রে-টা কোথায়?'

চার

মেক্সিকো সিটিতে 'ল্যাটিন আমেরিকান স্পোর্টস'-এর জমজমাট আসর বসেছে, একটা হোটেলেও তিল ধারণের জায়গা নেই। তবে শহরের ঠিক বাইরে প্রফেসরের একটা বাড়ি থাকায় ওদের কোন অসুবিধে হলো না। শহরের ভেতর রিমরিগোরও একটা বাড়ি আছে, তবে প্রফেসরের বাড়িটাকেই নিজেদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে পছন্দ করল রানা। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ বললেই হয়। কথায় কথায় বেলফোর্স জানালেন, শুধু সুইমিং পুলটা তৈরি করতেই তাঁর এক মিলিয়ন ডলার বেরিয়ে গেছে। রানা লক্ষ করল, চাকরবাকররা মনিব আর তাঁর মেহমানদের আরাম-আয়েশের দিকে কড়া নজর রাখছে। আদব-কায়দা ভালই শেখানো হয়েছে তাদের, প্রয়োজনের সময় ঠিকই আশপাশে দেখা যায়, শুনতে পাবার নাগালের মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে; আর যখন অবাঞ্ছিত মনে করা হয়, কিভাবে যেন বুঝতে পেরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছেই নিজের ব্যক্তিগত বাহিনীকে ডেকে কার কি কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর, যারা দূরে আছে তাদেরকে টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযানে বেরুতে হলে নানা রকম প্রস্তুতি দরকার। সে-সব তো চলছেই, তারই মধ্যে রয় হেনেস আর মিক নোয়ামি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন বেলফোর্স। এ-ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সিকিউরিটি অফিসারদের।

বেলফোর্সের ট্রে-টা এখনও নিউ ইয়র্ক থেকে এসে পৌঁছায়নি, সেজন্যে খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছেন ভদ্রলোক। তবে আর্কিওলজিকাল নানান বিষয়ে রিমরিগোর সঙ্গে তর্ক করে সময়টা তিনি ভালই কাটাচ্ছেন। নিজের বাড়ি ছেড়ে বেশিরভাগ সময় সস্ত্রীক হেডকোয়ার্টারেই কাটাচ্ছে রিমরিগো। তবে স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, ওদের তর্কটা পেশাগত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে, ব্যক্তিগত সংঘর্ষের দিকে যাচ্ছে না। রিমরিগো এখন অনেকটাই শান্ত। কৃতিত্বটা রানা মারিয়াকে দিল, সে-ই স্বামীর লাগাম টেনে রেখেছে।

ওরা মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছুবার পরদিন বেলফোর্সের সঙ্গে আলোচনায় বসে রিমরিগো হঠাৎ বলে বসল, 'উলমা দে পেলায়েজ আমার আত্মীয় ও পূর্বপুরুষ হলেও, বুড়ো এক নম্বর মিথ্যুক ছিলেন।'

'তা ছিলেন,' রেগে গিয়ে বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু এখানে সেটা কোন পয়েন্ট নয়। তিনি বলেছেন, তাঁকে চিচেন ইটজায় নিয়ে যাওয়া হয়...'

'আর আমি বলছি, কথাটা সত্যি নয়—এ স্রেফ হতে পারে না। উনি যে সময়ের কথা বলছেন তার অনেক আগেই নতুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেছে—হুনাক সীল ইটজাবাসীদের তাড়িয়ে দেন, চিচেন ইটজা খালি হয়ে যায়। ওটা একটা ভূতুড়ে শহর ছিল।'

'আহ্,' বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলেন প্রফেসর। 'তুমি নিজের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখো না। উলমা দে পেলায়েজের দৃষ্টিতে দেখো। পাণ্ডুলিপিতে যা-ই লিখুন, তিনি ছিলেন সাধারণ একজন সৈনিক, অশিক্ষিত একজন স্প্যানিশ সৈনিক। আমাদের মত দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। চিচেন ইটজা খালি ছিল কিনা সেটা তিনি উল্লেখ করার মত গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবেননি। ওখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়, এটাই শুধু উল্লেখ করেছেন। তবে তোমার ধারণা সত্যি হলে আরও একটা সন্দেহ দেখা দেয় এখানে। তা হলো, পাণ্ডুলিপিটা নকল কিনা। সেক্ষেত্রে, শুরুতেই অভিযানটা বাতিল করে দিতে হয়।'

'পাণ্ডুলিপি নকল, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল রিমরিগো। 'তবে আবার বলছি, উলমা দে পেলায়েজ মিথ্যেবাদী ছিলেন।'

'আমিও জানি পাণ্ডুলিপিটা নকল নয়,' বললেন প্রফেসর। 'আমি ওটা পরীক্ষা করিয়েছি।' কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে একটা ডেস্কের দেরাজ খুললেন তিনি, ভেতর থেকে কয়েক শীট কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'এটা দেখুন। রেডিও-কার্বন ডেটিং টেস্ট-এর রিপোর্ট।'

প্রথম কয়েকটা কাগজে টেবিল ও গ্রাফ। শেষ কাগজটায় উপসংহার শিরোনামে সারমর্ম। তাতে বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা অবশ্যই পনেরোশো

চৌত্রিশ সালে লেখা হয়েছে—ভুলের মার্জিন হিসেবে পনেরো বছর বেশি বা কম ধরতে হবে। পার্চমেন্ট ও কালি, দুটোই ওই একই সময়ের। ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পাণ্ডুলিপিতে যে স্প্যানিশ ভাষা পাওয়া যাচ্ছে, ষোলোশো শতাব্দীতে এই ধাঁচেই স্প্যানিশ ভাষা লেখা হত। সবশেষে রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপিটায় পরে কিছু যোগ বা বিয়োগ করা হয়নি।

'মরীচিকার পিছনে ছুটছি না, আমি এটুকু জেনেই খুশি,' বলে রিপোর্টটা প্রফেসরকে ফিরিয়ে দিল রানা।

রিমরিগো আর বেলফোর্স আবার নতুন করে তর্ক শুরু করলেন। হাসি চেপে খোলা একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। খানিকটা দূরে সুইমিং পুল, তা থেকে প্রতিফলিত আলোয় ওর চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল। মাথা ঘুরিয়ে মারিয়া রিমরিগোর দিকে তাকাল ও। 'তত্ত্ব আর তথ্যের এই কচকচানি কাঁহাতক আর সহ্য হয়! আমার মাথা ধরে গেছে।'

'সে তো আমারও,' বলল মারিয়া। 'আমিও তো আর্কিওলজিস্ট নই, রিমরিগোর পাল্লায় পড়ে খানিকটা অবশ্য শিখতে হয়েছে।'

সুইমিং পুলটার দিকে আবার তাকাল রানা। ওটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 'সঙ্গে কিছু সরঞ্জাম এনেছি, টেস্ট করতে চাই, আপনি কি আমাকে সঙ্গ দেবেন?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারিয়ার। 'সরঞ্জাম মানে? স্কুবা গিয়ার?' রানা মাথা ঝাঁকাতে আনন্দে কচি খুকীর মত নেচে উঠল সে। 'দারুণ! দশ মিনিট সময় দিন, পুলে আসছি আমি।'

নিজের কামরায় এসে কাপড় ছেড়ে ট্রাঙ্কস পরল রানা, তারপর প্যাকেট খুলে স্কুবা গিয়ার বের করে বয়ে নিয়ে এল পুলের ধারে। ছুটিতে রয়েছে ও, মায়াদের হারানো শহর ওয়াশওয়ানোক খুঁজে বের করতে পারুক বা না পারুক, সময়টা নিরানন্দ কাটাতে রাজি নয়। অভিযানটা যতই বিপজ্জনক হোক, পথে কোথাও সাঁতার কাটার সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। অন্তত সে-কথা ভেবেই এ-সব আনা।

ওর আগেই পুলের ধারে পৌঁছে গেছে মারিয়া, এক প্রস্থ স্যুটে এত লোভনীয় লাগছে তাকে যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে সঙ্কোচ বোধ করল রানা। পুলের ধারে স্টীল বটল আর হারনেস নামিয়ে রেখে হেঁটে এল মারিয়া যেখানে বসে আছে। কোত্থেকে কে জানে, অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হলো একজন চাকর, আঞ্চলিক স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বলল রানাকে।

'কি বলছে ও?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মারিয়ার দিকে তাকাল রানা।

খিলখিল করে হেসে উঠল মারিয়া। 'জানতে চাইছে বিয়ার দরকার, নাকি হুইস্কি।'

'ও-সব এই দুপুরে চলে না,' বলল রানা। 'ঠাণ্ডা কিছু হলে আপত্তি নেই।'

'আমিও পছন্দ করি না, শুধু রিমরিগো জেদ ধরলে এক-আধটু খাই,' বলল মারিয়া। চাকরটার দিকে তাকাল সে। 'দুটো কোক দাও, ঠাণ্ডা।' ছেলেটা চলে যেতে রানার দিকে ফিরল আবার। 'মি. রানা, আপনাকে ধন্যবাদ

জানানো হয়নি। এত দ্রুত সব ঘটে গেল, ধন্যবাদ জানাবার সময়ই পাইনি। রিমরিগোর জন্যে আপনি যা করলেন, সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।'

'আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করার কোন কারণ নেই,' বলল রানা। 'মি. রিমরিগো তাঁর প্রাপ্যটুকুই পেয়েছেন।' রিমরিগোকে সঙ্গে রেখেছে ও, কাছ থেকে তার ওপর নজর রাখা সহজ হবে ভেবে, তবে কথাটা মারিয়াকে বলা যায় না। রিমরিগোর মেজাজ আর অভিযোগ-প্রবণতা ওর একদমই পছন্দ হয়নি। বয়কট যখন খুন হলো, কালো মার্সিডিজে মিক নোয়ামির সঙ্গে আরও লোকজন ছিল; তাদের মধ্যে রিমরিগো ছিল না বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঘটনাটার সঙ্গে সে জড়িত ছিল না। তার স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে হাসল ও। 'আমাকে ধন্যবাদ জানানোরও কোন প্রয়োজন দেখি না।'

'ওর যে আচরণ, সে-কথা মনে রেখে বলতে হবে, আপনি খুবই উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।' রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মারিয়া। 'ওকে মেজাজ গরম করতে দেখলে আপনি স্রেফ পাত্তা দেবেন না। আসলে কি জানেন···খুবই হতাশ ও। সোনা পাবে মনে করে যেখানেই হাত দেয়, সেখান থেকেই শুধু মুঠো মুঠো ছাই উঠে আসে। এটাই ওর জীবনের ট্র্যাজেডি। এবারই ওর জীবনে সত্যিকার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কাজেই খুব নার্ভাস।'

কোক এল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে মারিয়া জানতে চাইল, 'ইউকাটানে আমরা কবে পৌঁছুব?'

'বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন,' বলে ইঙ্গিতে বাড়িটা দেখাল রানা।

'ট্রেগুলোয় সত্যি কি কোন রহস্য আছে? আপনার ধারণা সে রহস্য আমরা ভেদ করতে পারব?'

'আছে। পারব।' রহস্য যে এরইমধ্যে ভেদ করা হয়ে গেছে, কথাটা চেপে গেল রানা। শুধু মারিয়াকেই নয়, বাকি দু'জনকেও অনেক কথা বলছে না ও।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'আমি যদি আপনাদের সঙ্গে ইউকাটানে যেতে চাই, প্রফেসর বেলফোর্সের প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে আপনার ধারণা?'

হেসে উঠল রানা। 'খেপে যাবেন। নাহ্, আপনার কোন আশাই নেই।'

সামনের দিকে ঝুঁকে মারিয়া বলল, 'আমি গেলে ভাল হয়। রিমরিগোকে নিয়ে আমি খুব ভয় পাচ্ছি।'

'মানে?'

'মি. রানা, আমার স্বামীকে আমি চিনি। সে সাধারণ কোন মানুষ নয়। বলা উচিত স্বাভাবিক মানুষ নয়। তার মেজাজ এমনই যে একা নিজেকে সামলাতে পারে না। সঙ্গে আমি থাকলে বোঝাতে পারব, শান্ত করতে পারব—একমাত্র আমার কথাই যা একটু শোনে। কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের বোঝা হব না। তাছাড়া এ-ধরনের ফিল্ড ট্রিপসে আগেও আমি গেছি।'

মারিয়ার কথা শুনে রানার মনে হলো, স্বামীকে মেয়েটা উন্মাদ বলে মনে করে, যেন দেখেশুনে রাখার জন্যে সার্বক্ষণিক একজন নার্স দরকার। ভাবল,

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি রকম কে জানে—কোন কোন দাম্পত্যজীবন করুণ ও উদ্ভট আয়োজনের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। 'ঠিক আছে, ভেবে দেখি। তবে প্রফেসরকে রাজি করানো সহজ কাজ হবে না।'

তবে রানা জানে, প্রস্তাবটা প্রফেসরকে দেবে ও, মেনে নিতেও বাধ্য করবে। মারিয়া-মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা অন্য কোন মেয়ের মধ্যে দেখেনি ও। সেটা নিষ্ঠাও হতে পারে, বৈরী পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা; কিংবা হয়তো ভালবাসা, অপাত্রে দান করে এখন পস্তাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আলফাঁসো রিমরিগোর সঙ্গে তাকে একেবারেই মানায়নি। রানার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কারণ যা-ই হোক, তার সঙ্গে মারিয়ার দেহ-সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্যের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া, বিবাহিতা কোন মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াবার কথা রানা ভাবতেও পারে না। মেয়েটিকে ভাল লেগেছে ওর, তবে তার মধ্যে কোন স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

'আসুন দেখি, পানিটা কেমন,' বলে পুলের কিনারায় ফিরে এল রানা।

রানার পিছু নিল মারিয়া। 'আপনি স্কুবা গিয়ার এনেছেন কি মনে করে?'

কারণটা ব্যাখ্যা করল রানা। তারপর বলল, 'আপনার চোখে ওটা কিসের ঝিলিক? মনে হচ্ছে কি যেন বলতে চান।'

'বাহামায় পুরো একটা গ্রীষ্ম কাটিয়েছি আমি,' বলল মারিয়া। 'তখনই স্কুবা ডাইভিং শিখি। এমন নেশা চেপে গিয়েছিল, পানি থেকে আমাকে তোলাই যেত না।'

ভালব চেক করে হারনেস পরল রানা। মাস্কটা পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছে, নিখুঁত একটা ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল মারিয়া, সারফেসে মাথা তুলে রানার দিকে পানি ছুঁড়ল। 'নেমে পড়ুন।' হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

পুলের কিনারা থেকে পিছলে পানিতে নামল রানা। সরাসরি তলায় নেমে এল ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল বেল্ট ওয়েট বদলাতে হবে। ওপর দিকে তাকিয়ে মারিয়ার রোদে পোড়া হাত-পা দেখতে পেল। ফ্লিপারস ছুঁড়ে উঠে এল, খপ করে ধরে ফেলল মারিয়ার গোড়ালি। টেনে নিচে নামাচ্ছে, মারিয়ার মুখ থেকে বুদ্বুদ বেরুতে দেখল—নিখুঁত একটা রেখার মত সারফেসে উঠে যাচ্ছে, প্রতিটি বুদ্বুদ পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে। এভাবে টান দেয়ায় মারিয়া যদি বিস্মিত হয়ে থাকে, আচরণে তার কোন ছাপ নেই—অন্তত এই বোধ তার যথেষ্টই আছে যে ফুসফুস খালি করা চলবে না। হঠাৎ ডিগবাজি খেলো সে, এক হাতে চেপে ধরল রানার এয়ার পাইপ, জোরাল একটা মোচড় দিয়ে রানার মুখ থেকে খুলে নিল মাউথপীসটা। পানি গিলল রানা, মারিয়ার গোড়ালি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। সারফেসে মাথা তুলে হাঁপাতে শুরু করল, দেখল ওর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে মেয়েটা।

'আমাকে আপনি অবাক করে দিয়েছেন।'

'বাহামার সৈকতে গুপ্তাপাগুাদের অভাব নেই,' বলল মারিয়া। 'বাধ্য হয়েই শিখে নিতে হয়েছে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।'

আবার ডুব দিয়ে মিনিট পনেরো পর সারফেসে মাথা তুলল রানা, দেখল প্রফেসর বেলফোর্স হন হন করে এগিয়ে আসছেন পুলের দিকে। কাছাকাছি এসে বললেন, 'আমার ট্রে এইমাত্র পৌঁছুল। এখুনি আমরা ওগুলো মিলিয়ে দেখতে পারি।'

হারনেস আর ওয়েট বেল্ট খুলে রানা বলল, 'কাপড় পাল্টে এখুনি আসছি, আমি।'

স্কুবা গিয়ারের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর। 'এগুলো আপনি গভীর পানিতে ব্যবহার করতে পারবেন?'

'কত গভীরে? আমি সাধারণত একশো বিশ ফুটের নিচে নামি না।'

'বোধহয় তাতেই চলবে,' প্রফেসর বললেন। 'আমাদেরকে হয়তো দু'একটা সিনোটে ডুব দিতে হতে পারে। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি আসুন।' চলে গেলেন তিনি।

পুলের কাছাকাছি লম্বা এক কেবিনে ঢুকে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাল রানা, ট্রাঙ্কস খুলে টেরি-টাউলিং গাউন পরল। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় শুনতে পেল প্রফেসর বেলফোর্স বলছেন, '··· ভাবলাম সূত্রগুলো লতাগুলোর পাতায় পাওয়া যাবে, তাই একজন ক্রিপটোগ্রাফারকে দেখাই। পাতার শিরার সংখ্যা অথবা পাতার গোড়ায় বাঁকা হয়ে থাকা বোঁটাগুলোর মধ্যে কোন রহস্য থাকতে পারে। যাই হোক, লোকটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর সমস্ত তথ্য কমপিউটরে ঢোকায়, কিন্তু কমপিউটর কোন ফলাফল দিতে পারেনি।'

আপনমনে হাসল রানা—আইডিয়াটার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে, কিন্তু সমস্যাটাকে চিনতে ভুল করা হচ্ছে বলে কোন কাজে আসবে না। টেবিলে বসা বাকি সবার সঙ্গে এক হলো রানা, চোখ নামিয়ে ট্রে দুটোর দিকে তাকাল। প্রফেসর বললেন, 'দুটো ট্রেই যখন এখানে আছে, আসুন মিলিয়ে দেখি উলমা দে পেলায়েজ এগুলোতে কি মেসেজ দিয়ে গেছেন।'

রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দুটো ট্রে? কোথায়?'

ঝাঁকি খেয়ে রানার দিকে তাকাল রিমরিগো। ঘাড় ফিরিয়ে প্রফেসরও তাকালেন, চেহারায় বিমূঢ় ভাব। 'কেন, এই তো টেবিলে দুটো ট্রে রয়েছে।'

টেবিলের দিকে তাকাল রানা। 'কই, আমি তো কোন ট্রে দেখছি না।'

প্রফেসরকে হতভম্ব দেখাল, তোতলাতে শুরু করলেন তিনি, 'মি. রা···আ-আপনি কি পাগল হলেন? এগুলো ট্রে নয়তো কি? উড়ন্ত সসার?'

রিমরিগোকে এবার চরম বিরক্ত দেখাল। 'এটা কি কৌতুক করার কোন বিষয় হলো? একটাকে দিদিয়া ট্রে বলেছেন, আরেকটাকে সারমাক দে পেলায়েজ ট্রে বলেছেন। ল্যাম্পনির কাছে লেখা চিঠিতে ক্যাসনও তাই বলেছে···'

'বলুক, আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'সবাই একটা সাবমেরিনকে প্লেন বলুক, তারপরও সেটা উড়বে না। উলমা দে পেলায়েজ, যিনি এগুলো তৈরি করেছেন, চিঠিতে তিনি ট্রের কথা বলেননি। আসুন দেখা যাক আসলে

কি বলেছেন তিনি। চিঠির অনুবাদটা কোথায়?'

কাগজগুলো নিয়ে শেষ পাতায় চোখ বুলাল রানা। 'উলমা দে পেলায়েজ লিখেছেন, "এই উপহার দুটো এমন এক চমৎকার কৌশলে বানানো হয়েছে, যে কৌশলটা আমার বাবা মুরদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। কৌশলটা কি তা তোমরা আমার কাছ থেকে জেনেছ···স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাতে হবে, তা না হলে উপহার দুটোয় কি আছে দেখতে পাবে না"। এ-সব কথার তাৎপর্য আপনারা বুঝতে পারছেন না?'

'খুব একটা না,' বলল রিমরিগো।

'এগুলো আয়না,' বলল রানা।

রিমরিগো বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ করল। তবে প্রফেসর বেলফোর্স টেবিলের ওপর ঝুঁকে ওগুলো আবার পরীক্ষা শুরু করলেন।

রানা বলল, 'আমার "ট্রে"-র সারফেস তামা নয়—স্পেকুলাম মেটাল—আ রিফ্লেকটিভ সারফেস। আমি মেপে দেখেছি, সারফেসটা সামান্য কনভেক্স—উত্তল—কিনারা থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে,' বললেন বেলফোর্স। 'এগুলো সত্যি আয়না! আমরা তাহলে কোথায় পৌঁছুলাম?'

'আরও ভাল করে দেখুন,' পরামর্শ দিল রানা।

রিমরিগো আর বেলফোর্স একটা করে আয়না তুলে নিলেন। খানিক পর রিমরিগো বলল, 'নিজের চেহারার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও তাই,' বললেন প্রফেসর। 'রিফ্লেকটিভ সারফেস হিসেবে খুব একটা নিখুঁত নয় এটা।'

'ওগুলো চারশো বছরের পুরানো মেটাল মিরর, ভুলে যাবেন না। তবে ওগুলোর মধ্যে যে ট্রিকটা আছে, সেটায় কোন খুঁত নেই। আমি ওটা অ্যাক্সিডেন্টালি পেয়ে গেছি। প্রফেসর, আপনার কাছে প্রোজেকশন স্ক্রীন আছে?'

হাসলেন প্রফেসর। 'তার চেয়ে ভাল—প্রোজেকশন থিয়েটার আছে।' পথ দেখিয়ে বাড়ির ওপরতলায় নিয়ে এলেন ওদেরকে, সবাইকে নিয়ে ঢুকলেন খুদে একটা সিনেমা হলে। বিশটার মত চেয়ার রয়েছে।

চারদিকে তাকাল রানা। 'স্লাইড প্রজেক্টর কোথায়?'

'প্রজেকশন রুমে, পিছন দিকটায়।'

'আমি ওটা এখানে চাই,' বলল রানা।

দশ মিনিটের মধ্যে দু'জন চাকর বয়ে নিয়ে এল প্রজেক্টর মেশিনটা, রানার নির্দেশে কামরার মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর বসানো হলো সেটা। প্রফেসরকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। রিমরিগো যেন একঘেয়েমির শিকার। রূপ-লাবণ্যে উদ্ভাসিত মারিয়া শান্ত ও কৌতূহলী। তার দিকে ফিরে চোখ মটকাল রানা, বলল, 'মিসেস রিমরিগো, এই আয়নাটা আপনি একটু ধরবেন, প্লীজ?'

প্রজেক্টরের পিছনে চলে এল রানা। 'এটাকে আমি খুব শক্তিশালী

স্পটলাইট হিসেবে ব্যবহার করছি। আয়না থেকে প্রতিফলিত আলোটা ওদিকের স্ক্রীনে পড়বে। কি দেখতে পান বলবেন আমাকে।'

প্রজেক্টরের আলো অন করতেই দম আটকানোর শব্দ করলেন প্রফেসর। একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠে শিরদাঁড়া খাড়া করল রিমরিগো। ঘুরে স্ক্রীনে ফুটে ওঠা নকশার দিকে তাকাল রানা। 'কি দেখছেন?' জানতে চাইল ও। 'খানিকটা অস্পষ্ট হলেও, আমার তো মনে হচ্ছে ওটা একটা ম্যাপ।'

প্রফেসর বেলফোর্স হাঁপিয়ে উঠলেন। 'কি সাংঘাতিক! এ কিভাবে···' মাথার চুলে হাত চালালেন। 'মারিয়া, আয়নাটা একটু ঘোরাতে পারো?'

স্ক্রীনের আলোকিত নকশাটা মোচড় খেয়ে বিস্তৃত হলো, তারপর নতুন এক আঙ্গিকে স্থির হলো। ঠোঁট আর টাকরা সহযোগে টট্-টট্ আওয়াজ করলেন প্রফেসর। 'মি. রানা, আপনার ধারণা সত্যি। এটা ম্যাপই। নিচে, ডান দিকে, ডেবে থাকা অংশটা যদি চেটুমাল বে হয়—আকৃতিতে কোন অমিল নেই—তাহলে ওটার ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসপিরিটু সান্টো আর অ্যাসেনশিয়ন বে। তারমানে ইউকাটান পেনিনসূলার পশ্চিম উপকূলে তাকিয়ে আছি আমরা।'

রিমরিগো জানতে চাইল, 'মাঝখানে ওই বৃত্তটা কি?'

'ওটার কথায় পরে আসছি,' বলে আলোটা নিভিয়ে দিল রানা। 'চালাকিটা আমি কপালগুণে ধরতে পারি। আয়না বা ট্রে-টার ছবি তোলার সময় সতর্ক ছিলাম না, শাটার বাটনে আঙুলের চাপ লেগে যায়, ফলে ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠে। ডেভলপ করার পর দেখি ফ্রেমে আটকানো আয়নার সামান্য অংশই ছবিতে আছে, বেশিরভাগটাই দেয়াল। ফ্ল্যাশের আলো আয়নায় লেগে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়, তার আকৃতি একটা নকশার মত দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই।'

স্ত্রীর হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রিমরিগো। 'এ কিভাবে সম্ভব? সারফেসটা তো সমতল, সেটা নাড়াচাড়া করলে বিভিন্ন নকশা ফোটে কিভাবে?' আয়নাটা তুলে চোখের সামনে নাড়াচাড়া করল সে। 'খালি চোখে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'আয়নাটা সমতল নয়, সামান্য কনভেক্স বা উত্তল। এটা আসলে একটা চীনা টুকি।'

'চীনা?' হাঁ হয়ে গেল রিমরিগো।

'উলমা দে পেলায়েজ সেরকমই বলেছেন। "···যে আগন্তুককে মুররা পুবদিক থেকে কর্ডোবায় নিয়ে এসেছিল"। এই আগন্তুক ছিল চীনা। ব্যাপারটা আমাকে হতচকিত করে তোলে—পনেরো শতকের শেষ দিকে একজন চীনা স্পেনে কি করছিল? তবে চিন্তা করতে গিয়ে বুঝলাম, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আরব সাম্রাজ্য স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কাজেই এটা কল্পনা করা কঠিন নয় যে ওই আমলে একজন চীনা মেটাল ওয়ার্কার স্পেনে আসতেই পারে। ওই সময় ইউরোপে তো চীনারা ছিলই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রফেসর বেলফোর্স বললেন, 'আপনার ব্যাখ্যা

গ্রহণযোগ্য।' আয়নায় টোকা দিলেন তিনি। 'কিন্তু ট্রিকটা কি?'

রিমরিগোর হাত থেকে আয়নাটা নিয়ে টেবিলে শোয়াল রানা। 'সোনার কাজ, লতাপাতা, এ-সবের কথা ভুলে যান; মনোযোগ দিন আয়নায়। প্রথম দিকে চীনাদের সব আয়নাই ছিল ধাতব, সাধারণত ব্রোঞ্জের তৈরি। কাস্টমেটাল-এর সারফেস চকচকে হয় না, কাজেই চাঁছা বা ঘষা হত। সাধারণত মাঝখানটা ধরে কিনারার দিকে চাঁছত, ফলে সারফেসের কিনারাগুলো সামান্য নিচু হত, এতই সামান্য যে খালি চোখে ধরা পড়ে না।'

'বলে যান,' তাগাদা দিলেন বেলফোর্স।

কম কথায় সারল রানা। চীনাদের আয়নাগুলো এরপর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ক্রেতারা অনেক দাম দিয়ে কিনত, কাজেই কারিগররা খেয়াল রাখত ওগুলো যাতে সুন্দর হয়। শুরু হলো আয়নার পিছন দিকটা অলঙ্কৃত করা। সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের বাণী ঢালাই করা হরফে বসানো হত ওখানে। এবার বিবেচনা করা যাক এ-ধরনের একটা আয়না যখন চাঁছা হবে তখন কি ঘটতে পারে। আয়নাটাকে নিরেট একটা মেঝেতে উল্টো করে শোয়ানো হবে, কিন্তু শুধু উঁচু হয়ে থাকা হরফগুলো সারফেস ছোঁবে—আয়নার বাকি অংশ কোন অবলম্বন পাবে না। কারিগর যখন চাঁছা বা ঘষার কাজ করছে তখন চাপ পড়ছে আয়নার ওপর, ফলে পিছন দিকে যে অংশে কোন অবলম্বন নেই তা খানিকটা ডেবে যাবে, সেই সঙ্গে মেঝেতে লেগে থাকা হরফগুলোর মেটাল খানিকটা ক্ষয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন বেলফোর্স। 'তো?'

'ফলে আপনি একটা কনভেক্স মিরর পেলেন, যেটার স্বাভাবিক প্রবণতা হলো প্রতিফলিত আলোকে ম্লান করে দেয়া,' বলল রানা। 'কিন্তু সারি সারি হরফগুলো চাপ লেগে ক্ষয়ে গিয়ে সমান বা সমতল হয়ে গেছে, তাই ওগুলোর প্রতিফলিত আলো সমান্তরাল রেখা তৈরি করবে। আগেই বলেছি, কনভেক্সিটি এতই সামান্য যে খালি চোখে ধরা পড়ে না, তবে আলোর শর্ট ওয়েভলেংথ প্রতিফলনে তা ফুটিয়ে তুলবে।'

'এই কৌশল চীনারা শিখল কবে?' প্রশ্ন করলেন বেলফোর্স।

'এগারো শতকের কোন এক সময়। প্রথমে ঘটনাচক্রে জানতে পারে, তারপর ব্যবহার করতে শেখে। এরপর এল বিভিন্ন অংশে বিভক্ত আয়না—পিছন দিকে বৌদ্ধধর্মের বাণী ঠিকই থাকল, কিন্তু আয়না থেকে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস প্রতিফলিত হবে। এ-ধরনের একটা আয়না অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিন-এ আছে, প্রতিফলনে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকে দেখা যায়। ব্যাপারটা কিছুই নয়, আয়নায় শুধু একটা ফলস ব্যাক লাগানো হয়, উলমা দে পেলায়েজ যেমন লাগিয়েছেন।'

হাতের আয়নাটা উল্টো করে সোনালি পিছনটায় টোকা দিল রিমরিগো। 'তারমানে এটার নিচে একটা ম্যাপ আছে, ব্রোঞ্জ ঢালাই করে তৈরি?'

'ঠিক তাই। এ-ধরনের কম্পাজিট আয়না আরও দুটো আছে—একটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, আরেকটা জার্মানীর কোথাও।'

'পিছনটা তাহলে আমরা খুলব কিভাবে?'

'থামুন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আয়নাটা আমি নষ্ট করতে রাজি নই। আয়নার সারফেসে মার্কারি অ্যামালগাম ঘষলে একশো ভাগ উন্নত প্রতিফলন পাওয়া যাবে। তবে সবচেয়ে ভাল ফল আসবে এক্স-রে করা হলে।'

'কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বললেন বেলফোর্স। 'তার আগে প্রজেক্টর অন করুন, আরেকবার দেখি।'

আলো জ্বালল রানা। স্ক্রীনের আলোকিত ও অস্পষ্ট রেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখল ওরা। খানিক পর বেলফোর্স বললেন, 'দেখে তো কুইনটানা রু উপকূল বলেই মনে হচ্ছে। সত্যি মেলে কিনা একটা ম্যাপের সঙ্গে তুলনা করলেই হয়।'

'কিনারায় ওগুলো হরফ না?' মারিয়া জানতে চাইল।

চোখ কুঁচকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল রানা, কিন্তু ঝাপসা ভাবটুকু ভেদ করা গেল না। 'হতে পারে,' বলল ও।

'আর মাঝখানের ওই বৃত্তটা?' জানতে চাইল রিমরিগো। 'কি ওটা?'

'আমার কি ধারণা বলি,' বলল রানা। 'উলমা দে পেলায়েজ ছেলেদের মধ্যে সুসম্পর্ক চেয়েছিলেন, সেজন্যেই দু'জনকে একটা করে আয়না পাঠান। রহস্যের মীমাংসা পাওয়া যাবে শুধু দুটো আয়না এক করলে। একটা আয়নায় গোটা এলাকাটাকে দেখানো হয়েছে— লোকেশন। দ্বিতীয়টায়, আমার ধারণা, ছোট্ট ওই বৃত্তের বিশদ বিবরণ আছে। দুটো আয়নাকে এক করতে হবে, তা না হলে একটার কোন তাৎপর্য নেই।'

'চেক করে দেখা যাক,' বললেন প্রফেসর। 'আমার আয়নাটা কোথায়?'

স্ক্রীনে এবার দ্বিতীয় আয়নার প্রতিফলন ফেলা হলো। নতুন একটা নকশা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার মর্ম উদ্ধার করা গেল না, এতই ঝাপসা। প্রফেসর বললেন, 'এভাবে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমি অন্ধ হয়ে যাব।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। ওগুলো আয়না, প্রতিফলনে ম্যাপ আছে, এ-সব আমরা হয়তো কোনদিনই জানতে পারতাম না। সবাই আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মি. রানা।'

'আরও একটু মনোযোগী হলে ঠিকই ধরতে পারতেন,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গ থাক। আমার যেটা আশ্চর্য লাগছে, এ-ব্যাপারে উলমা দে পেলায়েজের ছেলেরা কিছু করেনি কেন?'

রিমরিগো বলল, 'পরিবারের দুই শাখাই এগুলোকে ট্রে বলে মনে করেছে, আয়না বলে ভাবতেই পারেনি। খুব সম্ভব উলমা যে আভাস দিয়েছেন তা তাদের মাথায় ঢোকেইনি। চীনা আয়নার কথা তাদেরকে বলা হয় ছোটবেলায়, ভুলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।'

'হতে পারে,' সায় দিলেন প্রফেসর। 'কিংবা হয়তো দুই ভাই ঝগড়া মিটিয়ে এক হতে পারেনি। সে যাই হোক, আয়না দুটো এখন আমাদের কাছে। ভাগ্যক্রমে আমরা একজন জিনিয়াসকে পেয়ে গেছি, দেখা যাক তিনি আমাদেরকে সোনার পাহাড় আর ওয়াশওয়ানোক শহরে নিয়ে যেতে পারেন

কিনা।'

'উনি কিন্তু লজ্জা পাচ্ছেন।' রানার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে মারিয়া।

হঠাৎ কি হলো, এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন প্রফেসর বেলফোর্স, যেন এই জগতেই নেই। ধীরে ধীরে চুপ করে গেল সবাই, তাতেও তাঁর সংবিৎ ফিরল না। রানা কিছু বলতে যাবে, মুখ তুলে প্রফেসর বললেন, 'সব কাজই খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের। আমার হাতে সময় কম।'

রানার মনে পড়ল, কথাটা আগেও একবার বলেছেন বেলফোর্স।

পরবর্তী কয়েক দিন ওয়াশওয়ানোক ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে না দেখে একটু অবাকই হলো ও। একজন মিলিওনেয়ার তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করবেন না?

দু'দিন পর তাঁর সিকিউরিটি অফিসারদের প্রধান বব চ্যাপেলের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। রানাকে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকতে দেখে ধাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হলো চ্যাপেলের। 'স্যার! আপনি এখানে!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে।

দাঁড়াল রানা, তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কেমন আছ, বব? আমি জানতাম তুমি আমেরিকায় একটা তেল কোম্পানিতে চাকরি করো।'

'জ্বী, ঠিকই জানেন, স্যার। তেল কোম্পানিটা মি. বেলফোর্সের।'

'কি ঘটছে এখানে?' প্রফেসর হাসি চেপে জানতে চাইলেন। 'আমার বিজনেস সিক্রেট সব না ফাঁস হয়ে যায়।'

ঠোঁট টিপে হাসল চ্যাপেল, তারপর জানাল, বছর তিনেক আগে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা একটা শর্ট কোর্স সিকিউরিটি ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করেছিল, সেটা কমপ্লিট করে মাসুদ রানার প্রশংসা-পত্র সহ সার্টিফিকেট পায় সে।

মাফিয়া ডন রয় হেনেস ওরফে ডায়নামো ডিকানডিয়া আর মিক নোয়ামি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল চ্যাপেলকে, সেই রিপোর্ট দিতেই এসেছে সে। ফাইল খুলে রিপোর্টটা পড়ল, তবে রানার জন্যে নতুন কিছু নেই তাতে। সবশেষে চ্যাপেল জানাল, ল্যাটিন আমেরিকান স্পোর্টস দে ার নাম করে রয় হেনেসও মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছেছে। এখানকার আন্ডারগ্রাউন্ডে তার লোকজন আছে, তাদের সঙ্গে তার একাধিক গোপন বৈঠকের খবরও পাওয়া গেছে। চ্যাপেল আরও জানাল, এখানে প্রফেসর বেলফোর্সের বাড়ি আর শহরে আলফাঁসো রিমরিগোর বাড়ির ওপর কিছু লোক নজর রাখছে। ধরে নেয়া চলে যে তারা রয় হেনেসেরই লোক। কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল চ্যাপেল, যেন কিছু আশা করছে।

রানা চিন্তিত। 'বাড়িটা একবার সার্চ করতে হয়,' ফিসফিস করল ও।

এক গাল হেসে মাথা ঝাঁকাল চ্যাপেল। 'স্যার, আমার সঙ্গে বাগ ফাইন্ডার আছে।' ব্রীফকেস থেকে কালো একটা বাক্স আর স্টেথোস্কোপ বের করল সে। 'আপনি বললেই সার্চ করে দেখতে পারি এ বাড়ির কোথাও

মাইক্রোফোন বা রেডিও ট্র্যান্সমিটার আছে কিনা।'

সার্চ করে শুধু সিটিংরুমে, ভারী একটা ওক কাঠের টেবিলের তলায়, রেডিও ট্র্যান্সমিটার পাওয়া গেল। আবার বারান্দায় ফিরে এল ওরা। রানা বলল, 'ওই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করেছি, বলেছি ট্রেগুলো আসলে আয়না।'

'দুঃসংবাদই বলতে হবে,' বলল চ্যাপেল। 'তবে প্রজেকশন রুমে কোন ছারপোকা নেই, অর্থাৎ আয়নাগুলোয় যে ম্যাপ আছে তা হেনেস জানে না।'

প্রফেসর বললেন, 'সিটিংরুমের ওটা তাহলে নষ্ট করে দাও।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আরে না। ওই ট্র্যান্সমিটার এখন আমাদের কাজে লাগবে। হেনেসকে আমরা ভুল তথ্য পাঠাব। তবে সবাইকে মনে রাখতে হবে যে টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে গোপন কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না।'

প্রফেসর জানতে চাইলেন, 'ট্র্যান্সমিটারটা আমাদের কথাবার্তা কোথায় পাঠাচ্ছে?'

চ্যাপেল বলল, 'সেটা বলা মুশকিল।'

'আপনার বাড়ি থেকে দেড়শো গজ দূরে, রাস্তার বাঁকে, গত দু'দিন ধরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে,' বলল রানা। 'দু'জন লোককে দেখেছি আমি। টেপ-রেকর্ডার সহ ওদের কাছে একটা রিসিভার থাকতে পারে।'

'এ-সব ব্যাপারে আপনি এক্সপার্ট, যা ভাল বোঝেন করেন,' বললেন প্রফেসর। 'আসুন, আমরা আমার স্টাডিরুমে বসি। ওখানে আলফাঁসো আর মারিয়া অপেক্ষা করছে।'

স্টাডিরুমে ঢুকে দেরাজ থেকে বড় একটা এনভেলাপ বের করলেন বেলফোর্স। 'আসুন, কাজ শুরু করি,' বলে এনভেলাপটা ছিঁড়লেন। 'এগুলো এক্স-রে প্রিন্ট—লাইফ সাইজ।' সবাইকে দুটো করে প্রিন্ট দিলেন, প্রতিটি আয়নার একটা করে।

একবার চোখ বুলিয়েই সন্তুষ্টবোধ করল রানা। স্ক্রীনের প্রতিফলনে শুধু অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়েছিল, এক্স-রে প্রিন্টে প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে ধরা পড়েছে। 'মারিয়া ঠিক বলেছেন, কিনারায় এগুলো বাক্যই বটে,' বলল ও

'পড়ুন তাহলে,' তাগাদা দিলেন প্রফেসর।

'আমার স্প্যানিশ তেমন ভাল নয়, তবু চেষ্টা করছি,' বলল রানা। 'আপনার আয়নায় লেখা রয়েছে— "বিজয় অভিযানের পথ মরণফাঁদের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে"। আর আমার আয়নায়—"কবর থেকেই শুরু পরমায়ু"।'

'সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নয়,' মন্তব্য করল রিমরিগো।

'তবে এটা যে কুইনটানা রু উপকূল, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলে প্রিন্টের ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরলেন প্রফেসর। 'ওহ্ গড! আমি তো শহরের চিহ্নও দেখছি। চৌকো, দুর্গের মত এগুলো দেখছেন?'

কামরার ভেতর টান টান উত্তেজনা। 'ওপরের দুটো নিশ্চয়ই কোবা আর টুলাম,' চাপা গলায় বলল রিমরিগো। 'ওগুলোর পশ্চিমে চিচেন ইটজা।'

'চেটুমাল বে-তে আরও রয়েছে ইচপাতুন। কিন্তু টুলাম-এর দক্ষিণে এটা

কি? চুনাইআশচি নয়তো?' চোখ তুলে দেয়ালের দিকে তাকালেন বেলফোর্স। 'খুব বেশি দিন হয়নি, ওখানে একটা শহর পাওয়া গেছে।'

'টুলামের দক্ষিণে ওটাই একমাত্র নয়, আরও বেশ কয়েকটা শহর দেখা যাচ্ছে,' ফিসফিস করছে রিমরিগো। 'এই ম্যাপ যদি নিখুঁত হয়, এ-সব হারানো শহর আবার খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'শান্ত হও,' বলে প্রিন্টটা রেখে দিলেন বেলফোর্স। 'এসো, ওয়াশওয়ানোকে নজর দিই।' দ্বিতীয় প্রিন্টটা হাতে নিলেন। 'লার্জস্কেল ম্যাপের ছোট্ট বৃত্তটার সঙ্গে এটার যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে আমরা পজিশনটা ঠিকই পিনপয়েন্ট করতে পারব।'

নিজের কপিটার দিকে তাকাল রানা। বেশ কয়েকটা পাহাড়ই আছে, কিন্তু উচ্চতার কোন আভাস বা মাপ দেয়া হয়নি। পাহাড়গুলোর ওপর কিছু চিহ্ন সম্ভবত বাড়ি বা বিল্ডিঙের প্রতিনিধিত্ব করছে। ওর মনে পড়ল, চিঠিতে উলমা দে পেলায়েজ লিখেছেন ওয়াশওয়ানোক শহরটা একটা রিজের ওপর, পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

'এখানে একটা সিনোট আছে,' বললেন বেলফোর্স। 'তারমানে এই জায়গায় ইয়াম চ্যাচ মন্দির ছিল—উলমার কথা যদি বিশ্বাস করি। ভাবছি, রাজপ্রাসাদটা তাহলে কোথায়?' ঘুরে বড় একটা কার্ডবোর্ড টিউব টেনে নিলেন, ভেতর থেকে বের করলেন একটা ম্যাপ। 'এই ম্যাপ নিয়ে সারাজীবন কাজ করছি আমি।' গুটানো ম্যাপ খুলে ডেস্কে মেলা হলো, চারকোণে রাখা হলো চারটে ভারী বই। 'মায়ারা যখনই যা তৈরি করে থাকুক, সব আপনি এখানে দেখতে পাবেন। আপনার চোখে অদ্ভুত কিছু ধরা পড়ছে, মি. রানা?'

ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে রানা বলল, 'দক্ষিণ দিকটায় ভিড় একটু বেশি লাগছে।'

'ওটা পেটেন—ওল্ড এমপায়ার, এগারো শতকে পতন ঘটে। ইটজারা পরে আসে, নতুন রক্তের মত। চিচেন ইটজা আর কোবা'র মত প্রাচীন কিছু শহর দখল করে তারা, মায়াপান সহ নতুন কয়েকটা শহর তৈরিও করে। দক্ষিণ দিক বাদ দিন, ইউকাটান পেনিনসূলার দিকে তাকান। ওদিকে অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন?'

'পশ্চিমে ফাঁকা একটা জায়গা। ওখানে ওরা কিছু বানায়নি কেন?'

'কে বলল বানায়নি? ওটাই তো কুইনটানা রু। স্থানীয় লোকজন আর্কিওলজিস্টদের পরম শত্রু মনে করে।' ম্যাপের ওপর টোকা দিলেন বেলফোর্স। 'এখানে একজন আর্কিওলজিস্টকে খুন করেছে ওরা, জ্যান্ত পুড়িয়ে। অসমর্থিত খবর হলো, ভদ্রলোককে হজম করে ফেলে তারা, অর্থাৎ খেয়ে ফেলে। তবে খুলিটা ডেকোরেশনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। সাগরের দিকে মুখ করা একটা পাঁচিলে আটকে রেখেছে। বাকি আর্কিওলজিস্টরা যাতে সাবধান হয়। তবে ঘটনাটা বেশ কয়েক বছর আগের।'

'স্থানীয় লোকজন কি আদিবাসী ইন্ডিয়ান?'

'চিকেলেরো ইন্ডিয়ান নয়, তবে চান সান্টা রোজারা ইন্ডিয়ান। এলাকাটা

বর্ণনার অতীত দুর্গম, সেজন্যেই ফাঁকা। মাঝখানে ওয়াশওয়ানোক।' ম্যাপের সঙ্গে হাতের প্রিন্টটা মেলালেন বেলফোর্স। 'আমার ধারণা, এখানে—বিশ মাইল কমবেশি হতে পারে।'

রিমরিগো বলল, 'বিশ মাইলের একটা বৃত্ত মানে তিনশো বর্গমাইল সার্চ করতে হবে। মায়াদের যে কোন একটা কাঠামোর দশ ফুট পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাবেন, অথচ কিছুই দেখতে পাবেন না। এমন কি ওটার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও টের পাবেন না। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠেকে শিখবেন।'

'ওয়াশওয়ানোকে এত সোনা এল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'উলমা তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, সোনার উৎস সম্পর্কে তিনি কিছু জানতে পারেননি।'

'স্প্যানিয়ার্ডদের ধারণা ছিল, মায়াদের রাজ্যে বিশাল কোন খনি আছে। সেই খনির একটা নামও দেয় তারা—এলডোরাডো। কিন্তু এলডোরাডোর অস্তিত্ব সত্যি ছিল বা আছে কিনা তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। এমন হতে পারে, মায়ারা অন্য কোথাও থেকে সোনা আমদানি করত। অন্তত ইউকাটান পেনিনসূলায় বড় কোন সোনার খনি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।'

'কিন্তু উলমা সোনার পাহাড়ের কথা বলছেন,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'মায়াদের রাজ্যে খনি না থাকলে সোনার পাহাড় আসে কোত্থেকে?'

'আগেই আমরা একমত হয়েছি, উলমা দে পেলায়েজ তাঁর চিঠিতে প্রচুর মিথ্যেকথা বলেছেন। সোনার পাহাড়টাও হয়তো তাঁর বানানো গল্প।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রিমরিগো। 'আমদানি করা সোনা দিয়ে কেউ একটা পাহাড় মুড়ে ফেলবে, এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

প্রফেসর বেলফোর্সের আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশন-এর প্রস্তুতি দেখে মনে হলো সামরিক অভিযানের আয়োজন চলছে। আর টাকা খরচের বহর দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, বড় বড় ব্যাংকে ঢোকার ব্যক্তিগত ও গোপন টানেল আছে তাঁর। এই টাকায় ওয়াশওয়ানোকের মত আরেকটা শহর বানিয়ে ফেলা যায়।

প্রথমে তিনি ঠিক করলেন সাগরপথে যাবেন। কিন্তু আলোচনায় বসে জানা গেল, কুইনটানা উপকূল অসংখ্য দ্বীপ আর ডুবো পাহাড়ে ভর্তি। কাজেই সাগরপথে যাবার চিন্তা বাদ দিতে হলো। বেলফোর্স ঘাবড়ালেন না। সাপ্লাই পাঠাবার জন্যে এয়ার ফ্রেইটার-এর একটা বহর চার্টার করলেন তিনি। বহরটাকে ল্যান্ড করাতে হবে, কাজেই নির্মাণ শ্রমিকদের একটা বিশাল বাহিনীকে পাঠালেন অ্যাসেনশিয়ন বে-তে এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করার জন্যে।

এয়ারস্ট্রিপ কাজের উপযোগী হতে রানার পরামর্শে একটা ফটোগ্রাফিক রিকনিসন্স প্লেন পাঠানো হলো, বেস থেকে অপারেট করা হবে ওটা। রানা বলে দিল, শুধু ওয়াশওয়ানোকের খোঁজ করলে চলবে না, গোটা কুইনটানা প্রদেশ আর ইউকাটান-এর এরিয়াল সার্ভে রিপোর্ট চাই ওর। ভুরু কুঁচকে কারণটা জানতে চাইলেন বেলফোর্স। রানা জবাব দিল, মেক্সিকান সরকারের

সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযানের অনুমতি চেয়ে নিয়েছে ও, বিনিময়ে তারা কিছু উপকার পাবার আশা করে। ফান্ডের অভাবে বিশাল একটা এলাকার এরিয়াল সার্ভে করা সম্ভব হয়নি, রানা তাদেরকে ওই এলাকার একটা ফটো-মোজাইক সাপ্লাই দেবে বলে কথা দিয়েছে।

অ্যাসেনশিয়ন বে থেকে ভেতর দিকে দু'নম্বর ক্যাম্প তৈরি হবে, এক ঝাঁক হেলিকপ্টারের সাহায্যে। দু'নম্বর ক্যাম্পটা কোথায় তৈরি করা যায় তা নিয়ে বেলফোর্স আর রিমরিগো প্রচুর তর্ক করল। প্রিন্ট আর ম্যাপ মিলিয়ে অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল তারা। আনুমানিক হিসেবে দেখা গেল দু'নম্বর ক্যাম্পের জায়গা বাছাই করা হয়েছে ওয়াশওয়ানোক শহরের মাঝখানে, ইয়াম চ্যাচ মন্দিরের মাথায়। আসলে তা হয়নি, বলাই বাহুল্য; তবে তাতে কেউ বিস্মিত হলো না।

প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে, তবে এখনও ওরা প্রফেসরের বাড়ি ছাড়েনি। রিমরিগো আর মারিয়াও প্রায় সারাদিনই এখানে থাকে। শুধু বব চ্যাপেল হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়, তারপর একদিন হঠাৎ করেই ফিরে আসে। ফিরে এসে প্রফেসরকেই রিপোর্ট করে সে।

প্রফেসর একদিন রানাকে বললেন, 'ওয়াশওয়ানোক খুঁজে পেলে আপনাকে কিন্তু সিনোটে নামতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে আরও ইকুইপমেন্ট দরকার।'

'কি কি লাগবে বলুন।'

'বটল রিচার্জ করার জন্য এয়ার কমপ্রেসর। একশো পঞ্চাশ ফুটের বেশি নিচে নামতে হলে একটা রিকম্প্রেশন চেম্বারও স্ট্যান্ড-বাই থাকা চাই।'

'ঠিক আছে, যা যা লাগে সব যোগাড় করুন। আমার সেক্রেটারিকে বলে রাখছি, সে আপনাকে টাকা দেবে।'

'আমার সঙ্গে আর কে নামবে সিনোটে?' জানতে চাইল রানা।

'সঙ্গে একজনকে থাকতে হবে?'

'সেটাই নিয়ম। একা কেউ ডাইভ দেয় না। বিশেষ করে মাটির তলার কোন গর্তে বা ঘোলা পানিতে। পানির নিচে কখন কি ঘটে যায়।'

'ঠিক আছে, একজন ডুবুরী যোগাড় করুন।'

রানা নিজে কিনতে গেল না, কি কি লাগবে তার একটা তালিকা ধরিয়ে দিল প্রফেসরের সেক্রেটারিকে। পরদিনই সমস্ত ইকুইপমেন্ট পৌঁছে গেল বাড়িতে। সেদিনই মারিয়াকে নিয়ে পুলের ধারে চলে এল ও। 'ঠিক আছে, আমাকে দেখান।'

'দেখাব? কি দেখাব?' মারিয়া হতভম্ব।

সঙ্গে করে নিয়ে আসা স্কুবা হারনেসটা দেখাল রানা। 'দেখান যে ওটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন।'

হেসে উঠে হারনেস পরল মারিয়া, তারপর পানিতে নেমে ডুব দিল। দশ মিনিট পর উঠল সে। রানা বলল, 'ঠিক আছে, আপনাকে ডুবুরী হিসেবে ভাড়া করা হলো।'

আনন্দে হাততালি দিল মারিয়া। 'সত্যি!'

কিন্তু তার স্বামী রিমরিগো খবরটা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারল না। মারিয়াকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে রীতিমত ধমক দিতে শুরু করল সে, মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাচ্ছে, চোখে নগ্ন সন্দেহ। রানা দেখেও না দেখার ভান করল। যেভাবেই হোক, স্বামীকে শান্ত করতে পারল মারিয়া। রিমরিগো কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, আনন্দে এখনও তার চোখ জোড়া চকচক করছে।

পাঁচ

বেলফোর্সের উড়ন্ত অফিসে চড়ে এক নম্বর ক্যাম্পে এল ওরা। উড়ন্ত অফিস মানে একটা লীয়ার এগযিকিউটিভ জেট। ওদের সঙ্গে বব চ্যাপেল নেই, রয় হেনেসের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে মেক্সিকো সিটিতে রয়ে গেছে সে। প্যাসেঞ্জার হিসেবে ওরা শুধু চারজন—প্রফেসর, রিমরিগো, মারিয়া আর রানা। বরাবরের মত আর্কিওলজি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করল রিমরিগো আর বেলফোর্স। মারিয়া একটা ম্যাগাজিনে মুখ লুকাল। রিমরিগো একটু কৌশল করায় তাকে স্বামীর মুখোমুখি বসতে হয়েছে, রানার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

জানালা দিয়ে নিচেটা দেখছে রানা। আকাশ থেকে কুইনটানা রু-কে ছাতা ধরা এক টুকরো ছানা বা পনিরের মত লাগল দেখতে। নিরেট গাছগাছালির আবরণ দু'এক জায়গায় ছিন্ন হয়েছে, ফাঁকগুলো সাদাটে-ধূসর, গাঢ় সবুজের মাঝখানে কুৎসিত দেখাচ্ছে। রানার চোখে পানির কোন প্রবাহ চোখে পড়ল না; না কোন নদী, না একটা ঝর্ণা।

আলোচনার এক পর্যায়ে ইন্টারকমে পাইলটের সঙ্গে কথা বললেন বেলফোর্স। প্লেন ঘুরে গেল, সেই সঙ্গে নিচে নামছে। রানার দিকে ফিরে বললেন, 'দু'নম্বর ক্যাম্পটা একটু দেখে যাই।'

এক হাজার ফুট ওপর থেকেও জঙ্গলটাকে এত নিরেট দেখাল, মনে হলো মাটিতে পা না ফেলে হাঁটা যাবে। সবুজ এই সাগরে বৃহত্তর ঢাকার মত তিনটে শহর লুকিয়ে রাখলেও খুঁজে পাবার কোন আশা নেই।

দু'নম্বর ক্যাম্প এল, তারপর চলে গেল, ভাল করে দেখার সুযোগই হলো না, তবে প্লেন আবার ঘুরল, সাইটটাকে ঘিরে চক্করও দিল। একবার চোখে পড়ল বটে, তবে দেখার তেমন কিছু নেই। স্রেফ আরেকটা ফাঁকা জায়গা, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে ছ'টা প্রিফ্যাব্রিকেটেড হাট বা কুঁড়েঘর; সেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে লিলিপুটিয়ান কয়েকটা মূর্তি হাত নাড়ছে। জেট এখানে ল্যান্ড করতে পারবে না, ল্যান্ড করতে আসেওনি ওরা। প্লেন আবার সিধে করে নিল পাইলট, আকাশের আরও ওপরে উঠে এল, আবার রওনা হলো উপকূল ও

এক নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশে।

বিশ মিনিটে আশি মাইল পার হলো ওরা; দৃষ্টিপথে চলে এল সাগর, সৈকত আর এক নম্বর ক্যাম্পের এয়ারস্ট্রিপ। পাইলট ঠিক হ্যাঙ্গারের সামনে থামাল প্লেনটাকে। দরজা খুলে সিঁড়িতে পা দিতেই রানা যেন শক্ত পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, তাপমাত্রা এত বেশি। তাড়াতাড়ি কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়ল সবাই, একটা এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট ওগুলোকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। দীর্ঘদেহী এক লোকের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'বিগ কার্ল, ক্যাম্প ওয়ান-এর বস্।'

মাংসল একটা হাত বাড়িয়ে দিল কার্ল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা,' গলা থেকে ঢাক পেটানোর মত আওয়াজ বেরিয়ে এল।

বেলফোর্স তাঁর তেল কোম্পানি থেকে বাছাই করা লোকজন এনেছেন, শরীর ও মনের দিক থেকে সবল তারা, নিজেদের কাজে দক্ষও বটে। ক্যাম্পটা ঘুরে দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা, সবই খুব সাজানো-গোছানো। আরাম-আয়েশেরও কোন অভাব নেই। এমনকি চাওয়া মাত্র ঠাণ্ডা কোক বা বিয়ার পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সারাদিন আর পুরো রাত এক নম্বর ক্যাম্পে কাটাল ওরা। প্রচুর আর্কিওলজিকাল ইকুইপমেন্ট আগেই এখানে জড়ো করা হয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করলেন বেলফোর্স, সঙ্গে রিমরিগোও থাকল। মারিয়াকে নিয়ে স্কুবা গিয়ার চেক করল রানা। এগুলো ওরা দু'নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে না, কারণ ওয়াশওয়ানোক শহর খুঁজে পাবার পর দু'নম্বর ক্যাম্প বাতিল করে শহরের কাছাকাছি তিন নম্বর ক্যাম্প তৈরি করা হবে।

রানা আর মারিয়ার কাজ আগে শেষ হলো। প্রফেসর আর রিমরিগোকে সাহায্য করতে চাইল রানা। মাথা নেড়ে প্রফেসর বললেন, 'কোন সাহায্য লাগবে না, ধন্যবাদ।' রানার কাঁধের ওপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলেন তিনি। 'এখন যদি আপনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকান, জীবনের প্রথম মায়াঝে দেখতে পাবেন।'

চেয়ারে মোচড় খেলো রানার শরীর, এয়ারস্ট্রিপের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল সমতল জমিনের শেষ মাথায়, জঙ্গলের কিনারায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। ঢোলা ট্রাউজার, সাদা শার্ট। দাঁড়িয়ে আছে একদম স্থির। অনেকটাই দূরে, চেহারা পরিষ্কার হলো না।

'ওরা নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গেছে,' বললেন প্রফেসর। 'ওদের কাছে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত হামলা।' বিগ কার্লের দিকে তাকালেন। 'তোমাকে বিরক্ত করছে না তো, কার্ল?'

'নেটিভরা? নাহ্।' হাত তুলল কার্ল। 'উপকূলের ওদিকটায় থাকে ওরা, কোকোনাট প্ল্যানটেশনে কাজ করে।'

প্রফেসর বললেন, 'আধুনিকতা বা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে ওরা। একদিকে সাগর, আরেকদিকে দুর্ভেদ্য বনভূমি। এদিকে নিশ্চয়ই মাত্র একটা পরিবার থাকে—নারকেলের ফলন থেকে দুটো

পরিবারের ভরণ-পোষণ সম্ভব নয়।'

রানার মনে হলো, খুব কষ্টকর জীবন। 'ওরা বাঁচে কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বেলফোর্স। 'মাছ, কচ্ছপ, কচ্ছপের ডিম, এইসব খেয়ে। ভাগ্যে জুটলে মাঝে-মধ্যে দু'একটা বুনো শুয়োর গুলি করে মারে। বছরে দু'বার নারকেলের শুকনো শাঁস বেচতে পারে, তা থেকে নগদ যে টাকা পায় তা দিয়ে কাপড়, সুঁই আর কিছু কার্তুজই শুধু কেনা চলে।'

'অথচ এদেরকেই আপনি হিংস্র বলেছিলেন।'

মাথা নাড়লেন বেলফোর্স। 'না-না, আমি এদের কথা বলিনি। ইনডিওস সাবলেভাডোস আর চিকলেরোদের দেখা পাবে আরও ভেতর দিকে।' কার্লের দিকে তাকালেন। 'এদিকে তুমি কোন চিকলেরো দেখেছ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল দৈত্যাকার কার্ল। 'ব্যাটাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়েছে। চুরি করে ক্যাম্প খালি করে ফেলছিল।' চট করে একবার মারিয়ার দিকে তাকাল সে। মারিয়া রিমরিগোর সঙ্গে গল্প করছে। 'গত হপ্তায় একজন নেটিভকে ওরা খুন করেছে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'সৈকতে আমরা শুধু তার কঙ্কালটা পেয়েছি, ছিটেফোঁটা সামান্য মাংস লেগে ছিল।'

শিউরে উঠল রানা। 'মানে?'

'কাউকে খুন করলে লাশের গা থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেয় ওরা,' জবাব দিলেন বেলফোর্স। 'অনেকের ধারণা, লোকজনকে ভয় দেখানোর জন্যে কাজটা করে। আবার কেউ কেউ বলে, লাশের মাংস রান্না করে খেয়ে ফেলে।' আবার কার্লের দিকে তাকালেন তিনি। 'কার্ল, তোমার লোকজনকে খুব সাবধানে থাকতে বলবে। কেউ যেন ক্যাম্প ছেড়ে দূরে কোথাও না যায়।'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল কার্ল। 'যাবার কোন জায়গা থাকলে তো যাবে।'

রানা জানতে চাইল, 'ওদের পরিচয় কি, এই চিকলেরোদের?'

বেলফোর্সের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'অদ্ভুত একটা পেনাল সিস্টেমের ফলশ্রুতি বলতে পারেন।'

প্রফেসর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। জঙ্গলের গভীরে এক ধরনের গাছ জন্মায়, নাম জ্যাপোতে। এই গাছ শুধু ব্রিটিশ হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা আর এখানে জন্মায়। গাছটার গা ছিললে রস বেরোয়, রসের নাম চিকলি—চুইংগামের প্রধান উপকরণ। সমস্যা হলো, সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ চিকলি সংগ্রহের জন্যে জঙ্গলের ভেতর ঢুকবে না। কাজেই সরকার কাজটা করানোর জন্যে কয়েদীদের এখানে পাঠায়। ছ'মাসের মেয়াদে পাঠানো হয়, কিন্তু বেশিরভাগ চিকলেরোরা পুরো বছরই থেকে যায়। এরাই এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। মারামারি করে নিজেরা তো খুন হয়ই, ইন্ডিয়ানদের ও বহিরাগতদেরও বাগে পেলে ছাড়ে না।'

পাইপে আগুন ধরালেন বেলফোর্স, সবশেষে মন্তব্য করলেন, 'কুইনটানা রুতে মানুষের প্রাণের তেমন কোন দাম নেই।'

রানা ভাবল, এটা মায়াদের রাজ্য, অথচ সেই রাজ্যের জঙ্গলে ঢুকতে

তারাই ভয় পায়। এ থেকেই আন্দাজ করা যায় জঙ্গলটা কতটুকু ভয়ঙ্কর।

প্রফেসর বললেন, 'কখনও যদি কোন চিকলেরোর সামনে পড়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়বেন, একদম নড়াচড়া করবেন না। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, ওরা কিছু না বলে আপনাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তবে সব সময় তা না-ও ঘটতে পারে। কাজেই সাবধান। তবে, মি. রানা, চিকলেরো বা ইন্ডিয়ানরা আমাদের জন্যে খুব বড় সমস্যা নয়, তারচেয়েও বড় সমস্যা আছে।' হাত তুলে এয়ারস্ট্রিপের ওপারটা দেখালেন তিনি।

সেদিকে তাকিয়ে গাছপালা ছাড়া আর কিছু দেখল না রানা।

'এখনও আপনি বুঝতে পারছেন না?' বলে কার্লের দিকে ফিরলেন বেলফোর্স। 'কার্ল, এই ফাঁকা জায়গাটুকু বের করতে কতটুকু খাটতে হয়েছে তোমাদের?'

'এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ,' বলল কার্ল। 'রেইন ফরেস্টে আগেও আমি কাজ করেছি—আর্মিতে এঞ্জিনিয়ার ছিলাম—কোন কাজকেই এত কঠিন মনে হয়নি।'

'বুঝতে পারছেন তো?' প্রফেসর হাসছেন না। 'শুনবেন এখানকার জঙ্গলের বর্ণনা কিভাবে দেয়া হয়? বিশ-ফুট জঙ্গল, কিংবা দশ-ফুট জঙ্গল, অথবা চার-ফুট জঙ্গল। চার ফুট জঙ্গল মারাত্মক দুঃসংবাদ, এর মানে হলো কোনদিকেই আপনি চার ফুটের বেশি দেখতে পাবেন না। ভেবে দেখুন ঘন জঙ্গল কাকে বলে। তার ওপর আছে মশা, সাপ, পানির অনটন। চিকলেরোরা যে দুনিয়ার কঠিনতম পাত্র, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়—এখানে তারা টিকে আছে। কুইনটানা রুতে আপনার আসল শত্রু জঙ্গল! ওয়াশওয়ানোক পেতে হলে এই জঙ্গলের সঙ্গেই লড়াই করে জিততে হবে আমাদের।'

পরদিন ওরা দু'নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছুল। হেলিকপ্টার ওদেরকে খুব নিচু দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এল, গতিও তেমন বেশি নয়। সারাটা পথ সবুজ স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ওর পায়ের নিচে প্রবাহিত হচ্ছে—জঙ্গলের মাথা, অথচ সাগর বলে ভ্রম হয়।

গোটা এলাকায় পানির প্রচণ্ড অভাব, কারণটাও রানার জানা আছে। ইউকাটান পেনিনসুলায় রয়েছে লাইমস্টোনের একটা বিশাল আবরণ। এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু বৃষ্টির পানি সবটুকুই দ্রুত শুষে নেয় লাইমস্টোন, মাটির তলা থেকে তা আরও নিচে নেমে এমন একটা স্তরে জমা হয় যেখান থেকে বেরুবার কোন পথ পায় না। অর্থাৎ ইউকাটানের নিচে মিষ্টি পানির বিশাল একটা ভাণ্ডার আছে, কিন্তু জমিনের ওপর জমার বা নিচ থেকে উঠে আসার কোন সুযোগ না থাকায় কোন নদী তৈরি হতে পারে না। জমিনের নিচেই পানির ভাণ্ডার, সৈকত এলাকায় অগভীর একটা গর্ত খুঁড়লেই মিষ্টি পানি পাওয়া যাবে, সাগর থেকে মাত্র তিন ফুট দূরে। উপকূল থেকে ভেতর দিকে অনেক জায়গায় লাইমস্টোনের আবরণ ধসে পড়ে, তখন আন্ডারগ্রাউন্ডের

পানি দেখতে পাওয়া যায়— ওগুলোকেই সিনোট বলে। পানি খুব কাছাকাছি থাকায় গাছের শিকড় অনায়াসেই তার নাগাল পেয়ে যায়। এত ঘন জঙ্গল তৈরি হবার সেটাই আসল রহস্য।

আকাশ থেকে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবছে, নিচে ওটা কি বিশ-ফুটী, নাকি চার-ফুটী? মাত্র পাঁচশো ফুট ওপরে রয়েছে ওদের হেলিকপ্টার, তারপরও রানা জমিন দেখতে পাচ্ছে না। একটা কথা ভেবে আপনমনে হাসল ও। রয় হেনেস যদি সুস্থ ও বুদ্ধিমান প্রাণী হয়, কুইনটানা রুর কাছাকাছিও আসবে না সে।

দু'নম্বর ক্যাম্প সরল একটা আয়োজন। হেলিকপ্টারের জন্যে হ্যাঙ্গার আছে, পাঁচিলবিহীন ডাচ গোলাবাড়ির মত দেখতে। এক কামরাতেই ডাইনিংরুম আর লাউঞ্জের কাজ চলে। একটাতে ইকুইপমেন্ট রাখার ব্যবস্থা, বাকি চারটেতে ঘুমোবার। সবগুলো কুঁড়ে প্রিফ্যাব্রিকেটেড, হেলিকপ্টার করে বয়ে আনা হয়েছে। সবই সাদামাঠা, তবে আরাম-আয়েশের কোন অভাব নেই। প্রতিটি কুঁড়েতে এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট আর রিফ্রিজারেটর আছে।

ওরা চারজন ছাড়া ক্যাম্পে একজন কুক আর তার সহকারী আছে। তারা শুধু রান্নাবান্না করে না, ঘরদোর ঝাড়মোছও করে। আর আছে হেলিকপ্টার পাইলট।

ক্যাম্পের চারদিকে জঙ্গল, সবুজ ও দুর্ভেদ্য। কিনারা পর্যন্ত হেঁটে এসে পরীক্ষা করল রানা, প্রফেসরের দেয়া সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোন পর্যায়ে পড়ে। ওর হিসেবে জঙ্গলটা পনেরো-ফুটী—স্থানীয় মানে পাতলাই বলতে হবে। গাছগুলো লম্বা, ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি করে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে লিপ্ত আলোর নাগাল পাবার আশায়, গায়ে জন্মেছে বিচিত্র বর্ণ আর আকৃতির পরগাছা। কুঁড়েগুলো থেকে ভেসে আসা মানুষের তৈরি আওয়াজ ছাড়া গোটা পরিবেশে কবরের নিস্তব্ধতা।

ঘাড় ফেরাতেই পাশে মারিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নার্ভাস একটু হাসল রানা, বলল, 'শত্রুর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। কুইনটানা রুতে আগে কখনও এসেছেন?'

'না,' বলল মারিয়া। 'এখানে আসিনি। আলফাঁসোর সঙ্গে কাম্পেচি আর গুয়েতেমালায় গেছি, মাটি খোঁড়ার সময়। এরকম জঙ্গল আগে কখনও দেখিনি।'

'এই জঙ্গলে কেউ যদি আইফেল টাওয়ারও লুকিয়ে রাখে, খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়,' মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু ভুলে যাবেন না যে প্রফেসর বেলফোর্স আর আলফাঁসো এ-ব্যাপারে প্রফেশনাল।'

বড় কুঁড়েটায় মীটিং ডাকলেন বেলফোর্স। দেয়ালে আটকানো কর্ক বোর্ডে বিরাট একটা ফটো-মোজাইক ঝোলানো হলো, টেবিলটা ম্যাপে ভর্তি। হেলিকপ্টার পাইলট ডিনো পাসকেলাও ওদের সঙ্গে রয়েছে, কারণটা পরে

বুঝতে পারল রানা।

সবাইকে কোক আর বিয়ার পরিবেশন করে বেলফোর্স শুরু করলেন, 'সমস্যার মূল হলো সিনোটগুলো। উলমা দে পেলায়েজ বলে গেছেন ওয়াশওয়ানোকের মাঝখানে একটা সিনোট আছে। তাঁর কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। একটা শহরে পানি দরকার, আর সিনোটই পানির একমাত্র উৎস।' হাতে পয়েন্টার নিয়ে ফটো-মোজাইকের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। 'আমরা এখানে রয়েছি, খুব ছোট একটা সিনোটের পাশে, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায়।' রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি যদি প্রথমবারের মত মায়াদের তৈরি কোন কাঠামো দেখতে চান, এই সিনোটের পাশেই পাবেন।'

'বলছেন কাছেই একটা সিনোট আছে, আমরা তাহলে সেখানে কিছু খুঁজছি না কেন?' রানা অবাক।

'লাভ নেই, তাই। এখানে যা-ই পাই, তাতে আমাদের নতুন কিছু জানা হবে না।' পয়েন্টার ঘুরিয়ে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করলেন বেলফোর্স। 'এই দশ মাইলের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে পনেরোটা সিনোট আছে, তার মধ্যে একটা হয়তো ওয়াশওয়ানোক শহরে।'

'শহরটা কত বড় হবে বলে আশা করছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রিমরিগো বলল, 'চিচেন ইটজার চেয়ে বড়, উলমার ম্যাপ যদি সঠিক বলে ধরি।'

প্রফেসর বললেন, 'মায়ারা রাস্তার দু'ধারে বাড়ি-ঘর তৈরি করে বাস করত না। তাদের ঘর ছিল আকারে ছোট, ঘরের সঙ্গে খামারও ছিল। পাথুরে কাঠামো ছিল শহরের মাঝখানে—মন্দির, বাজার, এই সব।'

'জনসংখ্যা?'

'দিদিয়া তাঁর বইতে লিখেছেন চিচেন ইটজার লোকসংখ্যা ছিল দুই লাখ,' বলল রিমরিগো। 'ওয়াশওয়ানোকের লোকসংখ্যা কিছু বেশি হতে পারে—এই ধরুন, আড়াই লাখ।'

'প্রাচীন একটা শহরে আড়াই লাখ মানুষ তো বিরাট ব্যাপার।'

'বিশাল সব কাঠামো তৈরি করার জন্যে প্রচুর লোকজন লেগেছে,' বললেন প্রফেসর। 'ওরা নিয়ালিথিক ছিল, পাথরকে বিভিন্ন আকার দেয়ার জন্যে পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করত। আমার ধারণা একশো একর নিয়ে ছিল ওয়াশওয়ানোকের কেন্দ্র। তারমানে বেশিরভাগ লোকজন শহরের বাইরে বাস করত। তবে শহরতলির কোন চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ কাঠ বা বাঁশের তৈরি ভবন এখানকার আবহাওয়ায় বেশিদিন টেকে না।' পয়েন্টার দিয়ে আবার তিনি ফটো-মোজাইকে আঘাত করলেন। 'আমাদেরকে তাহলে পনেরোটা সিনোট চেক করতে হবে। যদি কিছু না পাই, আরও সামনে খোঁজ করতে হবে। বিশ মাইল দূরে আরও ঊনপঞ্চাশটা সিনোট আছে। সবগুলো চেক করতে প্রচুর সময় লাগবে।'

'অত সময় কি দিতে পারব আমরা?' জানতে চাইল রানা।

বেলফোর্স জবাব না দিয়ে পয়েন্টারটা ডিনো পাসকেলার দিকে তাক করলেন, 'আমাদের সঙ্গে পাইলট পাসকেলা আর তার হেলিকপ্টার আছে, কাজেই কাজটা খুব কঠিন হবে না। জঙ্গল মাড়িয়ে এগোনোর বয়স আমি পার হয়ে এসেছি।'

'ওদিকে বেশ কিছু ওয়াটার-হোল এরইমধ্যে দেখে এসেছি আমি,' বলল পাসকেলা। 'মি. বেলফোর্স, ওগুলোর পাশে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করানো সম্ভব নয়। জঙ্গল অসম্ভব ঘন।'

'এদিকে আগেও আমি এসেছি, কাজেই জানি,' বললেন বেলফোর্স। 'আমরা ফটো সার্ভের ব্যবস্থা করব। জমিনে উঁচু-নিচু কিছু থাকলে জঙ্গলে তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক, রঙিন ফটোয় তা ধরা পড়তে পারে। ইনফ্রা-রেডে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিছু ফ্লাইট খুব সকালে আর সন্ধের দিকে ওগুলোর ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করবে—আমরা ছায়া থেকে কিছু পেয়ে যেতে পারি।'

'আপনি বললেই আমি কাজ শুরু করে দিতে পারি,' বলল পাসকেলা।

'ক্যামেরা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে লাঞ্চের পরই রওনা হব আমরা।'

লাঞ্চের পর বেলফোর্স আর রিমরিগো চলে গেল। হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর নিজের কুঁড়েতে ফিরে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। পাশের কুঁড়ে থেকে মারিয়ার নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ বোধ করছে ও, ধারণা করল মারিয়ারও একই অবস্থা। কিন্তু মেয়েটা আসছে না দেখে কুঁড়ে থেকে আবার বেরিয়ে এল ও, ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সিনোটটা খুঁজে নিল। বেলফোর্স বলেছেন, এখানে মায়াদের একটা কাঠামো আছে। দেখা যাক খুঁজে বার করতে পারে কিনা।

ডায়ামিটারে সিনোটটা ত্রিশ ফুট, গহবরের পনেরো ফুট নিচে পানির সারফেস। গহবরের গা খাড়াই নেমে গেছে, তবে নিচে নামার জন্যে কেউ কয়েকটা ধাপ তৈরি করে রেখেছে। অকস্মাৎ একটা এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল রানা। গাছের ফাঁকে উঁকি দিতেই ছোট একটা পাম্প দেখতে পেল, পেট্রল এঞ্জিনে চলছে। পাম্পটা সিনোট থেকে ক্যাম্পে পানি সাপ্লাই দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, নির্দিষ্ট সময় পরপর আপনা থেকেই সচল হয় ওটা। প্রফেসরের প্রশংসা করতে হয়, এটা তাঁর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আরও একটা দৃষ্টান্ত।

মনোযোগ দিয়েই খুঁজল রানা, কিন্তু কোন পাথুরে কাঠামো চোখে পড়ল না। আধ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসবে, এই সময় সিনোটের উল্টোদিকে দু'জন লোককে দেখল, সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ছেঁড়া-ফাটা ট্রাউজার পরনে, দাঁড়িয়ে আছে যেন একজোড়া পাথুরে মূর্তি। ছোটখাট, হাত আর গলায় শিরা বেরিয়ে আছে, বাদামী রঙ, দুটো বুকই নগ্ন। নির্লিপ্ত, শীতল দৃষ্টি। ত্রিশ সেকেন্ডের মত তাকিয়ে থাকার পর ঘুরল

তারা, চোখের পলক ফেলার আগেই জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেলিকপ্টার ফিরে এল একগাদা ফিল্ম স্পূল নিয়ে। ডার্করুমের ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে, কালার ফিল্মগুলো ডেভলপ করতে খুব সময় লাগল না। তারপর প্রথম স্পূলটা প্রফেসর বেলফোর্স ফিল্ম স্ট্রিপ প্রজেক্টরে ভরলেন। সুইচ অন করার পর স্ক্রীনে ঝাপসা সবুজ ভাব ছাড়া কিছুই ফুটল না। 'ফোকাসে ত্রুটি হয়েছে,' বলে প্রজেক্টরে নতুন আরেকটা ফ্রেম ভরা হলো। এটায় জঙ্গল ফুটেছে, ফুটেছে একটা সিনোটে প্রতিফলিত নীল আকাশ। ফটোটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল রিমরিগো আর বেলফোর্স। দু'ঘণ্টা ধরে বাকি স্পূলগুলোও দেখা হলো। সবশেষে বেলফোর্স বললেন, 'আমাদের হাতে এখনও স্টেরিও পিকচার আছে। আসুন ওগুলো দেখা যাক।'

প্রজেক্টর বদল করা হলো, রানার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো একজোড়া পোলারয়েড গ্লাস। স্টেরিও ছবিগুলো থ্রী-ডাইমেনশনাল। সবগুলো ছবিই দেখলেন বেলফোর্স, আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেল না। 'রাত অনেক হয়েছে, আজকের মত এখানেই ইতি, আবার কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করা যাবে,' বললেন তিনি।

উল্টো করা হাত মুখে ঠেকিয়ে হাই তুলল রানা, তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, 'সিনোটে আমি দু'জন লোককে দেখেছি।'

'চিকলেরো?' দ্রুত জানতে চাইলেন বেলফোর্স।

'ছোটখাট, তামাটে, নাকগুলো বড়।'

'মায়া,' ধারণা করলেন প্রফেসর। 'কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছিল কি ঘটছে এদিকে।'

'ওয়াশওয়ানোক শহরটা কোথায় ওদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করছি না কেন?'

'ওরা জানে না। জানলেও বলবে না। আধুনিক মায়ারা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। ওদের বিশ্বাস প্রকাণ্ড একদল দৈত্য শহরগুলো ধ্বংস করে দেয়। সিনোটে ওরা পানির জন্যে যায় বটে, কিন্তু আশপাশে কোন ধ্বংসাবশেষ দেখলে সেটা দেবতা অথবা দৈত্যদের আস্তানা বলে বিশ্বাস করে, মনে করে ওদিকে ঘুর ঘুর করলে মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে। সে যাক, সিনোটটার পাশে মায়াদের বিল্ডিংটা দেখলেন?'

'অনেক খুঁজেও পাইনি,' স্বীকার করল রানা।

রিমরিগো মুখে হাত চাপা দিল। আর বেলফোর্স হেসে উঠলেন। 'তেমন লুকানো নয়, আমি তো প্রথমবারই দেখতে পাই,' বললেন তিনি। 'ঠিক আছে, কাল আপনাকে দেখাব। দেখলে খানিকটা ধারণা পাবেন কি ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লাগতে এসেছি আমরা।'

রানাকে নিয়ে সিনোটে চলে এলেন বেলফোর্স, হাত তুলে মায়াদের বিল্ডিঙটা দেখালেন ওকে। আট-দশবার ওটার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে, অথচ

একবারও ওটার অস্তিত্ব ধরা পড়েনি রানার চোখে। সিনোটের পাশেই ওটা, ঘন গাছপালার ভেতর। প্রফেসর যখন বললেন, 'ওই তো!' তারপরও রানার চোখে প্রথমে কিছু ধরা পড়ল না।

প্রফেসর হাসলেন। 'আরও কাছে যান।' কাজেই ফাঁকা জায়গাটার আরও কাছে সরে এল রানা। তাসত্ত্বেও চোখ ধাঁধানো রোদ, লতাপাতা, শাখা আর ছায়ার সমষ্টিতে তৈরি বিচিত্র নকশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পিছন ফিরে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'পাতার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিন,' পরামর্শ দিলেন বেলফোর্স। তাঁর কথা মত তাই করল রানা, সেই সঙ্গে হাতে শক্ত পাথরের বাড়ি খেয়ে রীতিমত চমকে উঠল।

'এবার পিছিয়ে এসে নতুন করে তাকান,' বললেন প্রফেসর।

পিছিয়ে এসে আঙুলের গিঁট ডলছে রানা, চোখ সরু করে জঙ্গলের দিকে তাকাল আবার। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার—এক মুহূর্ত আগে ওখানে কিছু ছিল না, পরমুহূর্তে দেখা গেল রয়েছে, যেন অদ্ভুত এক দৃষ্টিভ্রমের ঘটনা ঘটছে এখানে। নতুন করে তাকাতে বিল্ডিঙটার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল বটে, তবে তা শুধু যেন খুঁতবহুল ছায়ার তৈরি একটা কাঠামোর ভৌতিক আভাস মাত্র। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল রানা। 'ওটা শুরু হয়েছে ওদিকে—আর শেষ হয়েছে ওখানে?'

'এই তো ধরে ফেলেছেন।'

কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, যেন ভয় পাচ্ছে আবার না অদৃশ্য হয়ে যায়। 'কি ওটা?' জানতে চাইল ও।

'বৃষ্টির দেবতা চ্যাচ-এর মন্দির হতে পারে, সাধারণত সিনোটের পাশেই তৈরি করা হত। ইচ্ছে হলে ওটার গা থেকে জঙ্গল সাফ করতে পারেন। অল্প দামী কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। তবে সাবধান, সাপ আছে।'

'পরে ফিরে এসে আবার খুঁজে পাব কিনা কে জানে।'

কৌতুক বোধ করছেন বেলফোর্স। 'আর্কিওলজিকাল রিসার্চ করতে হলে চোখ দুটোকে ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে, তা না হলে একটা শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবেন অথচ ওটাকে দেখতে পাবেন না।'

সেদিন থেকে রোজ তিন থেকে চারবার হেলিকপ্টার নিয়ে ছবি তুলতে গেল ওরা। রাতেই ছবিগুলো ডেভলপ করা হয়। আশাপ্রদ তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু এক এক করে সম্ভাবনাগুলো বাতিল করে দিয়ে অনুসন্ধানের এলাকা ছোট করে আনছেন প্রফেসর আর রিমরিগো।

রওনা হবার সময় রিমরিগো প্রতিবারই রানাকে সঙ্গে নিতে চায়, কিন্তু প্রতিবারই প্রফেসর বাদ সাধেন। তার যুক্তি হলো, ক্যাম্পে একজন থাকা দরকার। আর তাছাড়া, মারিয়াকে একা রেখে যাওয়াটা বোকামি হবে। প্রথম দিকে মারিয়াও ওদের সঙ্গে গেল, রিমরিগোর জেদে বাধ্য হয়ে। কিন্তু তারপর মারিয়া বলল, হেলিকপ্টারে চড়লে তার মাথা ঘোরে, বমি পায়, সময়টাও একঘেয়ে লাগে।

একা মারিয়ার সঙ্গে ক্যাম্পে থাকার সময় রানা খুব সচেতন থাকে,

মেয়েটার কুঁড়েতে ভুলেও কখনও ঢোকে না। তবে সে যখন রানার কুঁড়েতে আসে, রানা তাকে বসতে বলে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একটা হেলিকপ্টার নিয়ে ক্যাম্পে এল বব চ্যাপেল। দু'দিন থেকে আবার চলে গেল সে। এই দু'দিন রানার সঙ্গে অনেক কথা হলো তার। রিমরিগো সম্পর্কে প্রশ্ন করায় চ্যাপেল জানাল, নিজের পেশায় রিমরিগো মোটেও সৎ নয়, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে প্রচুর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিখ্যাত আর্কিওলজিস্টদের গবেষণা-পত্র চুরি করে নিজের কাজ বলে চালানো তার একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সে কোন কাজ করে না, ফলে আয়ও নেই। তবে মারিয়া তার বাবার কাছ থেকে টেক্সাসে একটা র‍্যাঞ্চ পেয়েছে, সেটার আয়েই ওদের সংসার চলে।

চ্যাপেল চলে যাবার পর মারিয়ার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ করল রানা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, স্বামী সম্পর্কে আলোচনা করতে মোটেও রাজি নয় মেয়েটা। প্রতিবারই প্রসঙ্গটা সযত্নে এড়িয়ে যায়। স্বামীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ যদি থাকেও, তৃতীয় কোন পক্ষকে সেটা জানাতে চায় না। রানার মনে হলো, মারিয়া শুধু একটা ব্যাপারেই সচেতন। আর তা হলো, রিমরিগো বদমেজাজী। সে যে অসৎ, তার বিরুদ্ধে যে চুরির অভিযোগগুলো সত্যি, এ-সব সে বিশ্বাস করে না বা জানেই না। রানা একদিন চেপে ধরতে মারিয়া শুধু বলল, 'আলফাঁসো সম্পর্কে কি আলোচনা করব। ওকে আমি ভালবাসি, তবে ওর মেজাজকে ভয় পাই। সেজন্যেই তো প্রতিজ্ঞা করেছি, ওকে সুস্থ করার জন্যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব।'

কোথায় থামতে হয় রানা বোঝে। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'চলুন, মায়াদের বিল্ডিঙটা থেকে গাছপালা সরিয়ে দেখি ভেতরে কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যেতে পারে, শুনে মারিয়ার চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠল। দু'জনেই ছুটল ওরা, স্টোর থেকে ম্যাচেটি নিয়ে তখুনি আবার বেরিয়ে এল। গাছপালার আবরণ কেটে-ছেঁটে পরিষ্কার করার পর লাইমস্টোনের কাঠামোটা বেরিয়ে পড়ল। প্রতিটি লাইমস্টোনের টুকরো মাপ মত কাটা, একটার ওপর একটা সাজানোও হয়েছে দক্ষ মিস্ত্রিদের নিখুঁত কৌশলে। সিনোটের কাছাকাছি পাঁচিলে ওরা একটা দরজা পেল, খানিকটা তোরণ আকৃতির। ভেতরে উঁকি দিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তবে আওয়াজ শুনে মনে হলো ভেতরে ভোমরা বা মৌমাছি আছে। মারিয়া রানাকে ঢুকতে নিষেধ করল।

পিছিয়ে এসে নিজের দিকে তাকাল রানা। গাছ কাটার সময় সারা শরীর ঘেমে গেছে, মাটি লেগে নোংরা হয়ে গেছে খালি গা। 'যাই, সিনোটে নামি,' বলল ও। 'পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

'ওহ্, দারুণ আইডিয়া,' লাফিয়ে উঠল মারিয়া। 'যাই, আমি আমার কস্টিউম নিয়ে আসি।'

রানা হাসল। 'আমার ও-সব লাগবে না—শর্টস থাকায় সাঁতরাতে কোন অসুবিধে হবে না।'

সিনোটের পাশে চলে এসে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল রানা। পানির তলা দেখা যাচ্ছে না, সেটা ছ'ইঞ্চি থেকে ষাট ফুট গভীর হতে পারে, কাজেই ডাইভ দেয়াটা উচিত হবে না। ধাপ বেয়ে পানির কাছাকাছি নেমে এল ও। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে পানিতেও নামল। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল, তারপর ডুব দিল।

কয়েকবার ডুব দিয়েও তলা ছুঁতে পারল না রানা। শেষ বার রোদের মধ্যে মাথা তুলতে দেখল মারিয়া হাজির হয়েছে।

'ভাবছিলাম আপনি গেলেন কোথায়,' বলল সে।

পানি থেকে পনেরো ফুট ওপরে, সিনোটের কিনারায় ডাইভ দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারিয়া। 'কতটুকু গভীর? ডাইভ দিতে পারব?' জিজ্ঞেস করল রানাকে।

'ত্রিশ ফুট পর্যন্ত নেমেছি, তল পাইনি,' বলল রানা।

'গুড!' বলেই ডাইভ দিল মারিয়া। সিনোটের চারধারে ধীরে ধীরে সাঁতরাচ্ছে রানা, মারিয়া পানি থেকে উঠছে না দেখে চিন্তিত। তারপর হঠাৎ অনুভব করল কে যেন ওর পা ধরে টানছে। সেই টানে পানির নিচে তলিয়ে গেল ও।

হাসতে হাসতে পানির ওপর মাথা তুলল দু'জন। 'প্রফেসরের পুলে আপনি আমাকে টেনেছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলাম,' বলে রানার দিকে হাতের তালু দিয়ে পানি ছিটাল মারিয়া। মিনিট দুয়েক আনন্দে মুখর শিশুদের মত পরস্পরের উদ্দেশে পানি ছোঁড়াছুঁড়ি করল ওরা, তারপর ক্লান্ত হয়ে থামল। মারিয়া জিজ্ঞেস করল, 'পানির তলায় চ্যাচ আছেন, ডুব দিতে আপনার ভয় করেনি?'

'কে বলল আছেন?'

'প্রতিটি সিনোটের তলাতেই তাঁর বাস। মায়ারা সেজন্যেই তো কুমারী মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। মেয়েগুলো ডুব দিত দেবতার সঙ্গে মিলিত হবার আশায়। দু'একটা মেয়ে আশ্চর্য সব গল্প নিয়ে ফিরে আসত।'

'আর যারা ফিরত না?'

'চ্যাচ তাদেরকে নিজের জন্যে রেখে দিতেন। মাঝে মধ্যে সবাইকে তিনি রেখে দিতেন, ফলে ভয় পেয়ে মায়ারা পাথর ছুঁড়ত, সিনোটকে শায়েস্তা করার জন্যে। তবে তাতে কুমারী মেয়েগুলোকে ফেরত পাওয়া যেত না।'

'সেক্ষেত্রে আপনার সাবধান হওয়া উচিত,' বলল রানা।

রানার দিকে পানি ছুঁড়ল মারিয়া। 'আমি কুমারী নই।'

'হেলিকপ্টার ফিরে আসার সময় হয়েছে,' পানি থেকে উঠে পড়ল রানা, একটা হাত বাড়াল মারিয়াকে সাহায্য করার জন্যে।

সিনোট থেকে উঠে এসে রানার দিকে একটা তোয়ালে বাড়িয়ে দিল মারিয়া। মাথা নেড়ে রানা বলল, 'লাগবে না, রোদে শুকিয়ে যাবে গা।'

তোয়ালেটা ঘাসে বিছিয়ে তাতে বসল মারিয়া। 'সেদিন আপনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু সবই আলফাঁসো সম্পর্কে। তারমানে, ধরে

নিতে হয়, আমার সম্পর্কে আপনার কোন আগ্রহ নেই।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়। আপনার সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল অবশ্যই আমার কাছে। আমি বলতে চাইছি, অন্যায় কোন কৌতূহল নেই।'

'সেজন্যে ধন্যবাদ,' মৃদুস্বরে বলল মারিয়া। 'আরও একটা কারণে ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে ক্যাম্পে আমি একা রয়েছি, দিনের পর দিন। অথচ আপনি কোনভাবে আমাকে বিরক্ত করেননি।'

রানা কিছু বলল না।

'কেন যেন মনে হচ্ছে, নিজের সম্পর্কে আপনাকে খানিকটা বলা দরকার,' একটু পর বলল মারিয়া। 'আমাদের র‍্যাঞ্চটা টেক্সাসে হলেও, আমার বাবা ভার্জিনিয়ার একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, আমি সেই কলেজেই কাজ করি।'

'আপনি শিক্ষিকা?'

'না, স্রেফ সেক্রেটারি।'

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে মাফ চাই। এই অভিযান থেকে আপনি বা আপনার স্বামী কতটুকু কি আশা করেন?'

'আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুই আশা করি না,' বলল মারিয়া। 'তবে আলফাঁসোর জন্যে এটা একটা অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও। যাকে বিয়ে করেছিলাম, এ যেন সে লোক নয়। শুধু যে কুইনটানা রুর সঙ্গে লড়ছে তা নয়, প্রফেসর বেলফোর্সের সঙ্গেও যুদ্ধ করছে।'

'অথচ প্রফেসর না চাইলে উনি এখানে আসতে পারতেন না।'

'তার বোঝা উচিত প্রফেসরের সঙ্গে পারা সম্ভব নয়—ভদ্রলোকের টাকা আছে, যোগাযোগ আছে, সুখ্যাতি আছে। তার তুলনায় সে কিছুই নয়, আর এই চিন্তাটাই তাকে পাগল করে তুলছে।' হঠাৎ ব্যাকুল দেখাল মারিয়াকে। 'আপনার কি মনে হয় আলফাঁসোর প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে প্রফেসর তাকে বঞ্চিত করবেন?'

'প্রফেসরকে আমার নীচ প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়নি।'

'কিন্তু আলফাঁসো আজ যে পাগলামি শুরু করেছে, এর জন্যে প্রফেসরই দায়ী,' অভিযোগ করল মারিয়া।

'প্রফেসর হয়তো আগে খানিকটা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে সেজন্যে আপনার স্বামীর বদমেজাজ আর স্বার্থপর স্বভাবই দায়ী। আপনার স্বামীর সঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন—নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমার ওপর অকারণে রেগে থাকেন তিনি।'

'না, এ আপনার ভুল ধারণা!' রেগে যাচ্ছে মারিয়া। 'আপনিও দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন।'

'আমি কারও পক্ষ নিচ্ছি না। আমাদের এই অভিযান সায়েন্টেফিক রিসার্চ ছাড়া কিছুই নয়, অথচ এটাকে একটা লড়াইয়ে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সেজন্যে একা আপনার স্বামী দায়ী, প্রফেসর বেলফোর্স নন।'

রেগে গেলে কোন কোন মেয়েকে আরও সুন্দর দেখায়, অন্তত মারিয়ার ব্যাপারে কথাটা বিশেষভাবে সত্যি। রেগে তো গেছেই, রানার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, মনে হলো অভিমানে কেঁদে ফেলবে।

'মারিয়া, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা খুব ভাল গুণ,' নরম সুরে বলল রানা। 'কিন্তু আপনি শুধু বিশ্বস্ত নন, তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি আর অন্যায় আচরণ সমর্থন করছেন।'

মারিয়া কিছু বলার আগেই হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। কয়েক সেকেন্ড পর ওদের মাথার ওপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে গেল ওটা। মাথা তুলে তাকাতেই রানা দেখতে পেল, ঘাড় বাঁকা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রিমরিগো।

সেদিন গভীর রাতে মারিয়া আর রিমরিগোর কুঁড়ে থেকে ঝগড়া-ঝাঁটির আওয়াজ ভেসে এল। পরদিন সকালে দেখা গেল ফুলহাতা একটা শার্ট পরেছে মারিয়া, কলার দিয়ে ঘাড় ঢাকা। তবে কলারটা এত উঁচু নয় যে গলাটা পুরোপুরি ঢাকতে পেরেছে। সেখানে আঁচড়ের লম্বা লম্বা দাগ দেখল রানা, সাদা চামড়ার ওপর লালচে হয়ে আছে। উত্তেজনায় আর রাগে ওর পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, তবে মারিয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকল। দেখা গেল, সেদিন থেকে মারিয়া ওকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। তবে রিমরিগোর মধ্যেও কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, আগের মতই রানাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে সে, সুযোগ পেলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেও ছাড়ছে না।

তিন দিন পরপর এক নম্বর ক্যাম্প থেকে বড় একটা হেলিকপ্টার আসে সাপ্লাই নিয়ে। প্রফেসরের জেট প্লেন মেক্সিকো সিটিতে চিঠি-পত্র নিয়ে আসে, সেগুলোও হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়। লন্ডন হয়ে ঢাকা থেকে বিসিআই ও রানা এজেন্সির কিছু চিঠি-পত্র এল, সবই কোড করা, কোড ভেঙে পড়ার পর রানা জানতে পারল, বড় ধরনের কোন সংকট সৃষ্টি না হওয়ায় ওর ছুটি বাতিল করা হয়নি।

প্রফেসর বেলফোর্সও বব চ্যাপেলের একটা চিঠি পেয়েছেন। চ্যাপেল লিখেছে, রয় হেনেস ইউকাটানে চক্কর দিচ্ছে। মেরিডা, ভালাডোলিড আর ভিগিয়ো চিকো-তে গিয়েছিল, এখন রয়েছে ফিলিপি কার্লিয়ো পুয়ের্তো-য়। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, কিছু বা কাউকে খুঁজছে সে। অদ্ভুত সব লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, বৈঠক করছে গোপনে।

প্রফেসরকে চিন্তিত মনে হলো। 'ডিনো পাসকেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আলফাঁসো, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।'

চেয়ারে বসে ছিল রিমরিগো, পা দুটো সামনে লম্বা করে দিল, ওঠার কোন লক্ষণ নেই।

রানা জানতে চাইল, 'এয়ার সার্ভে থেকে কি পেলাম আমরা?'

'সামান্যই,' বললেন বেলফোর্স। 'আর কিছু পাবার নেইও। এবার

আমাদের জমিনে পা ফেলতে হবে।' ফটো-মোজাইকের দিকে হাত তুললেন তিনি। 'সম্ভাবনার ক্ষেত্র ছোট করা গেছে। আমাদের তালিকায় এখন চারটে সাইট।' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় রিমরিগোর দিকে তাকালেন। 'আলফাঁসো, পাসকেলকে ডাকছ না?'

'আমি তাহলে এখানকার পিয়ন?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রিমরিগো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন বেলফোর্স। কথা না বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হেলিকপ্টারের যত্ন নিচ্ছিল পাসকেল। 'মীটিং,' বলল রানা। 'আপনারও উপস্থিতি দরকার।'

কাজ ফেলে ঘুরল পাসকেল। 'চলুন।' রানার সঙ্গে রওনা হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার সমস্যা কি বলুন তো, মি. রানা? আলফাঁসো রিমরিগোর?'

'কেন, কি হয়েছে?'

'প্রথমে তো আমি নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বলে কিনা, এই পাসকেল, রাসকেল, তুমি আমার স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলবে না। আমি তো হতভম্ব। প্রতিবাদ করলাম, উত্তরে ধমক দিয়ে কি বলল শুনবেন? বলল, যাও, আমার জন্যে ঠাণ্ডা কোক আনো। কি আশ্চর্য! আমি কি তার চাকর?'

'মানুষটাই ওরকম,' বলল রানা। 'সিরিয়াসলি নেবেন না।'

'আমি ওর মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেব,' হিসহিস করে বলল পাসকেল। 'নিজের বউকে যে বিশ্বাস করতে পারে না, সে একটা মানুষ নাকি।'

'না, পাসকেল, মাথা গরম করবেন না,' সাবধান করে দিল রানা।

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। তবে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে ওর কপালে সত্যি খারাবি আছে।'

বড় কুঁড়েটায় ঢোকার পর রানা অনুভব করল, রিমরিগো আর বেলফোর্সের মধ্যে কিসের যেন একটা চাপা উত্তেজনা।

টেবিলের ওপর ঝুঁকল ও। 'সমস্যাটা কি? কি নিয়ে মাথা ঘামাব?'

'সম্ভাব্য জায়গা বাছা হয়েছে চারটে,' বললেন বেলফোর্স। 'কিন্তু মাত্র একটায় হেলিকপ্টার ল্যান্ড করানো যাবে। কাজেই ওটাই প্রথমে চেক করব আমরা।'

'বাকিগুলো?'

'উইঞ্চের সাহায্যে লোক নামাতে হবে,' বললেন প্রফেসর। 'আগেও আমি নেমেছি, আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

কিন্তু প্রফেসরের বয়েস কমেনি, বেড়েছে। 'আপনি নন, আমি নামব,' বলল রানা।

'নেমে কি করবেন? এমন একজন লোক দরকার ওখানে, যার কপালে চোখ আছে,' বলল রিমরিগো।

বলার ভঙ্গিটা ব্যঙ্গাত্মক হলেও, রিমরিগোর কথায় যুক্তি আছে। প্রফেসর মায়াদের যে কাঠামো অনায়াসে দেখতে পেয়েছেন, হাত তুলে দেখিয়ে দেয়ার

পরও রানা সেটা খুঁজে পায়নি।

দ্রুত হাত নেড়ে বেলফোর্স বললেন, 'ঠিক আছে, হয় আমি নামব, নয়তো তুমি নামবে।' পাসকেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'ডিনো, তুমি তৈরি? আমরা এখুনি রওনা হতে চাই।'

'ইয়েস, বস্। আমি তৈরি।'

পাসকেলকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন বেলফোর্স, রানাও ওদের পিছু নিল। পিছন থেকে রিমরিগো ডাকল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, কথা আছে।'

ঘুরল রানা, দেখল কোমরের বেল্টটা আঁট করে বাঁধছে রিমরিগো, সেই সঙ্গে নিতম্বের কাছে ম্যাচেটিটা অ্যাডজাস্ট করছে। 'কি কথা?'

'এই শেষবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,' টান টান গলায় বলল রিমরিগো। 'আমার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবেন।'

'রিমরিগো, এভাবে কথা বললে নিজের স্ত্রীকে অপমান করা হয়, এই বোধটুকুও আপনার নেই?'

'উপদেশ দেবেন না, আমার গা জ্বালা করে,' বলল রিমরিগো, তার হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। 'অনেক কিছুই আমার চোখে ধরা পড়ছে, কাজেই সাবধান করে দিলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, এর আগেও তাকে দেখে অনেকেই পাগলা কুকুর হয়ে উঠেছে—তাদেরকে আমি ছাড়িনি, উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি।'

'আপনি নেহাতই একটা ছোটলোক,' বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

'নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না,' পিছন থেকে হিসহিস করে বলল রিমরিগো।

দাঁড়াল রানা। ঘুরল আবার। রিমরিগোকে দেখে মনে হলো নিতম্ব থেকে ম্যাচেটিটা হাতে নিতে যাচ্ছে। এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, শিসের মত লাগল বাতাস বেরুবার আওয়াজটাকে। 'মানে?'

'মানে, মারিয়ার কাছ থেকে দূরে সরে থাকুন, তা না হলে···' কথা শেষ না করে রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রিমরিগো।

কামরার ভেতর মিনিট পাঁচেক পায়চারি করল রানা, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল কেউ নেই। রিমরিগোর কুঁড়ের সামনে এসে নক করল ও। প্রথমে কেউ সাড়া দিল না। আবার নক করতে মারিয়ার গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আর কেউ থাকলে তো। আমি রানা।'

'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।'

'বলতে হবেও না। শুধু শুনলেই চলবে। দরজাটা খুলুন।'

কয়েক মুহূর্ত পর ক্লিক করে শব্দ হলো, দরজা খুলে কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করল মারিয়া। চেহারাই বলে দেয়, অসুস্থ সে। অসুস্থ না বলে আহত বলাই উচিত। চোখের নিচে কালি পড়েছে, মুখে আঁচড়ানোর সরু দাগ। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে কবাট দুটো আরও ফাঁক করল রানা। 'আপনি বলেছিলেন, স্বামীকে নাকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এবার বোধহয়

তার লাগাম টানার সময় হয়েছে। তার ধারণা আপনার সঙ্গে আমার একটা অ্যাফেয়ার চলছে।'

'জানি,' বেসুরো গলায় বলল মারিয়া।

'আইডিয়াটা তার মাথায় ঢোকাল কে? নারী চরিত্র বড়ই বিচিত্র। আপনি দায়ী নন তো?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন!' ফোঁস করে উঠল মারিয়া।

'পাঁচ মিনিট আগে রিমরিগো আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছেন,' বলল রানা।

আঁতকে উঠল মারিয়া। 'কোথায় সে?'

'প্রফেসরের সঙ্গে হেলিকপ্টারে। দেখুন, মারিয়া, আমি সত্যিসত্যি ভাবছি রিমরিগোকে অভিযান থেকে বাদ দেয়া উচিত।'

'ওহ্, নো!' তাড়াতাড়ি বলল মারিয়া। 'আপনি আমাদের এত বড় সর্বনাশ করতে পারেন না।'

'পারি, করবও, উনি যদি নিজেকে সামলে রাখতে না পারেন। এমন কি পাসকেলও তাকে শায়েস্তা করার কথা ভাবছেন। আপনি খুব ভাল করেই জানেন আমার অনুরোধেই রিমরিগোকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছিলেন বেলফোর্স। আমি শুধু একবার বললে হয়, আনন্দের সঙ্গে তাকে মেক্সিকো সিটিতে পাঠিয়ে দেবেন তিনি।'

খপ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলল মারিয়া। 'প্লীজ, রানা, প্লীজ। অন্তত আমার দিকে তাকিয়ে···ঠিক আছে, অন্তত এবারের মত আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।'

'ইংল্যান্ডে থাকতেই একবার বলেছি, অন্য কারও হয়ে আপনি ক্ষমা চাইতে পারেন না—এমনকি স্বামীর হয়েও না।' মারিয়ার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল দেখে গলার সুর একটু নরম করল রানা। 'ঠিক আছে, আপাতত প্রফেসরকে আমি কিছু বলছি না। তবে তাঁকে বলে দেবেন, আমার সঙ্গে যেন লাগতে না আসে।'

'বলব, কথা দিচ্ছি, বলব,' হাঁপাচ্ছে মারিয়া। 'ধন্যবাদ, রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মারিয়া, এরকম একটা গোঁয়ারকে আপনি সহ্য করেন কিভাবে?'

'সে আপনি বুঝবেন না,' ম্লান সুরে বলল মারিয়া।

'ভালবাসা?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নাকি মিসপ্লেইসড লয়ালটি? আমি যদি মেয়ে হতাম, আর কোন পুরুষ যদি আমার গায়ে হাত তুলত, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে চলে যেতাম আমি।'

মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল মারিয়ার। 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

মারিয়ার গলার আর মুখের দাগগুলোর দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'আপনি দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলেন, তাই না?'

'আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাবেন?' ফুঁসে উঠল মারিয়া, রানার মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

পাঁচ ঘণ্টা পর ফিরে এল হেলিকপ্টার। সাইটে কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রফেসর বেলফোর্সকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাল। ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষের জন্যে কুইনটানা রু আদর্শ জায়গা নয়। এমনকি আটাশ বছরের রানার জন্যেও নয়। মাত্র দু'দিন আগে একটা ম্যাচেটি নিয়ে ফাঁকা জায়গা থেকে বেরিয়ে মিনিট দশেক এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করেছিল ও, তাতেই পথ হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে বুদ্ধি করে একটা কম্পাস রেখেছিল আর গাছের গায়ে ম্যাচেটির আঁচড় কাটতে ভোলেনি বলে ক্যাম্পে ফিরে আসা সম্ভব হয়। তবে রানার মনে হলো, ক্লান্তির চেয়ে হতাশাই প্রফেসরকে বেশি কাবু করে ফেলছে। তাঁর অন্যমনস্ক হয়ে ওঠার মাত্রাও আগের চেয়ে বেড়েছে।

হাত-পায়ে আর গলায় আঁচড়ের প্রচুর দাগ নিয়ে ফিরে এলেন প্রফেসর। ফার্স্ট এইডের বাক্স খুলে তাঁর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাসকেল। প্রফেসর রানাকে জানালেন, রিমরিগোর অবস্থা নাকি তাঁর চেয়েও খারাপ।

সেদিন রাতে মারিয়ার সঙ্গে আরেক দফা ঝগড়া হলো রিমরিগোর। স্পষ্ট কিছু শোনা গেল না, তবে গভীর রাত পর্যন্ত রিমরিগোর চড়া গলা আর মারিয়ার প্রতিবাদী সুর কানে এল। এক সময় রানার সন্দেহ হতে লাগল, রিমরিগো না তার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ডুয়েল লড়ার আহ্বান জানায়।

এক সময় নিস্তব্ধ হয়ে গেল ক্যাম্প। মারিয়ার সম্ভবত মোক্ষম অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে—স্বামীকে ভয় দেখিয়ে বলেছে, রানা ইচ্ছে করলে অভিযান থেকে তাকে বাদ দিতে পারে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, ওয়াশওয়ানোক শহরটা খুঁজে পেতে হলে এখন থেকেই নিজের পিছনে কড়া নজর রাখতে হবে ওকে।

চারদিন পর জানা গেল আর মাত্র একটা সাইট পরীক্ষা করলেই প্রথম পর্যায়ের অনুসন্ধান শেষ হবে। চারটে সাইটে পনেরোটা সিনোট ছিল, তার মধ্যে চোদ্দটায় কিছু পাওয়া যায়নি। শেষটাতেও যদি কিছু পাওয়া না যায়, অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে আরও উনপঞ্চাশটা সাইট পরীক্ষা করতে হবে। গত কয়েকদিনের পরিশ্রমে রিমরিগো আর বেলফোর্সের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, দেখে মায়াও লাগল রানার, আবার হাসিও পেল। এ-ধরনের অভিযানে ওর অভিজ্ঞতা আছে, সাইটগুলো ওকে যেন পরীক্ষা করতে দেয়া হয়, কথাটা বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা কেউ গ্রাহ্য করেনি, এমনকি সঙ্গে নিতেও উৎসাহ দেখায়নি।

শেষ সাইটটা চেক করতে যাবার দিন সকালে মীটিঙে বসল ওরা। আলোচ্য সিনোট একটা রিজের নিচে, ঘন গাছপালায় ঢাকা, কাজেই পাসকেল ভয় পাচ্ছে তীব্র বাতাসের বিপরীতে জঙ্গলের মাথায় হেলিকপ্টার

স্থির রাখতে পারবে কিনা।। আরও বড় সমস্যা, আকাশ থেকে জঙ্গলের মাঝখানে এমন একটা ফাঁক দেখা যায় না যেটার ভেতর উইঞ্চের সাহায্যে লোককে নামানো সম্ভব। জঙ্গল শুধু গভীর নয়, সিনোটের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফটোগ্রাফের ওপর চোখ রেখে বেলফোর্স বললেন, 'আমার দেখা সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গল এটা। আকাশ থেকে নিচে নামা সম্ভব বলে মনে হয় না। তুমি কি বলো, ডিনো?'

'কেউ স্বেচ্ছাসেবক হলে তাকে আমি নামিয়ে দিতে পারব,' বলল পাসকেল। 'তবে কোন সন্দেহ নেই তার ঘাড় ভাঙবে। গাছগুলো একশো চল্লিশ ফুট লম্বা, আর জটার মত পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জমিনে পৌঁছানো কারও পক্ষে সম্ভব বলে মনে করি না।'

'অসূর্যম্পশ্যা আদিম বনভূমি,' মন্তব্য করল রানা।

'না,' প্রফেসর বললেন। 'সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যেত। এক সময় গোটা কুইনটানা রুতে চাষ-বাস হয়েছে। এই জঙ্গল দ্বিতীয় দফায় জন্মেছে, সেজন্যেই এত ঘন।' প্রজেক্টরের সুইচ অফ করে দিয়ে ফটো-মোজাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'সিনোটের চারধারের জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত অস্বাভাবিক ঘন, আর্কিওলজির দৃষ্টিতে খুবই সম্ভাবনাময় একটা সাইট।' ফটোর এক জায়গায় আঙুল রাখলেন। 'এখানটায় তুমি আমাদের কাউকে নামাতে পারবে, ডিনো?'

জায়গাটা প্রথমে খালি চোখে, তারপর ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখল পাসকেল। 'বোধহয় পারব,' বলল সে।

হাতে রুলার নিলেন বেলফোর্স। 'সিনোট থেকে তিন মাইল দূরে। ওখান থেকে ঘণ্টায় আধ মাইল এগোনো সম্ভব, তার বেশি নয়। ধরা যাক পুরো একটা দিন লেগে যাবে সিনোটে পৌঁছুতে।'

'রানা তো খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন,' বলল রিমরিগো। 'দেখা যাক, এখন উনি কি বলেন। কি, ম্যাচেটি ব্যবহার করতে জানেন?'

কথা না বলে ফটোগুলো খুঁটিয়ে দেখল রানা। বিশেষ করে একটা ফটোয় সিনোট আর আশপাশের জঙ্গল খুব পরিষ্কার ধরা পড়েছে। রিমরিগোর দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'ম্যাচেটি ব্যবহার করতে জানি, তবে ওটা ব্যবহার করে বোকাদের দলে নাম লেখাতে চাই না,' বলল ও, তাকাল পাসকেলের দিকে। 'আপনি হেলিকপ্টারকে পানির ওপর স্থির রাখতে পারবেন না?'

'তা হয়তো পারব,' বলল পাসকেল। 'তবে বেশিক্ষণ নয়। পুলের পিছনে পাহাড়ের গা, একদম কাছে।'

প্রফেসরের দিকে ফিরল রানা। 'এখানকার ফাঁকা জায়গাটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে?'

'পাওয়ার স আর ফ্লেম-থ্রোয়ার সহ একটা টীমকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দিই,' বেলফোর্স জবাব দিলেন। 'ঝোপ-ঝাড় পুড়িয়ে ফেলে তারা, গাছগুলো কেটে ফেলে—তারপর গুঁড়িগুলো জেলিগনাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।'

আবার ফটোর দিকে তাকিয়ে সিনোটের কিনারা থেকে পানির লেভেল আন্দাজ করল রানা—ত্রিশ ফুট। 'পাসকেল যদি আমাকে পানিতে নামাতে পারে, সাঁতরে কিনারায় উঠতে পারব আমি।'

'তাতে লাভ কি?' জানতে চাইল রিমরিগো। 'তারপর আপনি কি করবেন? আঙুল চুষবেন?'

রাগ চেপে হাসছে রানা। 'তারপর পাসকেল আবার ওখানে পৌঁছুবে, উইঞ্চের সাহায্যে চেইন স আর ফ্লেইম-থ্রোয়ার নামাবে।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল পাসকেল। 'আপনার কাছাকাছি কোথাও ওগুলো নামানো সম্ভব হবে না। সিনোটের কিনারায় গাছগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। জেসাস, উইঞ্চের কেবল ওগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে গেলে হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করবে।'

'এরও সমাধান আছে,' বলল রানা। ধরুন আমি যখন পানিতে নামব, উইঞ্চ কেবলের শেষ প্রান্তে ঝুলবে একটা নাইলন কর্ড, দুশো গজ লম্বা। আমি ওটা নিয়েই সিনোটের কিনারায় পৌঁছুব। এতে করে জঙ্গলের মাথা থেকে নিরাপদ দূরত্বে হেলিকপ্টার স্থির রাখতে পারবেন আপনি। সিনোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে নাইলন কর্ড টানব আমি, উইঞ্চ কেবল আর তার সঙ্গে আটকানো কার্গো আমার নাগালে চলে আসবে।'

রানার দিকে এমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল পাসকেল, মাথা ঝাঁকাবার কথা ভুলে গেল। প্রফেসর ধমক দিতে তার সংবিৎ ফিরল। মাথা ঝাঁকিয়ে পাইলট বলল, 'সম্ভব। পারব।'

রানার দিকে তাকালেন বেলফোর্স। 'তারপর? তারপর আপনি কি করবেন?'

'পাসকেল আমাকে বলুন কপ্টার নামানোর জন্যে কতটুকু জায়গা তার দরকার, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি সেটুকু আমি পরিষ্কার করে রাখব। কিছু গুঁড়ি হয়তো থেকে যাবে, তাতে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাতে কোন সমস্যা হবে না। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া না গেলে আমিই কাজটা করতে চাই। আপনি কিছু বলবেন, রিমরিগো?'

'ইয়ে···মানে, না,' তাড়াতাড়ি বলল রিমরিগো। এই প্রথম তাকে লজ্জা পেতে দেখল রানা। 'আমি সাঁতার জানি না।'

ছয়

ইকুইপমেন্টগুলো অত্যন্ত ভারী, কাজেই হেলিকপ্টারে মাত্র দু'জন প্যাসেঞ্জার উঠতে পারবে। উইঞ্চে গিয়ার আটকানো, তারপর হেলিকপ্টার থেকে কার্গো বের করা, শুধু একজন শক্ত-সমর্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব। বেলফোর্স বললেন, রানার সঙ্গে রিমরিগো যাবে।

রানা খুশি হতে পারল না। পাসকেলকে একপাশে ডেকে বলল, 'সিনোটের মাথার ওপর হেলিকপ্টার সামলাতে ব্যস্ত থাকবেন আপনি, জানি; তবু এই উপকারটা আমার করবেন—একটা চোখ রাখবেন রিমরিগোর ওপর।'

'আপনার কোন চিন্তা নেই, উইঞ্চ তো আমি অপারেট করব,' আশ্বাস দিল পাসকেল।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পরই সাইটে পৌঁছে গেল হেলিকপ্টার। হাতটা রানা বৃত্তাকারে ঘোরাল, ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সিনোটের চারধারে চক্কর দিল পাসকেল। হেলিকপ্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে রানা। ফটোগ্রাফ আর বাস্তব জমিনের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

এক সময় সন্তুষ্ট বোধ করল রানা, পানিতে নামার পর সাঁতরে ঠিক কোথায় উঠবে ঠিক করে ফেলেছে। গোটা অপারেশনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব নাইলন কর্ডটার, সেটা ভালভাবে চেক করে নিল ও। তারপর কেবলের ক্যানভাস লূপে পা ফেলল। পাসকেল আরও নিচে নামাল হেলিকপ্টার, সাবধানে খোলা দরজা দিয়ে নিচে ঝুলে পড়ল রানা।

রানা নিচে নামছে কেবলের সঙ্গে পাক খেতে খেতে। যতবার পাক খেলো, সিনোটের পিছনে সবুজ পাহাড় ততই কাছে সরে আসছে। এত কাছে, এক সময় মনে হলো রোটরের ব্লেড প্রসারিত শাখাগুলো কেটে ফেলবে।

ইতিমধ্যে রানা হেলিকপ্টার থেকে অনেক নিচে নেমে এসেছে, উইঞ্চে আর কোন কেবল নেই যে ছাড়বে। পাক খাওয়ার গতি ক্রমশ কমে এল। চারপাশের গাছের ফাঁকে তৈরি চিমনির ভেতর হেলিকপ্টার নামাচ্ছে পাসকেল, রানার পা পানি স্পর্শ করল। কুইক-রিলিজ বাটনে ঝাপটা মারতে হারনেস খুলে গেল, সেই সঙ্গে সাঁতরাতে শুরু করল ও। নাইলন কর্ড ছাড়তে ছাড়তে পানি কেটে এগোচ্ছে। সিনোটের কিনারায় পৌঁছুল, পানির সঙ্গে একই লেভেলে কয়েকটা শিকড় দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল একটা।

সিনোটের গা যতটুকু আন্দাজ করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি খাড়া, পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা ঝোপে ঢাকা ত্রিশ ফুট উঠতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল, মনে হলো সারাটা দিন লেগে যাচ্ছে। কাঁটাঝোপে হাত আর বুকের চামড়া ক্ষতবিক্ষত হলো, তবু কর্ডটা রানা মুহূর্তের জন্যে ছাড়ল না। সিনোটের ওপর উঠে হাত নাড়ল ও। ধীরে ধীরে হেলিকপ্টারকে ওপরে তুলে নিচ্ছে পাসকেল, সেই সঙ্গে উইঞ্চ ঘুরিয়ে টেনে নিচ্ছে কেবল, রানাও ঢিল দিচ্ছে কর্ডে। নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছে গেল কপ্টার, তির্যক একটা ভঙ্গিতে পাঁচশো ফুট কর্ড ঝুলে থাকল। কপ্টারে বসে উইঞ্চ কেবলের শেষ মাথায় কার্গো আটকাচ্ছে রিমরিগো, এই সুযোগে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে রানা।

একশো পাউন্ড ইকুইপমেন্ট একপাশে ষাট ফুট টেনে আনা সহজ কাজ নয়। কোমরে জড়ানো ছিল একটা ক্যানভাস বেল্ট, সেটা খুলে তরুণ একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল রানা, ওটার সঙ্গে একটা হুক আর কুইক রিলিজ বাটন

আছে, ইমার্জেন্সির সময় কাজে লাগবে। গায়ে গায়ে লেগে আছে গাছপালা, সিনোটের কিনারায় নড়াচড়ার জায়গা বলতে কিছুই নেই। একটা গাছ, নব্বুই ফুট লম্বা, সেটার শিকড় সিনোটের ঠোঁটে বেরিয়ে আছে। ম্যাচেটি হাতে নিয়ে প্রথমে ওই শিকড় কাটতে শুরু করল রানা, নড়াচড়ার জন্যে জায়গা বের করছে।

এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। এটা আসলে একটা সঙ্কেত। মানে হলো, অপারেশনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে তৈরি পাসকেল। হেলিকপ্টার আবার ধীরে ধীরে নিচে নামছে, যতটা পারা যায়। উইঞ্চ কেবলের নিচের মাথায় ঝুলছে ভারী কার্গো। দ্রুত হাত চালিয়ে কর্ড টানছে রানা। এক সময় উইঞ্চ কেবলে আটকানো কার্গো ওর সঙ্গে একই লেভেলে চলে এল। তবে ওর কাছ থেকে ষাট ফুট দূরে, আর সিনোটের পানি থেকে ত্রিশ ফুট ওপরে।

কর্ডটা একটা গাছে তিনবার প্যাঁচাল রানা, তারপর টানতে শুরু করল। প্রথম দিকে কাজটা সহজই মনে হলো, টানের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কার্গো। তারপর মনে হলো, রানা যত জোরে টানছে, তারচেয়ে বেশি জোরে টানছে বোঝাটা। হেলিকপ্টার নিয়ে আরও একটু নিচে নামল পাসকেল। টানার পরিশ্রম সামান্য একটু কমল, কিন্তু তারপর মনে হলো পিঠ ভেঙে যাবে। একবার বিপজ্জনকভাবে দোল খেতে শুরু করল হেলিকপ্টার, তীব্র বাতাস মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিল। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল পাসকেল। আবার কর্ড টানছে রানা, পিঠ আর বাহুর সবগুলো পেশী ফুলে উঠছে।

তারপর এক সময় সামনের দিকে ঝুঁকে উইঞ্চ কেবলের শেষ মাথার নাগাল পেয়ে গেল রানা, ক্যানভাস বেল্টের হুকটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। কুইক রিলিজ বাটনে ঝাপটা মারতেই ভারী বোঝাটা ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ তুলে কপ্টারের দিকে তাকাল রানা, তারপর ছেড়ে দিতেই সিনোটের ওপর দিয়ে উল্টোদিকে ছুটল কেবলটা। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল রানা, অপর পাড়ের গাছে ওটা না জড়িয়ে যায়। তবে না, এরইমধ্যে কেবল টেনে নিতে শুরু করেছে পাসকেল, হেলিকপ্টারও এক্সপ্রেস লিফটের মত দ্রুতবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওটা স্থির হলো ফাঁকা ও নিরাপদ আকাশে পৌঁছে, তারপর সিনোটকে ঘিরে তিনবার চক্কর দেয়ার পর দু'নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে সিনোটের কিনারায় দশ মিনিট বসে থাকল রানা। শরীরে এত ব্যথা, যেন একটা ভালুকের সঙ্গে কুস্তি লড়েছে। বিশ্রাম নেয়ার পর প্যাক খুলে গিয়ারগুলো বের করল, ব্যাগ থেকে নিয়ে শার্ট আর ট্রাউজার পরল, পায়ে গলাল গোড়ালি ঢাকা বুট। ফ্লেইম-প্রোয়ারে ফুয়েল কম, তাই প্রথমে ম্যাচেটি নিয়ে কাজ শুরু করল ও। ঝোপের পাতা আর শাখা কেটে সাফ করছে। কাটছে বটে, কিন্তু ফাঁকা জায়গা বের করতে পারছে না, কারণ আশপাশ থেকে পাতাবহুল শাখাগুলো সঙ্গে সঙ্গে দখল করে নিচ্ছে সদ্য কাটা ডালপালার স্থান। কথাটা ভেবে আশ্চর্যই হলো রানা, প্রফেসর কিভাবে

আশা করলেন প্রতি ঘণ্টায় আধ মাইল এগোনো যাবে? কাজ যে গতিতে এগোচ্ছে, এক ঘণ্টায় দুশো গজও এগোতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভাগ্য ভাল যে অত দূর এগোবার দরকার নেই, ওকে শুধু হেলিকপ্টার নামতে পারার মত ছোট্ট একটা জায়গা বের করতে হবে।

জমিনের দিকে ঝুঁকে মাটি কামড়ে থাকা ঝোপের শিকড় কাটছিল রানা, ম্যাচেটির ব্লেডে কি যেন একটা বাড়ি খেলো, বাহুর পেশী ঝাঁকি খেলো তাতে। ব্লেডটা চোখের সামনে তুলে দেখে ভোঁতা হয়ে গেছে খানিকটা অংশ। কি হতে পারে, কিসে লাগল? আবার ম্যাচেটি চালাল ও, এবার সাবধানে, শিকড় বাদ দিয়ে শুধু পাতা আর ডাল কাটছে। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল একটা মুখ। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চওড়া মুখ, ইন্ডিয়ান। নাকটা বিরাট। চোখ জোড়া সামান্য ট্যারা।

আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর একটা পিলার বেরুল মাটির নিচ থেকে, ওই পিলারে খোদাই করা রয়েছে একজন মানুষের প্রতিকৃতি, পরনে বেল্ট পরানো টিউনিক, জটিল পদ্ধতিতে জড়ানো পাগড়ী। পিলারের বাকি অংশে লতাপাতার নকশা আর বড় আকৃতির পোকা।

পিলারটার দিকে প্রায় মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। ওরা কি তাহলে সত্যি সত্যি ওয়াশওয়ানোক শহরটা খুঁজে পেয়েছে? আপনমনে মাথা নাড়ল রানা, নিশ্চিত হবার জন্যে এক্সপার্টদের মতামত দরকার। তবে পিলারটা পাওয়ায় ওর কাজ বেড়ে গেছে। হেলিকপ্টার নামানোর জন্যে অন্য জায়গা পরিষ্কার করতে হবে ওকে, আট ফুট লম্বা এই ট্যারাচোখো চরিত্রের ওপর পাসকেলকে নামতে দেয়া যায় না।

সিনোটের কিনারায় ফিরে এসে আরেক পাশের ঝোপ কাটছে রানা। ঝোপ সাফ করার পর মাটি খুঁড়ল খানিকটা, নিচে কোন পাথর বা পিলার নেই দেখে হাত চালাল দ্রুত। প্রথমে একটা পথ তৈরি করতে হবে, পথের শেষ মাথায় তৈরি করা হবে ফাঁকা জায়গাটুকু, হেলিকপ্টার নামানোর জন্যে। ফুয়েল শেষ হয়ে যাওয়ায় ফ্লেইম-থ্রোয়ার বেশিক্ষণ ব্যবহার করা গেল না। শেষ দিকে চেইন শ ব্যবহার করল রানা, গাছগুলোকে মাটির যত কাছাকাছি সম্ভব কাটছে।

কোন গাছই খুব একটা চওড়া নয়, বেশিরভাগই আড়াই ফুটী। তবে অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করছে। রানা কাঠুরে নয়, ফলে ভুল করছে—প্রথম গাছটা ওকে ধাক্কা দিয়ে সিনোটে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ভূপাতিত গাছটা পড়ল রানা যেদিকে চেয়েছিল তার উল্টোদিকে, ফলে সেটাকে টুকরো করে সরাতে গলদঘর্ম হতে হলো। তবে কাজটা শিখছে, সেই সঙ্গে ভুলের মাত্রা কমে আসছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ষোলোটা গাছ ফেলতে পারল।

চিকেন স্যান্ডউইচ আর বোতলের পানি খেয়ে স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকল রানা। শরীরে ব্যথা ও ক্লান্তি, তবু সহজে ঘুম আসতে চাইল না। অন্ধকারে চোখ খুলে বাদামী রঙের লোকটার কথা ভাবছে ও। পিলারে খোদাই করা ওই মানুষটা কি প্রাচীন ওয়াশওয়ানোক শহরের কেউ? ও কি সেই শহরের ধ্বংসাবশেষের

মাথায় শুয়ে আছে? তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

৫

সকালে ঘুম ভাঙল হেলিকপ্টারের শব্দে, চোখ মেলতেই রানা দেখল উইঞ্চ কেবলের শেষ মাথায় মাকড়সার মত একজন লোক ঝুলছে। ল্যান্ড করার মত জায়গা এখনও সাফ করা হয়নি, যতটুকু হয়েছে তাতে একজন লোককে অনায়াসে নামাতে পারবে পাসকেল। সিনোটের কিনারায় ভারী বস্তার মত পড়ল সে, হাত নেড়ে পাসকেলকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলল। দেখা গেল লোকটা আর কেউ নয়, রিমরিগো। আকাশের আরও ওপরে উঠে সিনোটকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল হেলিকপ্টার।

রানার কাছে চলে এল রিমরিগো, তারপর চারদিকে চোখ বুলাল। 'আপনার তো এই জায়গা পরিষ্কার করার কথা ছিল না,' বলল সে।

'সমস্যায় পড়ে জায়গা বদলাতে হয়েছে।'

হাসার সময় রিমরিগোর দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'খুব খাটনি গেছে, না?' গাছের তিনটে গুঁড়ির দিকে তাকাল সে। 'কাজটাও তো দেখছি নিখুঁত করতে পারেননি।'

'দক্ষ লোকদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল, চেষ্টা করে দেখুন পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারেন কিনা।'

দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল রিমরিগো, তবে রানার আহ্বানে সাড়া দিল না। কাঁধে ঝোলানো লম্বা বাক্সটা নামাল সে, তারপর একটা অ্যান্টেনা লম্বা করল। 'এক নম্বর ক্যাম্প থেকে একজোড়া ওয়াকি-টকি পাঠানো হয়েছে। পাসকেলের সঙ্গে কথা বলতে পারব। কাজটা শেষ করতে আর কি লাগবে আপনার?'

'স আর ফ্লেইমারের জন্যে ফুয়েল, গুঁড়ি ওড়াবার জন্যে ডিনামাইট।'

ওয়াকি-টকি অন করে পাসকেলের সঙ্গে কথা বলল রিমরিগো। ফাঁকা জায়গাটার সরাসরি ওপরে চলে এল হেলিকপ্টার, দুই ক্যান ভর্তি ফুয়েল নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল দু'নম্বর ক্যাম্পে। সময় নষ্ট না করে কাজে হাত দিল ওরা।

রিমরিগোর প্রশংসা করতে হয়, অক্লান্ত একটা দৈত্যের মত কাজ করে যাচ্ছে। চার হাতে কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। হেলিকপ্টার নিয়ে আবার ফিরে এল পাসকেল। প্রথমে এক বাক্স জেলিগনেট নামাল সে, তারপর প্রফেসর বেলফোর্সকে। প্রফেসর পকেট ভর্তি করে ডিটোনেটর নিয়ে এসেছেন, রিমরিগোর হাতে তুলে দিলেন। চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক, তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। 'আপনি তো দেখছি জাদুকর। জঙ্গলকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন।'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাব,' বলে তাঁকে সরু পথটায় নিয়ে এল রানা, কাল যেটা তৈরি করেছে ও। 'এখানে ট্যারা এক লোককে পেয়েছি। পিলারে খোদাই করা। ব্যাটা আমার কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

পিলারটা দেখামাত্র অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো প্রফেসরের। যেন বহু বছর পর

আপন সন্তানকে খুঁজে পেয়েছেন, পাথরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখ দুটো ছলছল করছে। 'ওল্ড এমপায়ার!' বলে ওটার গায়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।

'কি ওটা?'

'স্টীলি বা স্তম্ভ—মায়ান ডেইট স্টোন। এক কার্টুন মানে প্রায় বিশ বছর। প্রতি বিশ বছর পরপর মায়ারা একটা স্টীলি খাড়া করত, কাল বোঝাতে।' পথের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'আশপাশে এরকম আরও আছে। ওরা হয়তো সিনোটের চারধারে এগুলো দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করেছিল।' শার্টের আস্তিন গুটিয়ে পিলারটা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন তিনি।

রানা বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা আরও ঘনিষ্ঠ হন, আমি যাই রিমরিগোকে বিস্ফোরিত হতে সাহায্য করি।'

'ঠিক আছে,' অন্যমনস্কভাবে বললেন বেলফোর্স, তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'এটা মার্ভেলাস একটা আবিষ্কার, মি. রানা। শহরটার বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'শহর?' হাত তুলে চারদিকটা দেখাল রানা। 'এটা কি ওয়াশওয়ানোক?'

আবার পিলারের দিকে ফিরলেন বেলফোর্স। 'আমার কোন সন্দেহ নেই। এরকম জটিল স্টীলি শুধু শহরগুলোতেই পাবার কথা। হ্যাঁ, আমার ধারণা, উলমার শহরটা পেয়ে গেছি আমরা।'

সারাটা দিন পিলার ছেড়ে এক পা নড়লেন না বেলফোর্স। পাতার পর পাতা নোট করলেন আর স্কেচ আঁকলেন, দুপুরে খেতে পর্যন্ত রাজি হলেন না। বিকেলের দিকে তাঁকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে আনতে হলো হেলিকপ্টারে। ইতিমধ্যে ফাঁকা জায়গাটাকে বড় করা হয়েছে, হেলিকপ্টার নিয়ে নিচে নামতে পাসকেল কোন সমস্যায় পড়েনি।

সন্ধের আগেই দু'নম্বর ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। গরম পানিতে গোসল করার পর রানার ক্লান্ত শরীর আবার ঝরঝরে হয়ে গেল। হাতে গরম এক মগ কফি নিয়ে বড় কুঁড়েটায় চলে এল ও, প্রফেসর আর রিমরিগো ক্যাম্পে ফিরেই ওখানে বসে আবার তর্কযুদ্ধে মেতে উঠেছে। ভেতরে ঢুকে ওদের কথা কিছুক্ষণ শুনল রানা, তারপর বলল, 'আপনাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আরও সহজ ভাষায় বলা যায় না?'

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন বেলফোর্স। নিজের তৈরি স্কেচগুলো রিমরিগোর নাকের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। 'অবশ্যই ওল্ড এমপায়ার!' চিৎকার করছেন, গলার রগ ফুলে উঠল। 'গ্লাইপস দেখো!' রানার কথা তিনি যেন শুনতেই পাননি।

'রহস্যটা আমাকেও বুঝতে দিন,' আবার বলল রানা।

'বুঝিয়েই তো বলছি!' রানার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন প্রফেসর।

'ইংরেজিতে বলুন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন বেলফোর্স। 'মায়াদের

ক্যালেন্ডার ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক সময় দরকার, অত সময় আমার নেই। কাজেই আমি যা সত্য বা প্রমাণিত বলে দাবি করব আপনাকে তাই মেনে নিতে হবে। এগুলো দেখুন,' বলে স্কেচের পাশে আঁকা কয়েকটা জিনিসের দিকে আঙুল তাক করলেন, ওগুলোকে পোকা বলে মনে হলো রানার। 'এগুলো তারিখ, মি. রানা। পড়ছি— "নাইন সাইকেলস, টুয়েলভ কার্টুনস, টেন কিনস্, ফর এব, টেন অ্যাশ"। সব যোগ করলে পাচ্ছি, তেরো লাখ ছিয়াশি হাজার একশো বারো দিন, অথবা তিন হাজার সাতশো সাতানব্বুই বছর। যেহেতু মায়াদের সাল শুরু হয়েছিল যীশুর জন্মের তিন হাজার একশো তেরো বছর আগে, কাজেই তারিখটা হবে ছয়শো চুরাশি খ্রিস্টাব্দ।'

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন ওয়াশওয়ানোক শহরটা প্রায় তেরোশো বছরের পুরানো?'

'স্টীলিটা তাই,' জোর দিয়ে বললেন প্রফেসর। 'তবে শহরটা সম্ভবত আরও প্রাচীন।'

'কিন্তু উলমা দে পেলায়েজ তো মাত্র চারশো বছর আগে ওয়াশওয়ানোক শহরে বন্দী ছিলেন।'

'আপনি ওল্ড এমপায়ার আর নিউ এমপায়ারকে এক করে ফেলছেন,' বেলফোর্স বললেন। 'ওল্ড এমপায়ার আটশো খ্রিস্টাব্দের দিকে ধ্বংস হয়ে যায়। শহরগুলোয় তখন কেউ ছিল না, খালি পড়ে ছিল। এক কি দেড়শো বছর পর টোলটেক বা ইটজারা আসে, চিচেন ইটজার মত কিছু শহরে আবার বসবাস শুরু করে মানুষ। ওয়াশওয়ানোক সেগুলোরই একটা হবার খুবই সম্ভাবনা।' নার্ভাস, কাঁপা কাঁপা হাসি ঠোঁটে।

রিমরিগো বলল, 'এটা আর্কিওলজির ক্লাস নয়, আমরা কাউকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব নিইনি। আমি জানতে চাই আমরা কাজ শুরু করব কখন থেকে?'

'কাজ শুরু করার আগে বিরাট প্রস্তুতি দরকার,' বললেন বেলফোর্স। 'প্রচুর লোক লাগবে জায়গাটা পরিষ্কার করতে। আর্কিওলজিকাল ইকুইপমেন্ট দরকার। দু'নম্বর ক্যাম্প ছেড়ে দেব আমরা, ফিরে যাব এক নম্বরে। পাসকেলকে দায়িত্ব দেব সাইটের কাছে তিন নম্বর ক্যাম্প তৈরি করার। ওখানে এখন হেলিকপ্টার নামতে পারবে, কাজেই কাজটা খুব কঠিন হবে না। বিশজন লোক থাকার মত ঘর তৈরি করতে হবে। সব গুছিয়ে নিতে অন্তত পনেরো দিন তো লাগবেই।'

'কি বলছেন আপনি! পনেরো দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমি?' হাঁ হয়ে গেল রিমরিগো। 'আপনার নিশ্চয়ই মাথাখারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে ভোলেন কি করে যে বর্ষা শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।'

'সব কিছু নিয়ম মাফিক হওয়া চাই,' বললেন প্রফেসর। 'মাটি খুঁড়ে একটা প্রাচীন শহর বের করা সহজ কাজ নয়, তাড়াহুড়ো করলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'আপনি আপনার নিয়ম নিয়ে থাকুন,' রাগে চেঁচিয়ে উঠল রিমরিগো।

'আমি ওখানে একাই কাজ শুরু করব, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'আলফাঁসো,' শান্ত ও ঠাণ্ডা সুরে বললেন প্রফেসর, 'ওখানে একা কাউকে আমি যেতে দেব না।'

'বুঝেছি! বুঝেছি!' অকস্মাৎ আক্রোশে কাঁপতে শুরু করল রিমরিগো। ঝট করে মারিয়ার দিকে তাকাল সে। 'রানা তোমাকে সম্মোহিত করে রেখেছেন, মারিয়া। এখন প্রমাণ পাচ্ছ তো, বুড়ো শয়তান আবিষ্কারের কৃতিত্বটা একা নিতে চাইছেন। গবেষণা-পত্র নিজে লিখবেন, তাতে আমার অবদান সম্পর্কে কিছুই থাকবে না।'

'গবেষণা-পত্র বা কৃতিত্ব সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই,' প্রফেসর গম্ভীর সুরে বললেন। 'আমি শুধু চাই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা হোক। কাফন চোরেরা যে পদ্ধতিতে কবর খোঁড়ে, সেই পদ্ধতিতে তুমি একটা প্রাচীন শহর খুঁড়তে পারো না।'

'বুড়ো শয়তান আমাকে বোকা ভেবেছে!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রিমরিগো। 'এ আমি সহ্য করব না! শালা আমাকে···'

'এই যে, মুখ সামলে কথা বলুন,' কঠিন সুরে ধমক দিতে বাধ্য হলো রানা। 'বেলফোর্স আপনার শিক্ষক ছিলেন, তাঁকে এভাবে গালিগালাজ করতে আপনার রুচিতে বাধছে না?'

'আপনি নাক গলাবার কে?' মারমুখো হয়ে বলল রিমরিগো। 'আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন।'

'ষড়যন্ত্রের এখনও কিছু দেখেননি,' বলল রানা। 'আমার অনুরোধে প্রফেসর আপনাকে দলে নিতে রাজি হন, এখন আমি যদি আপনাকে ফেরত পাঠাতে বলি, উনি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।'

রানার দিকে ছুটল রিমরিগো, তবে সময়মত তার হাত চেপে ধরল মারিয়া। ঝাপটা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রিমরিগো, ঝড়ের বেগে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ম্লান সুরে মারিয়া বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'তুমি তো কোন দোষ করোনি,' বললেন প্রফেসর। রানার দিকে ফিরলেন। 'সেটাই বোধহয় উচিত হবে—আলফাঁসোকে আমরা মেক্সিকো সিটিতে ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'মারিয়ার মুখ চেয়ে তাকে আমরা শেষ একটা সুযোগ দিতে পারি,' বলল ও। 'মারিয়া, ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করে। রিমরিগো তার আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইলে ভাল, তা না হলে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে। বুঝতে পারছেন তো?'

মাথা নিচু করে ফিসফিস করল মারিয়া, 'পারছি।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

পরদিন খুব ভোরে এক নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। স্ত্রীর সঙ্গে

প্রায় সারারাত ঝগড়া করলেও, তাতে মারিয়াই জিতেছে বলে ধরে নিতে হয়, কারণ ভোরে প্রফেসরের কাছে ক্ষমা চাইল সে। ক্ষমা চাওয়ার সময় খুবই আড়ষ্ট আর অসন্তুষ্ট দেখাল তাকে, শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল। প্রফেসর অবশ্য ভদ্রতা দেখিয়ে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তাকে। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা ভুলে গেছি।'

ওদের অনুপস্থিতিতে এক নম্বর ক্যাম্প আকারে বড় করা হয়েছে। বিগ কার্লকে খুব অস্থির দেখাল, কারণটা জানতে চাইলে বলল, 'চিকেলেরোরা জীবন নরক করে তুলেছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।'

'গার্ডরা কি করছে?'

'ধরতে গেলেই গুলি করছে চিকেলেরোরা,' জবাব দিল কার্ল। 'গার্ডরা বলছে এখানে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে জানলে আসতই না।'

'ববের সঙ্গে যোগাযোগ করো,' নির্দেশ দিলেন বেলফোর্স। 'বলো অস্ত্রসহ একদল সিকিউরিটি গার্ডকে পাঠিয়ে দিক।'

'বব চ্যাপেল তো আজ বা আগামীকাল আসছেনই,' বলল কার্ল।

আর ঠিক তখনই আকাশ থেকে ভেসে এল যান্ত্রিক গুঞ্জন। 'প্লেনের শব্দ,' বলল রানা। 'সম্ভবত ববই আসছে।'

কান পেতে আওয়াজটা শুনল কার্ল, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, বব চ্যাপেল নন। এই প্লেনটা সাত দিন ধরে উপকূল চষে বেড়াচ্ছে।' হাত তুলল সে। 'ওই দেখুন।'

সাগরের মাথায় উদয় হলো ছোট একটা টুইন-এঞ্জিন প্লেন, বৃত্ত তৈরি করে এয়ারস্ট্রিপের দিকে এগোচ্ছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। আবার বাঁক নিয়ে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে, বেলফোর্স জানতে চাইলেন, 'কারা ওরা?'

'কি জানি। তবে এখুনি জানা যাবে। ওরা বোধহয় ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।'

আবার বৃত্ত তৈরি করে এয়ারস্ট্রিপের দিকে ছুটে এল প্লেনটা। কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে নিরাপদেই ল্যান্ড করল। প্লেন স্থির হতে নিচে নামল একজন প্যাসেঞ্জার। দৃঢ় ও কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ওদের দিকে হেঁটে আসছে। সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট, ভাঁজগুলো তীক্ষ্ণ। কাছে এসে মাথা থেকে পানামা হ্যাটটা খুলল। 'প্রফেসর বেলফোর্স?' জিজ্ঞেস করল সে।

সামনে বাড়লেন প্রফেসর। 'আমি বেলফোর্স।'

প্রবল উৎসাহে প্রফেসরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল লোকটা। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি, প্রফেসর। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। আমার নাম হেনেস—রয় হেনেস।'

প্লেন থেকে আরও পাঁচজন প্যাসেঞ্জার নামল, সবার পরনে ছাই রঙের ইউনিফর্ম, হাতে অটোমেটিক রাইফেল আর কোমরে আটকানো হোলস্টারে রিভলভার। তবে প্লেনের কাছাকাছি থাকল তারা. দূর থেকে নজর রাখছে

মনিবের দিকে।

ডায়নামো ডিকানডিয়া ওরফে রয় হেনেসের বয়স হবে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। আচরণে সিল্কের মত পিচ্ছিল একটা ভাব, রাজনীতিকদের অনুকরণে কথা বলে অনর্গল, কিন্তু তাতে বক্তব্য বলে কিছু থাকে না। সে বলতে চাইল, তার দীর্ঘদিনের সাধ প্রফেসরের সঙ্গে পরিচিত হবে। এবারে তার মেক্সিকোয় আগমনের উপলক্ষ্য হলো ল্যাটিন আমেরিকান স্পোর্টস। এই সুযোগে ইউকাটান সফর করছে। এরইমধ্যে প্রাচীন মায়ান শহর আক্সমাল, চিচেন ইটজা আর কোবা দেখা শেষ করেছে। তারপর যখন শুনল বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর বেলফোর্স এদিকে কাজ করছেন, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না, খেলাধুলো ফেলে ছুটে এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় জানাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার হৃদ্যতা আছে। দেখা গেল, তার ঘনিষ্ঠ অনেক লোকের সঙ্গে প্রফেসরেরও বন্ধুত্ব আছে। কথা বলা যে একটা আর্ট, রয় হেনেস সেটা প্রমাণ করে ছাড়ল। সে বা তার ভাড়া করা খুনীরা যে বয়কটকে খুন করেছে, কথাটা প্রফেসর বেলফোর্স সম্ভবত ভুলেই গেলেন। হেনেসকে তিনি লাঞ্চ খেয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

রানা ভোলেনি, তবে চিন্তায় পড়ে গেল। হেনেস মাফিয়া ডন, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়েই ওদের ক্যাম্পে ল্যান্ড করেছে সে। ক্যাম্পে যারা রয়েছে, রানা ছাড়া কেউই অস্ত্র চালাতে তেমন একটা দক্ষ নয়। ওদের সঙ্গে তেমন কোন অস্ত্রও নেই। রানা সিদ্ধান্ত নিল, হেনেসকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করাটা বোকামি হয়ে যাবে। দুই পক্ষই এই এলাকায় বেশ কিছুদিন থাকবে ওরা, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। আরও অনুকূল পরিস্থিতির জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। তবু খেতে বসে হেনেসকে জেরা করতে ছাড়ল না। 'মি. হেনেস, আপনি মাফিয়া ডন বলেই সম্ভবত আমাকে চিনেও না চেনার ভান করছেন। ডিকানডিয়া চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস আমার মুখস্থ। নিউ ইয়র্কের যে বন্ধুকযুদ্ধে আপনার দুই ভাই খুন হয়, এফবিআই এজেন্টদের সঙ্গে আমিও একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে ওই যুদ্ধে ছিলাম। কি, মনে পড়ে?'

হেসে উঠল হেনেস। 'খেতে বসে এরকম তিক্ত একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন? এর মানে তো ঘটনাচক্রে আমি প্রতিপক্ষের মুখোমুখি বসেছি। এখন যদি সন্দেহ করি আমার হুইস্কিতে বিষ মেশানো আছে, সেটা কি অন্যায় হবে?' হাসিটা আরও চওড়া হলো মুখে। 'কিন্তু না, আমি এমনকি প্রতিপক্ষকেও একটা পর্যায় পর্যন্ত বিশ্বাস করি। এই দেখুন,' বলে হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন।

রানা বলল, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না।'

'আমাকে দেখে কি এতটা অধম মনে হয় যে মাসুদ রানাকে চিনব না?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেনেস। 'তবে, মি. রানা, সে তো প্রায় এক যুগ আগের

কথা। ডায়নামো ডিকানডিয়ার মৃত্যু হয়েছে। আপনি আমাকে নতুন মানুষটা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। রয় হেনেস সম্পর্কে।'

'মিক নোয়ামি রয় হেনেসের পোষা কসাই ছিল, অন্তত আন্ডারগ্রাউন্ডের সবাই তাই জানত,' বলল রানা। 'লন্ডনে সে মিগুয়েল বয়কটকে খুন করল। সে সময় আপনিও ওখানে ছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?'

'কেন, এ-ব্যাপারে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস যে তদন্ত করেছে, তার রিপোর্ট আপনি পাননি?' হাসতে হাসতেই জানতে চাইল হেনেস। 'ওই ঘটনার কয়েকদিন আগে রয় হেনেস নামে একজন আমেরিকান সাবজেক্ট ইংল্যান্ডে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরে জানা গেছে সে আমি নই, অন্য লোক। রয় হেনেস পেটেন্ট করা কোন নাম নয়, কাজেই আমি তার বিরুদ্ধে নাম নকল করার মামলা ঠুকতে পারছি না,' বলে হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রচুর খেলো হেনেস, কথাও বলল অনর্গল, তবে বেশিরভাগই রিমরিগোর সঙ্গে। বিদায় নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে, প্লেন পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিতে গেল রিমরিগো।

ওরা চলে যেতে বেলফোর্স বললেন, 'কিছুই বুঝলাম না। লোকটা নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কিন্তু কী সেটা?'

সাত

জেট নিয়ে বিকেলে পৌঁছুল চ্যাপেল। সরাসরি প্রফেসরকে রিপোর্ট করতে গেল সে, দশ মিনিট পর কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল মুখ কালো করে। 'স্যার, প্রফেসরের কি হয়েছে বলুন তো? এত সব তথ্য এনেছি, একটাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বললেন আপনাকে যেন রিপোর্ট করি।'

'সারা জীবনের সাধনা সফল হতে চলেছে, মাটি খুঁড়ে ওয়াশওয়ানোক বের করতে যাচ্ছেন, অন্য কোন দিকে তাঁর খেয়াল দেয়ার সময় কোথায়,' মন্তব্য করল রানা।

'উঁহুঁ, ব্যাপারটা তা নয়,' বলল চ্যাপেল। 'কি কারণে জানি না ওঁর মন খুব খারাপ মনে হলো।'

'মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত কত দুঃখই তো থাকে, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।'

'স্যার, আপনি কি জানেন, প্রফেসর তাঁর সমস্ত ব্যবসা ভাইকে দিয়ে এসেছেন? মানে, পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দিয়ে এসেছেন?'

'তাই নাকি?' মনে মনে অবাকই হলো রানা।

'এ-সব থাক,' বলল চ্যাপেল। 'যার খেত তার বুদ্ধি। ওদিকের খবর কিন্তু স্যার ভাল নয়।'

'কি রকম?'

চ্যাপেল রিপোর্ট করল, রয় হেনেস মেরিডায় আস্তানা গেড়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে নিজের লোকজনও আনিয়েছে সে, সবাই তারা কুখ্যাত গুণ্ডা বা খুনী। মেক্সিকো সিটির আন্ডারওয়ার্ল্ডেও গোপন মীটিং করছে সে। এমন কি লোক মারফত চিকেলেরোদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে দলবল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে। 'স্যার, জঙ্গলে ঢুকলে কোথায় সে যাবে বলে আপনার ধারণা?'

'তিন নম্বর ক্যাম্পে,' বলল রানা। 'ওয়াশওয়ানোকে।'

'স্যার, আপনি কিছু করতে পারেন না?'

'মেক্সিকো সিটির পুলিস বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি,' বলল রানা। 'ওদেরকে জানাতে পারি; মেরিডায় পরিচিত খুনীরা জড়ো হয়েছে। তাতে কাজ হবে বলে মনে করো তুমি?'

'না,' বলল চ্যাপেল। 'আমি খোঁজ নিয়েছি, পুলিস অফিসাররা হেনেসকে বরং সাহায্য করছে। মেক্সিকোর পুলিস দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস।'

'আমাকে তাহলে কি করতে বলো তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে প্রফেসরের,' বলল চ্যাপেল। 'তাদেরকে ধরলে কাজ হতে পারে।'

'আমরা কি জানি, মন্ত্রীদেরও হেনেস ঘুষ দেয়নি?'

'তাহলে, স্যার? ওরা আমাদেরকে খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে জেনেও আমরা চুপ করে বসে থাকব?'

'প্রফেসর তোমাকে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করতে বলেননি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু এখানে তারা আসবে পাহারা দিতে, যুদ্ধ করতে নয়। স্যার, হেনেসের সঙ্গে যুদ্ধটা আমি এড়াতে চাই।'

'তুমি সম্ভবত অহেতুক ভয় পাচ্ছ,' বলল রানা। 'ওয়াশওয়ানোকে আমরা হয়তো তেমন কিছুই পাব না। যুদ্ধটা বাধবে কি নিয়ে?'

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, স্যার,' বলল চ্যাপেল। 'হেনেস জানল কিভাবে কখন এখানে পৌঁছুতে হবে? আপনিও শহরটা খুঁজে পেলেন, সে-ও এসে হাজির হলো, ব্যাপারটা কি?'

'কোইন্সিডেন্স।'

'হেনেস কি কারও সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ পেয়েছে?' জানতে চাইল চ্যাপেল।

চিন্তা করল রানা। 'সব সময় আমাদের সঙ্গেই ছিল সে। একা তাকে কোথাও যেতে দেয়া হয়নি।'

'কারও সঙ্গেই নির্জনে কথা বলেনি? এক মিনিটের জন্যেও নয়?'

'না।' তারপর রানার মনে পড়ল। 'তবে বিদায় নেয়ার সময় রিমরিগো তাকে প্লেন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। বেশিক্ষণ না, এই ধরো বিশ সেকেন্ড একসঙ্গে ছিল ওরা।'

'সর্বনাশ! স্যার, আপনি হ্যান্ডশেকের সময়ও প্রচুর তথ্য পাচার করতে পারেন।'

চ্যাপেলের সন্দেহ হেসে উড়িয়ে দিল রানা। রিমরিগো বদরাগী ও সন্দেহপ্রবণ বটে, কিন্তু রয় হেনেসের মত কুখ্যাত ও বিপজ্জনক একজন লোকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

রয় হেনেস কি করছে জানার জন্যে সেদিনই আবার মেক্সিকো সিটিতে ফিরে গেল চ্যাপেল।

পরবর্তী কয়েকদিন হেলিকপ্টার নিয়ে খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হলো পাসকেলকে। বিগ কার্ল আর তার দু'জন সহকারীকে তিন নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে এল সে। তারা জঙ্গল কেটে ল্যান্ডিং এরিয়াটাকে বড় করল। তারপর বড় হেলিকপ্টারটা আসা-যাওয়া শুরু করল, ইকুইপমেন্টগুলো পৌঁছে দিচ্ছে।

আরও চারজন আর্কিওলজিস্ট পৌঁছুল। সবাই তরুণ, উৎসাহ-উদ্দীপনায় আক্ষরিক অর্থেই কাঁপছে। বড় কোন খনন অভিযানে তাদের তিনজনের এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রফেসর বেলফোর্সকে দেবতার মত ভক্তি করে। তবে রিমরিগোকে কি কারণে যেন সযত্নে এড়িয়ে থাকল তারা। রানা আন্দাজ করল, নিজের পেশায় কেউ যদি অসৎ হয়, সেটা বেশিদিন গোপন থাকে না।

প্রায় দু'হপ্তা পর তিন নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছুল রানা, সঙ্গে বাকি সবাইও রয়েছে। ওদের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার আগে সিনোটের ওপর বার কয়েক চক্কর দিল। কেবলের শেষ মাথায় ঝুলন্ত অবস্থায় এলাকার যে চেহারা রানা দেখেছিল, সেটা সম্পূর্ণই বদলে গেছে। নিচে এখন ছোট একটা গ্রাম। কুঁড়েগুলো এক লাইনে। এক পাশে হ্যাঙ্গার সহ ল্যান্ডিং এরিয়া, এয়ারক্রাফটের জন্যে। মাত্র দুই হপ্তায় জঙ্গলের এত বড় একটা অংশ কেটে সাফ করা রানার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য লাগল। বিগ কার্ল অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

ল্যান্ড করার পর পাওয়ার স-র যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেল রানা—জঙ্গল কাটার কাজ এখনও পুরোদমে চলছে। বড় একটা কুঁড়েতে ঢুকল ওরা, সময় নষ্ট না করে সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন প্রফেসর বেলফোর্স। প্রথমেই তিনি কার্লকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে দুই হপ্তা আছ, কি পেয়েছ বলো আমাকে।'

'খোদাই করা মুখ আর নকশা সহ আরও আটটা পিলার, স্যার,' জবাব দিল কার্ল। 'ওগুলোয় আমি হাত দিইনি, শুধু চারপাশ থেকে মাটি খুঁড়েছি।' দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপের সামনে দাঁড়াল সে। 'কোন্‌টা কোথায় পাওয়া গেছে ম্যাপে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।'

প্রফেসর পাঁচটা টীম গঠন করলেন, নেতৃত্বে থাকবে একজন করে আর্কিওলজিস্ট। প্রত্যেক টীমকে আলাদা এলাকা বরাদ্দ করা হলো। উলমা দে পেলায়েজের ম্যাপ নিজের হাতে এঁকেছেন তিনি. একটা করে কপি দেয়া হলো

টীম লীডারদের। সবশেষে রানাকে বললেন, 'মি. রানা, সিনোটটা আপনার।' হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। 'আমরা সারাদিন রোদে পুড়ব, আর আপনি মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াবেন।'

নিজের অজান্তেই রানার চোখ দুটো মারিয়াকে খুঁজে নিল। মারিয়াও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ মটকাল রানা, আর এমনই দুর্ভাগ্য, সেটা দেখেও ফেলল রিমরিগো। আক্রোশে মুঠো পাকাল সে, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। তারপর বেলফোর্সের দিকে ফিরে বলল, 'ড্রেজিং করা হলে সময় বাঁচবে—চিচেন ইটজায় থম্পসন তা-ই করেছিলেন।'

'সে বহু কাল আগের কথা,' হালকা সুরে বললেন বেলফোর্স। 'ড্রেজিং-এর সমস্যা হলো, পটারি নষ্ট করে ফেলে। আমরা অ্যাডভান্সড ডাইভিং টেকনিকের সুবিধে পাচ্ছি।'

যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে চুপ মেরে গেল রিমরিগো। মীটিং শেষ হতে নিজের কুঁড়েতে ফিরে এল রানা। বিছানা, বিছানার ওপর মশারি, টেবিল-চেয়ার, এয়ারকন্ডিশনার অর্ধেক জায়গা দখল করে রেখেছে, বাকি অর্ধেকে রাখা হয়েছে প্রয়োজনীয় ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। কার্লকে ডেকে এয়ার কমপ্রেসর আর বড় আকৃতির এয়ার বটলগুলো কুঁড়ের বাইরে সাজিয়ে রাখতে বলল রানা। তারপর তাকে নিয়ে সিনোট দেখতে এল।

সিনোটটা প্রায় বৃত্তাকার, ডায়ামিটারে একশো ফুটের কিছু বেশিই হবে। ওটার পিছনে রিজ, পাহাড়-প্রাচীরের মত খাড়াভাবে উঠে গেছে, তবে চূড়ার দিকটা তেমন খাড়া নয়। উলমা লিখেছেন, ওখানেই চ্যাচ মন্দির আছে। সিনোটে চোখ নামিয়ে রানা ভাবল কে জানে কতটা গভীর। 'আমার একটা ভেলা লাগবে, কার্ল,' বলল ও। 'লাইন ফেলে দেখতে হবে তল পাওয়া যায় কিনা। তবে সেটা পরে, তার আগে ডুব দিয়ে দেখব।'

'যখন যা লাগে আপনি শুধু হুকুম করবেন, মি. রানা।'

নিজের কুঁড়েতে ফিরে এসে রানা দেখল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মারিয়া। রানাকে দেখে বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'আমি রেডি।'

'এখুনি?'

কথা না বলে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল মারিয়া। 'দেখে তো এলেন, কতটা গভীর বলে মনে হলো?'

'ডুব দিলে বোঝা যাবে,' বলল রানা। 'এর আগে আপনি কত গভীরে নেমেছেন?'

'ষাট ফুট।'

সিনোটের কিনারায় পৌঁছে পরস্পরের গিয়ার চেক করল ওরা। কার্ল ওদের জন্যে ধাপ তৈরি করে রেখেছে, পানির কিনারায় নেমে আসতে কোন অসুবিধে হলো না। মাস্কটা ভিজিয়ে নিচ্ছে রানা, বলল, 'আপনি শুধু আমাকে অনুসরণ করবেন, আর আলোটা ভুলেও নেভাবেন না। যদি কোন বিপদে পড়েন আর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন, সারফেসে উঠে আসবেন—আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। তবে দশ ফুট পরপর কয়েক

মিনিট করে থামবেন। চিন্তার কিছু নেই, আপনাকে আমি চোখে চোখে রাখব।'

'বেশি চোখে চোখে রাখলে সমস্যা হতে পারে,' তিক্ত একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতুক করতে চাইছে মারিয়া। 'শুনলেন না, আলফাঁসো ড্রেজিং করতে চাইছিল। বোকার মত এখনও সে আমাদেরকে সন্দেহ করে। হাস্যকর, তাই না?'

'অবশ্যই,' বলল রানা।

হঠাৎ হেসে উঠল মারিয়া, তারপর দু'জনের শরীরে আটকানো ভারী গিয়ারগুলো ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'ঘাড়ে যদি ভূত চাপেও, সুযোগ পাওয়া যাবে না—ঠিক বলিনি?'

রানার মুখ গরম হয়ে উঠল। 'চলুন দেবতা চ্যাচ-এর সঙ্গে দেখা করে আসি,' বলে মাউথপীসটা কামড়ে ধরল।

পানিতে নেমে ধীরে ধীরে সিনোটের মাঝখানে চলে এল ওরা। পানি স্বচ্ছই, তবে গভীরতা খুব বেশি হওয়ায় গাঢ় দেখাচ্ছে। ডুব দিয়ে নিচে তাকাল রানা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পানির ওপর মাথা তুলে ইঙ্গিত করল মারিয়াকে। এবার সে-ও ডুব দিল, তাকে অনুসরণ করল ও। তার ঠিক আগের মুহূর্তে রিমরিগোকে দেখতে পেল রানা, সিনোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গভীরে নেমে এল ওরা। আলো কমতে কমতে একবারে নেই হয়ে গেল। পঞ্চাশ ফুট নেমে স্থির হলো রানা, তারপর বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল, কম্পাস কাজ করছে কিনা দেখে নিয়েছে আগেই। ওর পিছু নিয়ে ঘুরছে মারিয়া, অলস ভঙ্গিতে পানিতে নড়ছে তার ফ্লিপার দুটো, ল্যাম্পের আলোয় দেখা যাচ্ছে মাস্ক থেকে বুদ্বুদ বেরুচ্ছে। মারিয়ার কোন অসুবিধে হচ্ছে না বুঝতে পেরে আরও নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিল রানা। নামার সময় মাঝে মধ্যে মারিয়াকে দেখে নিচ্ছে।

তলার নাগাল পাওয়া গেল পঁয়ষট্টি ফুট নামার পর। তবে এটা একটা ঢালের চূড়া, ঢালটা বিশ ডিগ্রী ঢালু হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ঢালের চূড়ায় প্রচুর কাদা, মেঘের মত ঘিরে ফেলল ওদেরকে। মারিয়ার ল্যাম্পের আলো ঝাপসা লাগল চোখে। এতটা নিচে পানি অসম্ভব ঠাণ্ডা। মারিয়াকে ইঙ্গিত দিয়ে ঢাল ধরে নিচে নামছে রানা। ঢালের শেষ প্রান্তে নিরেট পাঁচিল এটাই সিনোটের প্রকৃত গভীরতা—পঁচানব্বুই ফুট। তলায় বেশ কিছুক্ষণ থাকল ওরা, ঢালের কিনারা পরীক্ষা করল। কিনারা ও পাঁচিল অত্যন্ত মসৃণ আর সমান, কোথাও কোন ফাটল বা ফাঁক নেই। তবে তরল আবর্জনা প্রচুর। কয়েকশো বছর ধরে গাছের পাতা পড়েছে সিনোটের পানিতে, সেগুলো পচে কাদা তৈরি করেছে। তলায় কিছু যদি পাবার মত থাকে, জমাট কাদা খুঁড়ে বের করতে হবে।

মারিয়াকে পিছনে নিয়ে উঠে আসছে রানা। উঠছে দেয়াল ঘেঁষে। তলা থেকে ত্রিশ ফুটের মত উঠেছে, হাতে একটা ফাঁকের কিনারা ঠেকল। খাড়া দেয়ালের গায়ে চওড়া একটা ফাটল বলে মনে হলো। পরীক্ষা করে দেখা

দরকার, তবে এখুনি কাজটা করতে মন চাইল না রানার—ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা হয়েছে ওর।

আধ ঘণ্টা ধরে প্রায় একশো ফুট পানির তলায় ছিল ওরা, কাজেই সারফেসে ওঠার সময় ডিকমপ্রেশনের প্রয়োজন হলো। সারফেস বিশ ফুট বাকি থাকতে পাঁচ মিনিট থামতে হলো, দশ ফুট বাকি থাকতে আরও পাঁচ মিনিট। সারফেসে মাথা তুলে মাউথপীস খুলল রানা, তারপর হারনেস। 'এরপর থারমাল স্যুট পরে নামতে হবে,' মারিয়াকে বলল। 'তা না হলে বরফ হয়ে যাব।'

'আর তলার কাদা সরাতে সাকশন পাম্প লাগবে,' বলল মারিয়া।

'গুড আইডিয়া,' সায় দিল রানা। 'পাম্পটা থাকবে সারফেসে, সমস্ত কাদা সিনোটের কিনারায় জমা করা হবে। পাম্পের পাইপে ফিল্টার থাকবে, ছোটখাট আর্টিফ্যাক্ট আটকাবে তাতে।'

'আমরা কি তাহলে আর সিনোটের তলায় নামব না?'

'নামব না মানে! নামব তো বটেই, এখন থেকে দু'ঘণ্টা করে নিচে থাকব। তবে সেক্ষেত্রে সারফেসে ওঠার সময়টা ডিকমপ্রেশনের জন্যে একশো পঁয়ত্রিশ মিনিট বেশি ধরতে হবে। সব মিলিয়ে পাঁচ জায়গায় পাঁচবার থামতে হবে। ভেলা থেকে একটা ওয়েটেড শট রোপ ঝুলিয়ে রাখব আমরা, সঙ্গে আরেকটা রোপ থাকবে বিভিন্ন লেভেলে স্লিঙ সহ। প্রতিটি স্লিঙে এয়ার বটল থাকবে, কারণ আপনার হারনেস বটলে যথেষ্ট এয়ার ধরে না। স্লিঙগুলো সহ রশিটা প্রতিদিন তুলতে হবে ভেলায়, বটল বদল করার জন্যে।'

মারিয়াকে কৌতূহলী দেখাল, চোখে দুষ্টামির একটু ঝিলিকও বোধহয় আছে। 'আমি কিন্তু এত গভীরে কখনও নামিনি, থাকিনিও বেশিক্ষণ। ডিকমপ্রেশনের ব্যাপারটা ভাল বুঝি না। আপনার হিসাব শুনে মনে হচ্ছে দশ ফুট নিচে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টা কি করব আমরা?'

'সঙ্গে স্লেট রাখলে ছড়া লিখতে পারেন,' হেসে উঠে বলল রানা। 'আর যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেই, আমি চাইব তখন যেন আমরা ভেলায় থাকি।'

হপ্তার পর হপ্তা পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন কোন দিন নেই যেদিন নতুন কোন আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এক নম্বর ক্যাম্পের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ আছে রানার, বব চ্যাপেল রিপোর্ট পাঠাল ওদিকের পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। রয় হেনেস মেক্সিকো সিটিতে ফিরে গেছে, খেলা দেখে আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছে। তবে তার গুণ্ডাবাহিনী মেরিডায় এখনও রয়ে গেছে।

শহরটা যে ওয়াশওয়ানোক, ইতিমধ্যে সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। আর্কিওলজিস্টদের টীমগুলো একের পর এক বিল্ডিং আবিষ্কার করছে—প্রাসাদ, মন্দির, খেলাধুলোর জন্যে অ্যারেনা। কিছু নির্মাণ ও স্থাপত্যকর্মের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল না। তার মধ্যে একটাকে জ্যামিতিক নকশায় তৈরি অবজারভেটরি বলে মনে হলো। সিনোটের চারধারে

পিলারের একটা বৃত্ত পাওয়া গেছে, সব মিলিয়ে চব্বিশটা। আরও এক সারি পিলার পাওয়া গেছে শহরের ঠিক মাঝখানে, এক লাইনে। আর্কিওলজি সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক কোন শিক্ষা না থাকলেও, অতীতে এ-ধরনের অভিযানে অংশগ্রহণ করায় রানার অভিজ্ঞতাও কম নয়, এটা ঘটনাচক্রে জানতে পেরে রীতিমত উল্লসিত হলেন প্রফেসর বেলফোর্স। রিমরিগোর আপত্তি কানে না তুলে আবিষ্কারগুলোর ফটো তোলার আর তালিকা তৈরি করার দায়িত্ব দিলেন তিনি রানাকে।

কাজের চাপে সবাই যখন প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ল, প্রফেসরকে বলে হপ্তায় একদিন ছুটির ব্যবস্থা করল রানা। এই রকম এক ছুটির দিনে রানাকে নতুন একটা সাইটে টেনে নিয়ে এলেন বেলফোর্স। নিচু একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন, 'ওটাই হলো কুলকুলকান মন্দির। নিচের দিকে তাকান, আমরা যেখানে ধাপগুলো বের করছি।'

'গোটা পাহাড়টাই?' রানা হতভম্ব।

'হ্যাঁ, পুরো পাহাড়টাই মন্দির। পাহাড়ের চারদিক থেকে ধাপগুলো ওপরে উঠে গেছে। এই যে পাদদেশ থেকে এতটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, এটাও মন্দিরের একটা অংশ—পাহাড়ের নিচে এটাও একটা প্ল্যাটফর্ম। এতই বড় যে সহজে বোঝা যায় না।'

'কত বড়?'

'থিয়োডোলাইট আর ট্রানজিট নিয়ে পরীক্ষা করেছে কার্ল।' হাসলেন বেলফোর্স। 'তার হিসেবে, পনেরো একর। একশো ত্রিশ ফুট উঁচু।'

পাহাড়ের আরও কাছে এসে মাটি খুঁড়ে বের করা ধাপগুলো দেখল ওরা। প্রতিটি ধাপ পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ওপরে কিছু পাব বলে আশা করেছিলাম, পেয়েওছি। আসুন দেখাই।'

ধাপগুলো খুব উঁচু, উঠতে গলদঘর্ম হতে হলো। ওঠার সময় হঠাৎ খেয়াল করল রানা, ওরা আসলে ধাপ বেয়ে একটা পিরামিডে উঠছে। চূড়ায় উঠে এসে প্রফেসর হাত তুলে দেখালেন, 'ধাপগুলো ওখানটায় শেষ হবে বলে ধারণা করি, তাই ওখানেই খুঁড়েছি।'

এগিয়ে এসে গর্তের ভেতর উঁকি দিল রানা। ভয়ালদর্শন একটা অবয়ব, মুখ খোলা, দাঁতগুলো ধারাল, রাগে খেঁকিয়ে ওঠার ভঙ্গি, ফলে ঠোঁট জোড়া ভেতর দিকে সেঁধিয়ে আছে।

'পালকের তৈরি সরীসৃপ,' ফিসফিস করলেন বেলফোর্স। 'কুলকুলকানের প্রতীক।' পিছন দিকের একটা মাটির দেয়াল দেখালেন রানাকে। 'ওদিকটা মন্দিরের প্রধান অংশ, যেখানে বলি দেয়া হত। আশা করি ছাদটা ধসে পড়েনি, অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারলে একটা কাজের কাজই হবে।'

গাছের একটা গুঁড়িতে বসল রানা, মাথা ঘুরিয়ে গোটা শহরের ওপর চোখ বুলাল। মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিষ্কার করা হয়েছে, তা-ও শুধু গাছপালা। মাটি ঢাকা আরও অনেক টিলা বা ছোট পাহাড় রয়েছে, খোঁড়ার কাজ এখনও শুরু করাই হয়নি। 'এত কাজ, কবে শেষ করবেন? কবে দেখতে

পাব শহরটা কেমন?'

'বিশ বছর পর ফিরে এলে,' জবাব দিলেন প্রফেসর, 'মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন।'

প্রফেসরের দিকে অবাক হয়ে তাকাল রানা। ভদ্রলোকের বয়েস ষাট, জানেন যে যে-কাজ তিনি শুরু করেছেন তা তাঁর জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারবেন না। অদ্ভুত একজন মানুষ, কোন সন্দেহ নেই। রিমরিগোর সঙ্গে কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বোধহয় রানার চিন্তাধারা ধরতে পেরেই প্রফেসর বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'মানুষের জীবন খুব ছোট, মি. রানা; কিন্তু তার কীর্তি জীবনের চেয়েও বড়। আমি কাজটা শুরু করলাম, কিন্তু শেষ করতে পারব না, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে রানা জানতে চাইল, 'রাজার প্রাসাদটা পাওয়া গেছে, প্রফেসর?'

হাসলেন বেলফোর্স। 'সোনার মেঝে আর দেয়ালের কথা ভোলেননি দেখছি।' উঁচু ছোট পাহাড় দেখালেন হাত তুলে। 'ওটাই সেই প্রাসাদ। পরে খোঁড়া হবে। আমাদের পরবর্তী কাজ গাছের গুঁড়ি উপড়ানো—এই যেমন এটা,' বলে রানা যেটায় বসে আছে সেটায় লাথি মারলেন।

'কিভাবে? ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবেন?'

'মাই গড, নো! শিকড় সহ পুড়িয়ে ফেলব সব।'

'উলমা দে পেলায়েজ যে বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন, সেটা কোথায়? সোনালি চিহ্ন?'

'না, এখনও সেটা পাইনি আমরা। পাইনি, হয়তো পাবও না। বারো বছর বন্দী থাকলে কারও যদি মতিভ্রম ঘটে, আপনি তাকে দোষ দিতে পারেন না। আমার সন্দেহ, উলমা ধর্মীয় উন্মাদনার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। হ্যালুসিনেশন—কিছুই ছিল না, অথচ দেখেছেন বলে মনে করেছেন।' পাইপ থেকে ছাই ঝাড়লেন বেলফোর্স। 'ভাল কথা, কার্ল আমাকে বলল যে জঙ্গলে একদল চিকলেরোকে দেখেছে। সবাইকে আপনি জানিয়ে দিন, ক্যাম্প ছেড়ে কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।'

কার্লের বানিয়ে দেয়া ভেলাটা রানার খুব উপকারে লাগল। প্রতিটি ডিকমপ্রেশন লেভেলে ছোট এয়ার বটল ঝুলিয়ে রাখার আইডিয়াটা বাতিল করে দিল ও, তার বদলে একটা পাইপ নামানো হলো, হারনেসের ডিমান্ড ভালভ-এর সঙ্গে সরাসরি প্লাগ দিয়ে আটকানো, ভেলায় রাখা এয়ার বটল থেকে খোরাক পাবে। সত্তর ফুট লেভেলে সিনোটের দেয়ালে যে ফাঁক বা গুহা পাওয়া গেছে, সেটা পরীক্ষা করল ও। ফাঁকটা বেশ চওড়া, আকৃতিতে উল্টো করা বস্তার মত। রানার মাথায় বুদ্ধি গজাল—পানি বের করে ভেতরে বাতাস ভরতে হবে। ভেলায় এয়ার পাম্প আছে, সেটা থেকে একটা হোস নামানো হলো। কাজটা শেষ হবার পর পানির এতটা নিচে মাস্ক খুলে শ্বাস নিতে পারায় বিচিত্র অনুভূতি

হলো রানার। অবশ্য এই গভীরতায় পানির আর বাতাসের প্রেশার সমান হওয়ায় ডিকমপ্রেশনের বেলায় কোন সুবিধে পাওয়া যাবে না। তবে সিনোটের তলায় ও বা মারিয়া যদি কোন বিপদে পড়ে, গুহাটায় সাময়িক আশ্রয় নিতে পারবে, পরিমিত বাতাসও পাওয়া যাবে। প্রবেশমুখে আর ভেতরে একটা করে ল্যাম্প রেখে এল রানা। গুহার পিছনে পাথরের দেয়াল লক্ষ্য করে মনে মনে অবাকই হলো রানা।

তারপর শুরু হলো সাকশন পাম্পের সাহায্যে সিনোটের তলা থেকে পলি আর কাদা সরানোর কাজ। কাজটা শেষ হতে প্রথমেই রানা একটা খুলি পেল। তারপর একে একে পেতে লাগল পিতল আর সোনার মুখোশ, পাত্র, ঘণ্টা, দেবী ও দেবতার মূর্তি, ব্রেসলেট, কানের আর আঙুলের রিঙ, মুক্তো লাগানো নেকলেস, নকশা খোদাই করা বোতাম। সোনার একটা চেইন পাওয়া গেল, ত্রিশ গজ লম্বা, সাত মণ ওজন। সোনার মুকুট পাওয়া গেল বাহান্নটা। পাথরের প্লেটও পাওয়া গেল, সব মিলিয়ে আঠারোটা। প্রফেসর বললেন, এরকম একটা প্লেট তাঁর মিউজিয়ামেও আছে।

সবাইকে উত্তেজিত করে তুলল ছোট্ট একটা সোনার স্ট্যাচু। মাত্র ছয় ইঞ্চি উঁচু, কিশোরী এক মায়ান মেয়ের মূর্তি। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেটা পরিষ্কার করলেন বেলফোর্স। সাবধানে রাখলেন ডেস্কের মাঝখানে। তারপর ডেস্কটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। 'সাবজেক্টটা মায়ান,' অবশেষে বললেন তিনি। 'কিন্তু কাজটা তাদের নয়—তাদের স্টাইলের সঙ্গে মিলছে না।'

ডেস্ক থেকে মূর্তিটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে মারিয়া। 'কি সুন্দর, তাই না?' ইতস্তত করছে সে। 'এটা কি উলমা দে পেলায়েজ যে কিশোরীর মূর্তি তৈরি করেছিলেন, তার হতে পারে? কিংবা রাজকুমারীর?'

'ঠিক আমি যা ভাবছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'তবে রাজকুমারীর হবার সম্ভাবনা কম···না, রাজকুমারীর হতেই পারে না। মন্দিরের ওই কিশোরী মেয়েটাকে, আমরা ধরে নিতে পারি, সিনোটে বলি দেয়া হয়েছিল। তাকে যদি বলি দেয়া হয়ে থাকে, স্বভাবতই তার নিজস্ব জিনিস-পত্র, অলঙ্কার ইত্যাদিও ফেলে দেয়া হয় সিনোটে। আমার ধারণা, যে কিশোরী মেয়েটা উলমা দে পেলায়েজের সেবা করত, এটা তারই মূর্তি। মায়ারা এভাবে ছাঁচ তৈরি করে মূর্তি বানাতে পারত না, উলমা তাদেরকে পরে শেখান। তারপর হয়তো মায়ারাও এরকম মূর্তি বানিয়েছে।'

শেলফে সাজানো চকচকে আর্টিফ্যাক্টগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'চেইনটা এখনও তোলা হয়নি, ওটার কথা বাদ দিন,' বলল ও। 'এখানে যা রয়েছে, খোলা বাজারে সেগুলোর দাম কত হতে পারে?'

'কে বিক্রি করছে? এখানে যা কিছু আমরা পাব, তার সবই মেক্সিকো সরকারের প্রাপ্য,' বললেন প্রফেসর।

'ফাইন্ডার'স ফি সম্পর্কে মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' বলল রানা। 'আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি যে ওরা আধাআধি বখরায়

রাজি হয়েছে।'

'চেইনটা বাদ দিয়ে, এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে,' বললেন প্রফেসর, 'একজন ডিলার বিশ থেকে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার দাম দিতে রাজি হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

রানার দম আটকে এল। শেলফে যা সাজানো হয়েছে তা শুধু সিনোট থেকে তোলা, তা-ও সিনোটটার মাত্র এক চতুর্থাংশ খোঁড়া হয়েছে। কাদা সরিয়ে প্রতিদিন যত গভীরে যাচ্ছে ওরা ততই নতুন নতুন আর্টিফ্যাক্ট বেরুচ্ছে। যা পাওয়া গেছে তারচেয়ে আরও দশ বা একশো গুণ বেশি আর্টিফ্যাক্ট পাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

খবরটা সবাইকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দিল—বর্ষা মরশুম শুরু হতে যাচ্ছে। বৃষ্টি একবার শুরু হলে সাইটে কাজ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রফেসর বেলফোর্স সিদ্ধান্ত নিলেন, আপাতত ওয়াশওয়ানোক ত্যাগ করতে হবে।

ভারী ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে, রেখে যাওয়া হবে শুধু ছোটখাট আর কম দামী জিনিস-পত্র। বড় হেলিকপ্টার আসা-যাওয়া শুরু করল। মাটি খোঁড়ার কাজে প্রচুর লোক লাগানো হয়েছিল, সবাইকে পৌঁছে দেয়া হলো এক নম্বর ক্যাম্পে, ওখান থেকে তাদেরকে মেক্সিকো সিটিতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তরুণ আর্কিওলজিস্টরা প্রফেসরের কাছে ছুটি চেয়ে নিলেন, যে-যার কর্মস্থলে ফিরে যাবেন তাঁরা, তবে আবার ডাক পেলেই চলে আসবেন। তাঁদেরকে বিদায় জানিয়ে বড় কুঁড়েটায় ঢুকলেন বেলফোর্স, আবার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। ক্যাম্প খালি করার ব্যস্ততা তাঁকে স্পর্শই করছে না, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে রানার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলে দিয়েছেন। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে কার্ল আর পাসকেল বার বার দেখে এল কি করছেন তিনি। সিনোট থেকে তুলে আনা প্রতিটি আর্টিফ্যাক্ট নিজের হাতে পরিষ্কার করছেন বেলফোর্স, প্রত্যেকটার বিশদ বিবরণ লিখছেন খাতায়। কাজ করার সময় ওরা নাকি তাঁকে নিঃশব্দে কাঁদতে আর চোখের পানি মুছতে দেখেছে।

স্বভাবতই রানা চিন্তিত হয়ে পড়ল। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকতে হলো ওকে। কাজ থেকে মুখ না তুলেই প্রফেসর বললেন, 'আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমি নড়ছি না। আমাকে একা থাকতে দিন—প্লীজ, প্লীজ।'

তারপর সবাই চলে যাবার সময় হলো। তিন কি চারটে কুঁড়ে ছাড়া সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জিনিস-পত্র আর লোকজন যা আছে, দুটো হেলিকপ্টারে জায়গা হয়ে যাবে। প্রফেসরের কুঁড়ের সামনে পায়চারি করছে রানা, শেষ একবার তাগাদা দেয়ার জন্যে আবার ওকে ভেতরে ঢুকতে হবে। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল কার্ল, 'স্যার, মি. রানা, রেডিও রুমে একবার আসুন। এক নম্বর ক্যাম্পে কি যেন ঘটছে।'

কার্লকে নিয়ে রেডিও রুমে ছুটে এল রানা। অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ—বড

হেলিকপ্টার ফিরছে না, কারণ আগুন লেগে বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা। শুধু হেলিকপ্টারে নয়, গোটা ক্যাম্প পুড়ে গেছে। 'কেউ আহত বা নিহত হয়েছে?' জানতে চাইল কার্ল।

লাউডস্পীকার থেকে ক্ষীণ যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'অনেকেই আহত হয়েছে··· কেউ মারা যায়নি।'

'কিভাবে আগুন লাগল?'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারপর আবার অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, '···বলতে পারি না···'

কার্ল জিজ্ঞেস করল, 'ট্র্যান্সমিটারের ক্ষতি হয়েছে নাকি? আওয়াজ এত দুর্বল কেন?'

'এদিকে আমি তো পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছি। আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?'

'কোন রকমে,' বলল কার্ল। 'আওয়াজ বাড়াও।'

আওয়াজ আগের চেয়ে সামান্য জোরাল হলো। 'প্রায় সবাইকে আমরা মেক্সিকো সিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে আমরা মাত্র তিনজন আছি। মি. চ্যাপেল জানিয়েছেন, জেট প্লেনে কি যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে···'

রানার ঘাড়ের পিছনে সড়সড় করে উঠল চুল। কার্লের কাঁধের ওপর ঝুঁকে মাইক্রোফোনে জিজ্ঞেস করল, 'প্লেনের আবার কি হলো?'

'···জানি না···গ্রাউন্ডেড··· রেজিস্ট্রেশনে ত্রুটি···ক্যাম্পে ফিরতে পারবে না, যতক্ষণ না···' ব্যস, শেষবারের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

'মেক্সিকো সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন,' কার্লকে নির্দেশ দিল রানা।

'চেষ্টা করে দেখছি, তবে মেক্সিকো সিটি এটার রেঞ্জের মধ্যে পড়ে বলে মনে হয় না।'

কার্ল চেষ্টা করছে, রানা চিন্তা করছে। এক নম্বর ক্যাম্পে আগুন লেগেছে। বড় হেলিকপ্টারটা নেই। মেক্সিকোতে জেট প্লেনটা উড়তে পারবে না। খোলা দরজাটা দিয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকাল ও। পাসকেল তার হেলিকপ্টারের যত্ন নিচ্ছে। সভ্য জগতে ফিরে যাবার ওটাই এখন ওদের একমাত্র বাহন।

'লাভ হচ্ছে না,' হতাশ সুরে বলল কার্ল। হাতঘড়ি দেখল সে। 'ওটা ছিল ক্যাম্প ওয়ানের শেষ ট্র্যান্সমিশন। ট্র্যান্সমিটার ঠিক করতে পারলে কাল সকাল আটটায় আবার যোগাযোগ করবে ওরা। তার আগে পর্যন্ত কিছুই আমাদের করার নেই।'

কার্লকে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হলো না। তবে রানা যা জানে কার্ল তা জানে না। যা কিছু ঘটছে, সবই রয় হেনেসের ষড়যন্ত্র। 'ঠিক আছে, প্রফেসরকে আমি জানাচ্ছি।'

সব শুনে প্রফেসরের কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। 'দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, মি. রানা। কাল ওরা নিশ্চয়ই সব ব্যাখ্যা করবে। আমাকে কাজ করতে দিন, প্লীজ।'

ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে পাসকেলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার

হেলিকপ্টার রেডি তো?'

বিস্মিত দেখাল পাসকেলকে। 'আপনি বললে এখুনি আকাশে তুলতে পারি, মি. রানা।'

'কাল হয়তো দরকার হবে,' বলল রানা। 'সকালের দিকে।'

রাতে ওদের ক্যাম্পেও আগুন লাগল—রেডিও রুমে। হৈ-চৈ আর ছুটন্ত পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দেখে ভেজা একটা কম্বল দিয়ে রেডিও রুমের আগুন নেভাচ্ছে কার্ল। বাতাস শুঁকল রানা, জানতে চাইল, 'ওখানে কি আপনি পেট্রল রেখেছিলেন?'

'না!' মাথা নেড়ে বলল কার্ল। 'চোর এসেছিল, দু'জন চিকলেরো। টের পেয়ে তাড়া করি। রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।' আগুনে পোড়া ট্র্যান্সমিটারের দিকে তাকাল সে। 'এর মানে কি, মি. রানা? চিকলেরোরা এই কাজ কেন করবে?'

আগেই উপলব্ধি করেছে রানা, ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। তবে কার্লকে সে-কথা বলল না। শুধু কার্লকে নয়, মারিয়া বা রিমরিগোকেও নিজের সন্দেহের কথা জানায়নি। 'আর কোন ক্ষতি হয়েছে?'

'আমি অন্তত জানি না,' জবাব দিল কার্ল।

ভোর হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। 'আমি এক নম্বর ক্যাম্পে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'ওখানে কি ঘটেছে জানা দরকার।'

'আপনার ধারণা আমাদের সবগুলো ক্যাম্প স্যাবোটাজ করা হচ্ছে, মি. রানা?' ওকে খুঁটিয়ে দেখল কার্ল।

'হ্যাঁ, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমি চলে গেলে ক্যাম্প থেকে কাউকে বেরুতে দেবেন না। আর মি. রিমরিগো কোন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত দিলে, মানার দরকার নেই।'

'জ্বী, বুঝতে পেরেছি। স্যার, ঠিক কি ঘটছে আমাকে কি বলা যায় না?'

'প্রফেসরকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়ো,' বলল রানা। 'আমার হাতে সময় নেই। দেখি পাসকেলকে রাজি করাতে পারি কিনা।'

নিজেদের কুঁড়ের খোলা দরজা থেকে রানার ব্যস্ততা লক্ষ করছে রিমরিগো, তবে কিছু বলছে না। দরজায় তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, মারিয়ার পথ আটকে রেখেছে।

রানার প্রস্তাব শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পাসকেল, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। সূর্য উঠছে, এই সময় টেকঅফ করার জন্যে তৈরি হলো ওরা। রানাকে বিদায় জানাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মারিয়া। রিমরিগোকে আশপাশে কোথাও দেখা গেল না। হেলিকপ্টার থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে মারিয়াকে রানা বলল, 'ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি।'

'ঠিক আছে,' কথা দিল মারিয়া।

হঠাৎ উদয় হলো রিমরিগো, মনে হলো হেলিকপ্টারের পিছন দিকে

কোথাও ছিল। মারিয়ার পাশে দাঁড়াল সে, কর্কশ ও ব্যঙ্গাত্মক সুরে রানাকে বলল, 'আপনার দেখছি হিরো হবার খুব শখ। একটু বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না?'

রানা জবাব দিল না। সিনোটের ওপর পাহাড়ে ইয়াম চ্যাচ মন্দির ইনভেস্টিগেট করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রিমরিগোকে। কিন্তু সে চেয়েছিল মাটি খুঁড়ে মন্দিরটা বের করবে। বেলফোর্স তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাগে হোক বা অভিমানে, সেই থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে সে, কোন কাজেই হাত লাগায়নি। ওদিকে মারিয়াকে নিয়ে সিনোট থেকে প্রতিদিন আর্টিফ্যাক্ট তুলেছে রানা, তাতে তার আক্রোশ আরও বেড়ে গেছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ তুমি?' মারিয়ার হাত ধরে টান দিল রিমরিগো। 'এসো আমার সঙ্গে, ঘরে যাই। শালার একখানা বউ পেয়েছি বটে!' মারিয়াকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে।

রানার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল পাসকেল। 'আমরা বরং রওনা হয়ে যাই, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, চলুন।'

আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। রানা বলল, 'বেশি ওপরে উঠবেন না। জঙ্গলটা আমি কাছ থেকে দেখতে চাই।'

'স্পীড কমিয়ে রাখি, তাহলে আরও ভালভাবে দেখতে পাবেন,' বলল পাসকেল।

পুব দিকে যাচ্ছে ওরা, জমিন থেকে তিনশো ফুট ওপরে, স্পীড ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশি নয়। নিচে দিগন্ত বিস্তৃত বনভূমি, সবুজ এক বিশাল চাদর। কিছু কিছু গাছ মাটি থেকে একশো ষাট ফুট বা তারও বেশি খাড়া হয়ে আছে, বনভূমির মুকুটের মত লাগছে ওগুলোকে। নিচের স্তরের নিরেট সবুজ চাদর ভেদ করে ওপরে উঠে আসায় মুকুটগুলোকে ছড়ানো ছিটানো দ্বীপ মনে হলো। আরও নিচে মাটি আছে, জানে ওরা, কিন্তু দেখার কোন উপায় নেই।

'কার সাধ্য ওই জঙ্গলে হাঁটে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

হেসে উঠল পাসকেল। 'ওখানে আমাকে নামিয়ে দিলে ভয়েই মরে যাব। কাল রাতে বানরগুলোর চেঁচামেচি শুনেছেন? মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে কারও গলা কাটা হচ্ছে।'

'জন্তু-জানোয়ারের চিৎকারকে আমি ভয় পাই না,' বলল রানা। 'ভয় পাই সাপ আর পিউমাকে।'

'আরও বিপজ্জনক চিকলেরোরা। শুনেছি থুথু ফেলার মত অনায়াসে মানুষ খুন করে ওরা।'

জঙ্গলের এমন একটা অংশ পেরুচ্ছে ওরা, বাকি অংশের সঙ্গে কোথাও যেন একটা অমিল আছে। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা। 'এদিকটা এরকম কেন?'

'কি জানি,' বলল পাসকেল। 'এদিকের গাছগুলো যেন মরে গেছে। আসুন, আরও কাছ থেকে দেখি।' হেলিকপ্টার আরও খানিক নিচে নামিয়ে

চক্কর দিতে শুরু করল সে। এদিকে বহু গাছের মাথাই নেই, অর্থাৎ মুকুটহীন দাঁড়িয়ে আছে, না আছে মগডাল, না পাতা। 'আমি বোধহয় বুঝতে পারছি কি ঘটেছে,' বলল পাসকেল। 'সম্ভবত টর্নেডো। উঁচু গাছগুলো শিকড় সহ মাটি থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে থাকায় কাত হতে পারেনি, দাঁড়ানো অবস্থায় মারা গেছে। নরক আর কাকে বলে, আপনাকে দাঁড়িয়ে মারা যেতে হবে।'

আরও ওপরে উঠে এসে নিজেদের পথে রওনা হলো ওরা। 'টর্নেডো না হয়েই যায় না,' বলল পাসকেল। 'মরা গাছগুলো একই লাইনে, সরল একটা রেখার ওপর।'

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার। সঙ্গে সঙ্গে কাকে যেন অভিশাপ দিল পাসকেল।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'বুঝতে পারছি না।' দ্রুত ইন্সট্রুমেন্ট পরীক্ষা করছে পাসকেল। খানিক পর বলল, 'সবই তো দেখছি ঠিক আছে।'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হেলিকপ্টারের পিছনে প্রচণ্ড শব্দে কি যেন একটা বিস্ফোরিত হলো, সেই সঙ্গে গোটা ফিউজিলাজ অবিশ্বাস্য গতিতে পাক খেতে শুরু করল। ছিটকে ককপিটের এক পাশে পড়ল রানা, ওখানে যেন ওকে পেরেক গেঁথে আটকে রাখা হয়েছে। ওদিকে কন্ট্রোলের সঙ্গে রীতিমত ধস্তাধস্তি করছে পাসকেল।

পাক খাচ্ছে কপ্টার, তার সঙ্গে ঘুরছে দুনিয়া। দিগন্ত সবেগে উঁচু হচ্ছে, পরমুহূর্তে আবার নিচু হচ্ছে, তারপর হঠাৎ করেই একদম কাছে চলে এল বনভূমি। 'শক্ত হোন, আঁকড়ে ধরুন!' চিৎকার করছে পাসকেল, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সুইচগুলো দ্রুত অফ করে দিল।

এঞ্জিনের আওয়াজ অকস্মাৎ থেমে গেল। তারপরও পাক খাচ্ছে কপ্টার। জানালার সামনে দিয়ে একটা গাছকে ছুটে যেতে দেখল রানা, বুঝতে পারল যে-কোন মুহূর্তে ক্র্যাশ করবে ওরা। এক সেকেন্ডও পেরুল না, সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল। আবার ছিটকে পড়ল রানা, মাথায় বাড়ি খেলো ইস্পাতের একটা বার।

তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

আট

মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে ব্যথায়। একটু নড়াচড়া করতেই সেটা আরও বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্ঞান হারাল রানা। দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফেরার পর ব্যথাটা কম মনে হলো। এবার মাথাটা তুলতে পারল, তবে চোখের সামনে শুধু লাল আলো নাচানাচি করতে দেখল। পিছনে হেলান দিয়ে চোখ রগড়াল,

আর তখনই শুনতে পেল গোঙানির আওয়াজটা। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে আরও কিছুক্ষণ লাগল, তবে এবার লালের বদলে চোখ-ধাঁধানো সবুজ দেখতে পাচ্ছে শুধু। আওয়াজটা আবার কানে ঢুকতে ঘাড় ফেরাল রানা।

সীটেই বসে আছে পাসকেল, তবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে গোটা শরীর, মুখের এক পাশ থেকে রক্তের সরু একটা ধারা নেমে আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকাল রানা।

প্রথমেই ব্যাঙটাকে দেখতে পেল। চওড়া একটা পাতায় বসে রানার দিকে নিষ্পলক ও চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে। একদম স্থির ওটা, শুধু হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে একই তালে গলার রগ ঘন ঘন কাঁপছে বা ঝাঁকি খাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর মাত্র একবার চোখের পাতা ফেলল। সংবিৎ ফিরে পেল রানা, আবার তাকাল পাসকেলের দিকে।

সামান্য নড়ে মাথাটা উঁচু করল পাসকেল। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা। মুখ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল রানাকে। নিশ্চয়ই শরীরের ভেতর কোথাও জখম হয়েছে।

অসম্ভব দুর্বল লাগল শরীরটা, মনে হলো নড়তে পারবে না। বহু কষ্টে বসতে চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা কেবিন কেঁপে উঠল, তারপর এমন দুলতে লাগল, ওরা যেন ঢেউয়ের মাথায় কোন নৌকায় রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার ব্যাঙটার দিকে তাকাল রানা। এখনও ওখানে রয়েছে ওটা, তবে তার বিশাল আসন অর্থাৎ পাতাটা ওপর-নিচে দোল খাচ্ছে ঘন ঘন। তাতে অবশ্য তাকে অস্থির বা উদ্বিগ্ন মনে হলো না।

'পা···পা···' কিছু বলার চেষ্টা করছে পাসকেল।

'চোখ খুলুন, পাসকেল,' বলল রানা। 'জাওন।'

আবার গুঙিয়ে উঠে চোখ খুলল পাসকেল। 'পা···পানি···,' হাঁপাচ্ছে পাসকেল। 'সী-সীটের পিছনে···'

শরীরটা মুচড়ে বোতলটার দিকে হাত বাড়াল রানা, সেই সঙ্গে আবার ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে শুরু করল হেলিকপ্টার। বোতলটা খুলে পাসকেলের মুখে চেপে ধরল ও। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা জানে না, পাসকেলের নাড়ীভুঁড়ি যদি ফুটো হয়ে গিয়ে থাকে, পানি তার কোন কাজে আসবে না।

পানি ঠিক মতই খেতে পারল পাসকেল, ঢোক গিলতে কোন অসুবিধে হলো না। তবে গোলাপী ফেনা দেখা গেল ঠোঁটের কোণে, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে নামছে। ভয় পেলেও, পাসকেলকে বুঝতে দিল না। নিজেও দু'ঢোক পানি খেলো ও। তারপর বলল, 'কোথায় রয়েছি, বুঝতে পারছেন তো?'

'কোথায়?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল পাসকেল।

'মাটিতে নয়, গাছের মাথায়।'

নাক টেনে বাতাস শুঁকল পাসকেল। 'গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছি।'

রানা জানতে চাইল, 'হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করল কেন? কি ঘটেছিল?'

'আমার ধারণা পিছনের রোটর ভেঙে গেছে, ফলে মেইন রোটরের উল্টোদিকে পাক খেতে শুরু করে ফিউজিলাজ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ক্লাচ

ডিজএনগেজ করে সুইচ অফ করতে পেরেছিলাম।'

'ঘন জঙ্গলকে শত্রু ধরে নিয়েছিলাম, অথচ সেই জঙ্গলটা ঘন বলেই এখনও আমরা বেঁচে আছি,' বলল রানা। 'মাটিতে ক্র্যাশ করলে ভর্তা হয়ে যেতাম।'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল পাসকেল। 'পিছনের রোটর ভাঙল কিভাবে?'

'মেটালে হয়তো কোন ত্রুটি ছিল।'

'প্রশ্নই ওঠে না। এটা একদম নতুন একটা হেলিকপ্টার।'

'এ নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। ভাবুন নিচে নামার কি উপায় করা যায়। কত ওপরে রয়েছি আমরা? মাটি কত নিচে?' সাবধানে এগোবার চেষ্টা করছে রানা। 'সতর্ক থাকুন।'

সাইড ডোরের হাতল চাপ দিতে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। দরজাটা নয় ইঞ্চি খুলল, তারপর আর নড়ছে না। সরাসরি নিচে একটা শাখা, তার নিচে শুধু পাতা আর পাতা, মাটির কোন চিহ্নমাত্র নেই। ওপর দিকে তাকাল রানা, পাতার ফাঁকে সামান্য একটু আকাশ দেখতে পেল।

রানা আন্দাজ করল, মাটি থেকে আশি ফুট ওপরে রয়েছে ওরা। সাধারণত রেইন ফরেস্ট তিন স্তরে তৈরি হয়, বিজ্ঞানীরা ওগুলোকে গ্যালারি বলেন। ওরা ওপরের স্তর ভেঙে দ্বিতীয় স্তরে আটকা পড়েছে। রানার প্রশ্নের উত্তরে পাসকেল জানাল কপ্টারে রশি নেই, তবে উইঞ্চ কেবল আছে। উইঞ্চের ড্রামে একটা ক্লাচ আছে, ম্যানুয়ালী অপারেট করা যায়। কেবল খুলতে তাকে সাহায্য করল রানা, খোলার সময়ই সীটের পিছনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখছে। কাজটা শেষ হতে ক্লিপবোর্ডে আটকানো একটা ম্যাপ হাতে নিল পাসকেল, রানাকে দেখাল কোথায় ওরা রয়েছে। 'ক্যাম্প থেকে দশ মাইল দূরে।'

'এই জঙ্গলে দশ মাইল মানে দশ দিনের পথ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

কপ্টারে সারভাইভাল কিট একটা আছে বটে, তবে তাতে শুধু একজোড়া ম্যাচেটি, একটা ফার্স্ট এইড বক্স, দুটো ওয়াটার বটল ছাড়া কাজের জিনিস আর কিছু নেই।

'রেডিও? ওটা কাজ করছে?' জানতে চাইল রানা।

ইতস্তত করে পাসকেল বলল, 'গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছেন না? ট্র্যান্সমিটার অন করলে যদি আগুনের ফুলকি বেরোয়?' পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর জোর করে হাসল পাসকেল। 'ঠিক আছে, যা থাকে কপালে।' ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করল সে, কানে এয়ারফোন। 'ডেড! সিগনাল যাচ্ছে না বা আসছেও না।'

দরজা যতটা সম্ভব ফাঁক করে আবার নিচে তাকাল রানা। শাখা বা ডালটা নয় ইঞ্চির মত চওড়া, দেখে খুব শক্ত আর নিরেট মনে হলো। 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি,' পাসকেলকে বলল। 'যখন বলব, কেবলটা নিচে ফেলে দেবেন।'

দরজা আরও একটু ফাঁক করা সম্ভব হলো, তারপরও বেরুতে কষ্ট হচ্ছে রানার। বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল ডালটা ওর ঝুলন্ত পা থেকে ছ'ইঞ্চি নিচে। তারমানে ডালে পা ফেলতে হলে খসে পড়তে হবে ওকে। দরজার কিনারা থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। ডালের ওপর ঠিকমতই পড়ল পা, এক সেকেন্ড টলমল করে স্থির হলো শরীরটা। 'ঠিক আছে, কেবলটা নামান।'

ঝুলন্ত কেবলটা ধরে ফেলল রানা। পাসকেল ওটার শেষ প্রান্তের হারনেসে পানির বোতল আর ম্যাচেটি বেঁধে দিয়েছে। হারনেসটা ডালের সঙ্গে আটকাল রানা। আরও খানিকটা কেবল ছাড়ার পর দরজায় উদয় হলো পাসকেল। সে তার কোমরে কেবলের একটা লূপ জড়িয়েছে। ডালে নামছে না, আঁচড়াআঁচড়ি করে হেলিকপ্টারের মাথায় উঠে যাচ্ছে। একটু পরই ডালপালা আর পাতার রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা বার বার চিৎকার করছে, 'হেলিকপ্টার খসে পড়ছে!' কিন্তু পাসকেল সাড়া দিচ্ছে না।

মট মট করে ডালপালা ভাঙার শব্দ হলো। এদিক ওদিক দ্রুত কাত হয়ে পড়ছে হেলিকপ্টার। তারপর আবার দেখা গেল পাসকেলকে। সাবধানে নেমে আসছে সে কপ্টারের মাথা থেকে। কোন বিপদ হলো না, ডালে রানার পাশে পৌঁছুল। আঙুল তুলে কপ্টারের হুইল দেখাল রানা। 'যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়বে ওটা। চলুন পালাই।'

হারনেস থেকে ওয়াটার বটল আর ম্যাচেটি খুলল ওরা। কাঁধে স্লিং ঝোলাল। টেনে কেবলের বাকি অংশ বের করে নিল হেলিকপ্টার থেকে। 'মাটি কত নিচে?'

'একশো ফুট।'

কেবলের সবটুকু নিচে নামিয়ে দিল রানা। তারপর সেটা ধরে ঝুলে পড়ল। নামতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, কারণ আশপাশে প্রচুর ডালপালা রয়েছে। খানিক পর পর থামল রানা, ডালে জড়িয়ে পড়া কেবল ছাড়াল, অপেক্ষা করল পাসকেলের জন্যে।

একটা ডালে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল পাসকেল। বুকে হাত চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে সে। বলল, 'পাঁজরের অন্তত দুটো হাড় ভেঙে গেছে।'

বোতল থেকে তাকে পানি খাওয়াল রানা। দরদর করে ঘামছে সে। বানর বা কাঠবিড়ালী নয়, নয় কোন পাখি; চারদিকে শুধু ব্যাঙ দেখা যাচ্ছে। রেইন ফরেস্ট সম্পর্কে লেখা একটা বইতে রানা পড়েছে, এই ব্যাঙগুলো ওপরের গ্যালারিতেই জন্মায় ও মারা যায়, জীবনে কখনও মাটি না দেখেই।

কেবল ধরে আবার ঝুলে পড়ল ওরা। পাসকেলের আঘাত কতটুকু গুরুতর ঠিক বুঝতে পারেনি রানা, সেজন্যে চিন্তিত। হঠাৎ ওকে চমকে দিল একটা স্পাইডার মাঙ্কি, বিশ ফুট লাফ দিয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে পড়ল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে মুখ ভেঙচাল ওকে।

অবশেষে মাটিতে নামল ওরা। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ, প্রায় নিশ্ছিদ্র। মুখ তুলে কেবলটা দেখল রানা। কোন মায়া বা চিকলেরো এদিকে যদি আসে, ওটাকে ঝুলতে দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিংবা, কে জানে, কোন

মানুষের চোখে ওটা হয়তো কোনদিন ধরাই পড়বে না। 'কোনদিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাতের ম্যাচেটি দিয়ে ঝোপ কাটতে শুরু করল পাসকেল। 'আগে হেলিকপ্টারের নিচে থেকে সরি, তারপর ভাবা যাবে কোনদিকে যাব।'

প্রফেসরের ভাষায় ওরা এই মুহূর্তে বিশ ফুটী জঙ্গলে রয়েছে। ঝোপ আর গাছের ডালপালা কেটে বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে ওরা। এক সময় থামল পাসকেল। 'হেলিকপ্টারটা স্যাবোটাজ করা হয়েছে,' কর্কশ গলায় বলল সে।

'হোয়াট!'

'ঠিকই বলছি। হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করানো হয়েছে।'

'কিভাবে?'

'পিছনের রোটরের কয়েকটা স্ক্রু কেউ খুলে নিয়েছে, বাকিগুলোও ঢিলে করে রেখেছিল।'

'আপনি শেষবার কবে ওগুলো চেক করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাত্র দু'দিন আগে। স্যাবোটাজ করা হয়েছে তার পরে, কারণ কাল আমি কপ্টার চালিয়েছি।'

'কিন্তু···কে?'

'আপনিই বলুন কে।'

দশ মাইল দূরে ক্যাম্প, রাতে হাঁটা সম্ভব নয়, কাজেই পৌঁছুতে দু'দিন লেগে যাবে। আড়াই বোতল পানি আছে, এই প্রচণ্ড গরমে তা যথেষ্ট নয়। পকেট থেকে ম্যাপ আর কম্পাস বের করে পাসকেল বলল, 'পাঁচ মাইল দূরে ছোট একটা সিনোট আছে। ক্যাম্পে নয়, আগে ওখানে পৌঁছুতে হবে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'সাড়ে এগারোটা বাজে। সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছুতে পারলেই খুশি আমি।'

জঙ্গলের নিচে পোকা, সাপ আর গিরগিটির রাজ্য; প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হচ্ছে। রানা একাই ম্যাচেটি ব্যবহার করছে, ফলে বাহু আর পিঠের পেশী ব্যথায় অবশ হয়ে এল। ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ছে পাসকেল। প্রথম দিকে ম্যাচেটি ধরা হাত উঁচু করলেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠছিল। বুকের ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে সে। রানা নিষেধ করায় ম্যাচেটি চালাচ্ছে না, তবে সেটা বহন করছে সে, বোতল দুটোও নিজের কাছে রেখেছে। কম্পাসটাও তার কাছে, মাঝে মধ্যে রানাকে দিক নির্দেশ দিচ্ছে। প্রথম এক ঘণ্টায় প্রায় দু'মাইল এগোল ওরা। উৎসাহ বেড়ে গেল রানার। এভাবে এগোতে পারলে বিকেলের মধ্যেই সিনোটে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই নিরেট পাঁচিল হয়ে উঠল ঝোপ-ঝাড়। আধ ঘণ্টায় বিশ গজও এগোনো যাচ্ছে না। হাত আর বাহু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, কুলকুল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ক্লান্তি মেরে ফেলছে রানাকে। বিশ্রামের সময় শুয়ে পড়ল, মনে হলো জীবনে আর উঠতে পারবে না। পাসকেল শুধু হাঁটছে, কোন কাজ করছে না, তাসত্ত্বেও শ্বাসকষ্ট বাড়ছে তার। আড়চোখে বোতলের

দিকে তাকালেই তাকে পানি খেতে দিচ্ছে রানা। পাসকেল পাঁচবার পানি খেলে, ও খায় একবার। 'আর কত দূর, পাসকেল?'

'দু'মাইল,' বিড়বিড় করল পাসকেল। 'শেষ এক মাইল আসতে তিন ঘণ্টা লেগেছে।'

নিশ্ছিদ্র ঝোপের দিকে তাকাল রানা। কোন সন্দেহ নেই, চার ফুটী। 'আপনার ম্যাচেটিটা দিন; আমারটা ভোঁতা হয়ে গেছে।'

আবার শুরু হলো জঙ্গলের সঙ্গে মরণপণ লড়াই। এক ঘণ্টা কিভাবে পেরিয়ে গেল বলতে পারবে না রানা। হঠাৎ পাসকেল বলল, 'স্টপ!' তার বলার সুরটা এমনই, রানার ঘাড়ের পিছনে সব চুল দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির পাথর হয়ে গেল ও। 'সাবধান! স্রেফ এক পা পিছিয়ে আসুন। ধী-রে ধী-রে, কোন শব্দ করবেন না।'

প্রথমে এক পা, তারপর আরেক পা পিছাল রানা। 'কি ব্যাপার?'

'আরও পিছান···আরও দুই পা।'

পিছাল রানা। 'কি ব্যাপার?'

আটকে রাখা দম ছাড়ল পাসকেল। 'বিপদ কেটে গেছে,' বলল সে। 'তবে ওদিকে তাকান, ওই গাছটার গোড়ায়,' হাত তুলে দেখাল সে।

সেদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে গেল রানা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে আর এক পা এগোলেই সাপটার গায়ে পা পড়ত। কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, মাথাটা চ্যাপ্টা, চোখে পলক নেই।

'বুশমাস্টার,' বলল পাসকেল। 'একবার যদি কামড়ায়, বাঁচার কোন উপায় নেই।'

মাথাটা পিছিয়ে নিল বুশমাস্টার, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল অলস ভঙ্গিতে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে রাতটুকুর জন্যে থামতে হলো। সারা শরীরে ব্যথা, পেটে খিদে, মাটিতে শুধু শুয়ে থাকা হলো, চোখে ঘুম এল না। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেয়ার পর একটা গাছে চড়ল ওরা। প্রথমে রানা, তারপর পাসকেল। পাসকেলকে টেনে তুলতে হলো। রানা বারণ করা সত্ত্বেও সিগারেট ধরাল সে।

ব্যথায় সারাক্ষণ কাতরাচ্ছে পাসকেল। হাত দিয়ে বুক ডলছে। রানা তার মুখের কোণে আবার রক্ত গড়াতে দেখল। রুমাল দিয়ে সেটুকু মুছে দিল ও। জোর করে হাসল পাসকেল, বলল, 'কিছু না, দাঁত ভেঙে যাওয়ায় রক্ত বেরুচ্ছে।'

রাতের জঙ্গলে বিচিত্র সব শব্দ হচ্ছে। একবার মনে হলো ঝোপ সরিয়ে এদিকে আসছে কেউ। আরেকবার ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল। পাতার খসখস শব্দে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর অকস্মাৎ এক দল বানর একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দেয়ায় এমন চমকে উঠল ওরা, আরেকটু হলে ডাল থেকে খসে পড়ত নিচে।

এক সময় চোখে ঘুম নামল। তার ঠিক আগে রানার মনে হলো, দূর

থেকে কাদের যেন গলা ভেসে আসছে।

সকালে নাস্তার বদলে বাকি পানিটুকু খেয়ে রওনা হলো ওরা। প্রচণ্ড গরম আর অমানুষিক পরিশ্রম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাঁপানোর সময় রোমহর্ষক আওয়াজ বেরুচ্ছে পাসকেলের বুক আর গলা থেকে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ম্যাপটা বের করল পাসকেল। প্রতিটি নড়াচড়া মন্থর হয়ে গেছে, বুকের ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা। ম্যাপে আঙুল রেখে বলল, 'আমরা সম্ভবত এখানে। আর এক মাইল।'

'মনটা শক্ত করুন,' বলল রানা। 'খুব বেশি হলে সিনোটে পৌঁছুতে আর তিন ঘণ্টা লাগবে।'

জোর করে হাসতে চেষ্টা করেও পারল না পাসকেল, ঠোঁট জোড়া শুধু কেঁপে উঠল। 'আপনি এগোন, ঠিক পিছনেই আছি আমি।'

আবার রওনা হলো ওরা, তবে খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছে। রানা ম্যাচেটি চালালেও, তাতে জোর নেই। আগে এক কোপে যে কাজ হচ্ছিল, সেই কাজে দুই বা তিন কোপ লাগছে। আরও একটা খারাপ লক্ষণ হলো, রানা ঘামছে না।

চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপরও সিনোটের দেখা নেই। জঙ্গল এখনও আগের মতই ঘন। রানাকে ঝোপ কেটে এগোতে হচ্ছে, তাসত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ছে পাসকেল। ঘন ঘন বিশ্রাম নিচ্ছে সে। কাজ থামিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এল পাসকেল, ওর পায়ের কাছে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। ঝুঁকল রানা। 'পাসকেল?'

'আমি ঠিক আছি,' গলায় জোর আনার ব্যর্থ চেষ্টা করল পাসকেল। 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

'আমি দু'জনের জন্যেই চিন্তিত। আরও অনেক আগে সিনোটে পৌঁছে যাবার কথা আমাদের। ঠিক জানেন, ভুল পথে আসিনি?'

পকেট থেকে কম্পাস বের করল পাসকেল। 'না, ঠিক পথেই আছি।' শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল। 'একটু হয়তো উত্তরে ঘোরা উচিত।'

'কত দূরে, পাসকেল?'

'গড, কি করে বলি! সিনোটটা ছোট। পিছনে ফেলে আসলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

এই প্রথম রানার সন্দেহ হলো, ওরা হারিয়ে গেছে। দ্রুত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'উত্তর দিকে দুশো গজ এগোব, তার বেশি নয়। তারপর যে পথে আছি সেটার সমান্তরাল একটা পথ ধরে পিছন দিকে ফিরে যাব।' আবার ম্যাচেটি বদল করল ও, হাতেরটা একদমই ভোঁতা হয়ে গেছে। 'আসুন, পাসকেল। পানি পেতেই হবে।'

এবার রানার হাতে কম্পাস। দিক বদলে একশো গজ এগোবার পর অবাক হয়ে দেখল সামনে ফাঁকা একটা জায়গা—জঙ্গলের মাঝখানে সরু

প্যাসেজ, একটা ট্রেইল। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ঝোপ-ঝাড় কেটে পথটা সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে, ডালপালা কাটার দাগগুলো এখনও তাজা। ট্রেইলে পা দিতে যাবে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মানুষের কণ্ঠস্বর। দ্রুত, নিঃশব্দে, পিছিয়ে এল রানা। মাত্র এক ফুট সামনে দিয়ে দু'জন লোক হেঁটে গেল, দু'জনেই পরে আছে নোংরা সাদা ট্রাউজার, মাথায় তোবড়ানো হ্যাট, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা করে রাইফেল। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে বলতে চলে গেল। টলতে টলতে রানার পাশে এসে দাঁড়াল পাসকেল, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তাকে সাবধান করে দিল রানা। 'চিকলেরো,' ফিসফিস করল ও। 'সিনোটটা কাছেই কোথাও আছে।'

একটা গাছে হেলান দিল পাসকেল। 'আমরা ওদের সাহায্য চাইতে পারি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'চিকলেরোদের সম্পর্কে শোনেননি? দেখলেই খুন করে ফেলবে। শুনুন, পাসকেল। আপনি এখানে বিশ্রাম নিন। আমি ওই দুই ছোকরার পিছু নিয়ে দেখে আসি কোথায় যায় ওরা।'

সঙ্গে সঙ্গে গাছটার গোড়ায় বসে পড়ল পাসকেল। 'ঠিক আছে।'

পাসকেলকে রেখে একাই ট্রেইলে পা রাখল রানা। ঝোপ না কেটে পথ চলার যে কি আনন্দ! দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটছে ও। খানিক পরই চিকলেরো দু'জনকে দেখতে পেল। হাঁটার গতি কমিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকল। সিকি মাইল অনুসরণ করার পর কাঠ পোড়ার গন্ধ ঢুকল নাকে, আরও লোকজনের গলা ভেসে এল। ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল রানা। এদিকে গাছপালা বা ঝোপ তেমন ঘন নয়, ম্যাচেটি ব্যবহার না করেও এগোনো যাচ্ছে।

তারপর গাছপালার ফাঁকে পানিতে রোদের প্রতিফলন দেখল রানা। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলেও সিনোটের দিকে ছুটল না। সাবধানে আরও খানিক সামনে এসে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকল, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে।

নীল আর হলুদ রঙের তাঁবু ফেলা হয়েছে সিনোটের এক ধারে, পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান, সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশজন লোক। একটা তাঁবুর সামনে, ক্যাম্প টুলে, বসে রয়েছে আমেরিকান মাফিয়া ডন ডায়নামো ডিকানডিয়া ওরফে রয় হেনেস, হাতের গ্লাসে একটা বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ঢোক গিলল রানা।

রয় হেনেসের সামনে একটা ক্যাম্প টেবিল, তাতে ভাঁজ খোলা একটা ম্যাপ। তার কথা মন দিয়ে শুনছে টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা আটজন লোক। কাপড়চোপড় আর গলার আওয়াজই বলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে চারজন আমেরিকান। বাকি চারজনকে মেক্সিকান মনে হলো। আরেক পাশে, সিনোটের কিনারায়, বসে রয়েছে বারো কি তেরোজন চিকলেরো।

আড়াল থেকে পিছিয়ে এসে সিনোটটাকে চক্কর দিল রানা। ওদের চোখে ধরা না পড়ে যেভাবেই হোক সিনোট থেকে পানি আনতে হবে ওকে। কিন্তু চিকলেরোরা যেভাবে বসে আছে, সিনোটের কাছাকাছি কেউ গেলেই দেখে

ফেলবে। তবে এই সিনোটটা কুয়ার মত নয়, কিনারা থেকেই পানির নাগাল পাওয়া যাবে, দেখতেও অনেকটা পুকুরের মত।

লোকগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। শুয়ে-বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে। রানার মনে হলো, কিছু একটার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।

এই মুহূর্তে ওর করার কিছু নেই, কাজেই ট্রেইল ধরে পাসকেলের কাছে ফিরে এল রানা। পাসকেল ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যেও গোঙাচ্ছে সে। গায়ে হাত দিতে চাপা গলায় আঁতকে উঠল। 'চুপ, পাসকেল, চুপ!' ফিসফিস করল রানা। 'আমরা বিপদের মধ্যে আছি।'

'কি বিপদ?' উন্মাদের মত দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল পাসকেল।

'সিনোটটা পেয়েছি। কিন্তু চিকলেরোরা ঘিরে রেখেছে ওটাকে। ওদের সঙ্গে রয় হেনেসকে দেখলাম।'

'রয় হেনেস? সে আবার কে?'

বোঝা গেল, প্রফেসর বেলফোর্স তাঁর হেলিকপ্টার পাইলটকে রয় হেনেস সম্পর্কে কিছু জানাননি। রানা বলল, 'রয় হেনেস মারাত্মক বিপদ।'

'সারাদিন পানি খাইনি,' বলল পাসকেল। 'ওখানে গিয়ে···'

'ওখানে গেলে ওরা আমাদের জবাই করবে,' বলল রানা। 'শুনুন। আমার ধারণা, হেনেসের নির্দেশেই আপনার হেলিকপ্টার স্যাবোটাজ করা হয়েছে। পানির জন্যে আপনাকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' থমথম করছে ওর চেহারা।

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি আর হাঁটতে পারব বলে মনে হয় না, মি. রানা।'

'আপনাকে আমি হাঁটতে দিলে তো।' নরম হলো রানার চেহারা। গলার স্বরটাও কোমল, যেন বাচ্চা একটা ছেলেকে আদর করছে। ও জানে, মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে পাসকেলের। তার কপালে হাত বুলাতে গিয়ে গরম ছ্যাঁকা খেলো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। 'মনোবল হারাবেন না।' বোতল থেকে কয়েক ফোঁটা পানি ঢালল ঠোঁটে, ওই কয়েক ফোঁটাই ছিল। 'আমাদের এই বিপদ কেটে যাবে।'

বিকেলটা আগুন। অথর্ব সময়। পাসকেল বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে বা ঘুমিয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকছে সারাক্ষণ। তার কাছ থেকে নড়ছে না রানা। পাশে বসে ম্যাচেটির ব্লেড ঘষছে পাথরে।

সন্ধের ঠিক আগে তিনটে বোতল নিয়ে রওনা হলো রানা। পাসকেলকে বলল, 'জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।'

ট্রেইলে বেরিয়ে এসে পাশের ডালে এক টুকরো কাগজ গেঁথে রাখল রানা, ফেরার সময় পাসকেলকে খুঁজে পেতে সুবিধে হবে।

চিকলেরোরা আগুন ধরিয়ে রাতের খাবার তৈরি করছে। রানা পজিশন নিল ক্যাম্প থেকে যতটা সম্ভব দূরে আর সিনোট থেকে যতটা সম্ভব কাছে।

আগুনটা সদ্য ধরানো হয়েছে, শিখার আভায় গোটা সিনোট আলোকিত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

এক সময় শিখাগুলো মাথা নত করল, জ্বলন্ত কাঠ থেকে শুধু টকটকে লাল আভা বেরুচ্ছে। চিকলেরোরা ওটাকে ঘিরে বসে আছে। লোহার শিকে গেঁথে মাংস পোড়াচ্ছে কেউ কেউ, কয়েকজন রুটি সেঁকছে। খানিকপর কফির গন্ধ পেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল পেট। মনে পড়ল, দু'দিন কোন খাবার জোটেনি ওদের।

তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। প্রথমে চিকলেরোরা তাঁবুতে ঢুকল। সবশেষে রয় হেনেস। তবে তার তাঁবুতে আলো জ্বলছে। সম্ভবত মশারির ভেতর বসে কিছু করছে সে।

সাপের মত ক্রল করে এগোল রানা। কর্ক খুলে একটা বোতল পানিতে ডুবিয়েছে, রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার ভেসে এল মাথার ওপর থেকে। এই আওয়াজ আগেও শুনেছে রানা। প্রথমে একটা, তারপর দলের সবগুলো বানর চেঁচাচ্ছে। বোতলগুলোয় পানি ভরে কর্ক লাগাল রানা।

চিকলেরোদের ক্যাম্প থেকে কেউ যদি এদিকে তাকিয়ে থাকে, ওকে দেখতে না পাবার কথা নয়। আকাশটা পরিষ্কার, চাঁদটাও নধর। সচল একজন মানুষ চোখে পড়তে বাধ্য। তবে সিনোট থেকে ফিরে আসার সময় কোন শব্দ শুনল না। তারমানে চিকলেরোরা কোন গার্ড রাখেনি।

একটা বোতল প্রায় খালি করে ফেলল পাসকেল। তার পানি খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, 'সকাল হবার আগেই সিনোটের উল্টোদিকে পৌঁছুতে হবে। এখুনি রওনা হতে হয়। আপনি হাঁটতে পারবেন?'

'তা পারব,' বলল পাসকেল। 'এত তাড়া কিসের?'

'সিনোটটা ওয়াশওয়ানোক আর আমাদের মাঝখানে,' বলল রানা। 'কারও চোখে ধরা না পড়ে সিনোটের উল্টোদিকে পৌঁছুতে হবে। ওদিকে আরেকটা ট্রেইল দেখে এসেছি। সেটা ধরতে পারলে কাল খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারব।'

গাছ ধরে অনেক কষ্টে সিধে হলো পাসকেল। 'আমি রেডি।'

রওনা হবার পর দেখা গেল রানার ঠিক পিছনেই থাকছে পাসকেল। পানি খেয়ে খানিকটা হলেও শক্তি ফিরে পেয়েছে সে। ট্রেইল ধরেই এগোল ওরা, চিকলেরোদের ক্যাম্পটাকে একপাশে রেখে সিনোটের উল্টোদিকে পৌঁছুবে। সিনোটের কিনারা থেকে ক্রল শুরু করল। ক্যাম্পটাকে পাশ কাটিয়ে আসার সময় কোন বিপদ হলো না। নতুন ট্রেইল ধরে খানিক দূর এগোবার পর ম্যাপটা চেক করল রানা, কম্পাসও ব্যবহার করল। দেখা গেল ট্রেইলটা ওয়াশওয়ানোকের দিকেই এগিয়েছে।

হোঁচট খেতে খেতে এক মাইল এগোবার পর পিছিয়ে পড়তে শুরু করল পাসকেল। থামার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল ওরা। পাসকেলকে ধরে শুইয়ে দিতে হলো। গাছে চড়ার শক্তি নেই তার। আবার তাকে পানি খাওয়ানো হলো।

'আপনি খাবেন না?'

পানি ভর্তি শেষ বোতলটা পাসকেলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'বাকি দুটো বোতল ভরে আনতে যাচ্ছি।' যেতেই হবে, তা না হলে পানির অভাবে ওয়াশওয়ানোকে কোনদিনই ওরা পৌঁছুতে পারবে না।

পাসকেলকে রেখে আবার রওনা হলো রানা, ট্রেইলের মাঝখানে একটা ম্যাচেটি গেঁথে রাখল। ট্রেইল ধরে যে-ই আসুক, আছাড় খেতে বাধ্য—ও নিজেও। তবে এত রাতে এই পথে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। সিনোটে পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টা লাগল রানার, পানি ভরতে লাগল তিন মিনিট, ফিরতে এক ঘণ্টা—পায়ের পাতার দশ ইঞ্চি ওপরের হাড়ে ম্যাচেটি লাগায় গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। নিজের ওপরই রাগ হলো, তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে পাসকেলকে কেউ দেখতে পায়নি।

সে ঘুমিয়ে আছে। পাশে বসে চোখ বুজল রানা।

সকালে পাসকেলই ঘুম ভাঙাল। তার জ্বর আছে, তারপরও খানিকটা সুস্থ আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। কিন্তু রানার মনে হলো ওকে যেন ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে—হাত-পা আড়ষ্ট, সর্বগ্রাসী ব্যথা পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত কামড়ে ধরেছে। ঘুম হয়েছে সামান্য, প্রায় সারারাতই তো জঙ্গলে হাঁটা-চলা করতে হয়েছে ওকে।

পাসকেলকে বলল, 'একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। জঙ্গলে থাকতে পারি আমরা, সেটাই নিরাপদ। কিন্তু পথ তৈরি করে এগোতে হবে, ফলে সময় লাগবে বেশি। আর যদি ট্রেইল ধরে এগোই, দ্রুত হাঁটতে পারব—তবে চিকলেরোদের সামনে পড়ে যেতে পারি। আপনি কি বলেন?'

পাসকেল জানতে চাইল, 'এই হেনেসটা কে বলুন তো? তার কথা আগে তো কখনও শুনিনি।'

'সে অনেক কথা, ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আপনি শুধু জেনে রাখুন হেনেস আমাদের জন্যে সাডেন ডেথ—অকস্মাৎ মৃত্যু। চিকলেরোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে।'

'আমি চিনি না এমন একজন লোক কেন আমাকে খুন করবে?'

'রয় হেনেস মাফিয়া ডন,' বলল রানা। 'ওয়াশওয়ানোকের গুপ্তধন লুঠ করতে এসেছে। গুপ্তধন বলুন, আর্টিফ্যাক্ট বলুন, খোলা বাজারে ওগুলো কয়েকশো কোটি ডলারে বিক্রি হবে। আরও অনেক কম টাকার জন্যে ওই লোক বহু মানুষকে খুন করেছে।'

'আপনি বলছেন তার নির্দেশেই হেলিকপ্টারটা স্যাবোটাজ করা হয়েছে? ঠিক আছে, বুঝলাম, হেনেস আমাদের শত্রু। এ-ও বুঝলাম যে ট্রেইলে আমাদের বিপদ হতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় আবার জঙ্গলে ঢুকি।'

ম্যাপ বের করল রানা। ওয়াশওয়ানোক থেকে পাঁচ মাইল বা তার কিছু বেশি দূরে রয়েছে ওরা। আগে থেকেই জানে, শহরটার আশপাশের জঙ্গল অস্বাভাবিক ঘন, পেরুতে দু'দিন বা তারও বেশি সময় লাগবে। কিন্তু সঙ্গে যে পানি আছে তা দু'দিন প্রাণ ধারণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তার ওপর, পাসকেল

একটা বিরাট সমস্যা। না, জঙ্গল কেটে এগোতে হলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। পাসকেলকে হয়তো বাঁচানোই যাবে না। ট্রেইল ধরে গেলে শহরটায় পৌঁছুতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা লাগবে ওদের।

যুক্তির ধারায় রানার মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগল। ট্রেইলটা নিশ্চয়ই চিকলেরোদের দিয়ে হেনেসই তৈরি করিয়েছে। কেন? সহজ উত্তর, ওয়াশওয়ানোকের ওপর নজর রাখার জন্যে, ওখানে অনায়াসে আসা-যাওয়া করার জন্যে। তারমানেই হলো, ট্রেইল ধরে চিকলেরোরা সারাক্ষণ আসা-যাওয়া করছে। এখানে ওদের ক্যাম্প ফেলার কারণটাও পরিষ্কার, হেনেস পানি বা সিনোটের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে।

ট্রেইল ধরে এগোলে চিকলেরোদের সঙ্গে দেখা হবেই। তাদের কাছে অস্ত্র আছে। অচেনা কাউকে দেখামাত্র গুলি করে ফেলে দেয়ার নির্দেশও নিশ্চয় আছে।

সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুবই কঠিন। তবু ট্রেইল ধরেই এগোবে বলে ঠিক করল রানা। একা জঙ্গল কেটে এগোনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তাছাড়া, ট্রেইলে কারও সঙ্গে ওদের দেখা না-ও হতে পারে। রানার সিদ্ধান্ত শুনে মাথা ঝাঁকাল পাসকেল। 'ধন্যবাদ, মি. রানা।'

ট্রেইলে সাবধানে পা রাখল ওরা, উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু দেখল না, হেনেসের ক্যাম্পকে পিছনে ফেলে ক্রমশ দূরে সরে আসছে। চোখ নামিয়ে রাখল রানা, নানা ধরনের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারল ট্রেইলটা ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়েছে। নরম মাটিতে পায়ের ছাপ আছে। দু'বার সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পেল। বিয়ারের খালি ক্যান আর চুইংগামের মোড়কও দেখল। সবই প্রথম এক ঘণ্টায়।

এ-সব দেখে স্বভাবতই ভয় পাচ্ছে রানা। তবে ওকে আতঙ্কিত করে তুলছে পাসকেলের অসুস্থতা। প্রথম দিকে রানার পাশে থাকতে পারছিল, তারপর পিছিয়ে পড়তে শুরু করল। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছেই শুধু। কাজেই বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে রানাকে। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ছে সে। চোখ খুলির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ির নিচে মুখের চামড়া বিবর্ণ। প্রতিটি নড়াচড়ায় সময় নিচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গি আছাড় খেয়ে পড়া থেকে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাক্ষণ হাত ঘষছে বুকে।

রানা যে তাকে হাঁটতে সাহায্য করবে, তারও উপায় নেই। ট্রেইলটা এক লাইনে লোক চলাচলের মত সরু করে তৈরি, পাশাপাশি দু'জনের জায়গা হবে না। প্রথম ঘণ্টায় পৌনে এক মাইল এগোল ওরা। ট্রেইল ধরে যাক আর জঙ্গল ধরে, ওয়াশওয়ানোকে পৌঁছুতে অনেক সময় লাগবে ওদের।

ওরা ধরা পড়ে গেল এই মন্থর গতির জন্যেই। রানা ধারণা করেছিল সামনের দিক থেকে আসা কোন চিকলেরোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ওদের। যথেষ্ট সতর্কও ছিল ও। যেখানেই ট্রেইলটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে,

প্রতিবার বাঁকের মুখে থেমে ওদিকে কি আছে দেখে নিয়েছে।

বিপদে ওরা পা ফেলেনি, সেটা ওদের ঘাড়ে এসে পড়ল পিছন থেকে। ধরে নিতে হয়, হেনেসের ক্যাম্প থেকে খুব সকালেই একজন চিকলেরো রওনা হয়েছিল, প্রায় ওরা যে-সময় রওনা হয়। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর নয় সে, অসুস্থও নয়, কাজেই স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে এলেও ওদেরকে ধরে ফেলল। পিছন দিকে খেয়াল রাখেনি বলে পাসকেলকে রানা দায়ী করতে পারে না, নিজেকে খাড়া রাখতেই জান বেরিয়ে যাচ্ছে বেচারার। কাজেই লোকটা ওদেরকে চমকে দিতে পারল।

স্প্যানিশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হে, কমপানেরো!' রানা ঘুরে দাঁড়াতেই আঁতকে উঠে ঈশ্বরের নাম নিল, সেই সঙ্গে নিস্তব্ধ জঙ্গলে রাইফেলের বোল্ট টানার ধাতব শব্দ হলো। রাইফেল খাড়া করে শূন্যে একটা গুলি করল সে, সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওদেরকে। লোকটা তেমন লম্বা নয়, তবে সঙ্গে রাইফেল থাকায় দশ ফুট উঁচু লাগছে। ওদের পরিচয় জানে না, সেজন্যেই ইতস্তত করছে এখনও। তবে জানে এই ট্রেইলে অচেনা কারও থাকার কথা নয়।

দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলল লোকটা, তারপর ওদের দিকে রাইফেল তাক করল। এরপর চোখের নিমেষে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। ঘুরে রানার সঙ্গে ধাক্কা খেলো পাসকেল। 'ছুটুন!' কর্কশ গলায় বলল সে। বলতে যা দেরি, ট্রেইল ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। একটা গুলি হলো, গাছের খানিকটা ছাল ছিটকে পড়ল রানার সামনের ট্রেইলে। সেই সঙ্গে চিৎকার করে ওদেরকে থামতে বলল লোকটা।

হঠাৎ করেই খেয়াল করল রানা, ও শুধু ওর বুটের আওয়াজ পাচ্ছে। পাসকেলের কথা ভেবে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ঘুরতেই দেখতে পেল ট্রেইলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে সে। ছুটে তার কাছে চলে এল চিকলেরো, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছে। পাসকেলের মাথার কাছে থামল সে। পাসকেল মাটি আঁচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। চিকলেরো গুলি করছে না, রাইফেল মাথার ওপর তুলে পাসকেলের খুলিতে বাড়ি মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রানার কিছু করার নেই। হাতে ম্যাচেটি আছে, সেটাই ছুঁড়ে মারল। ম্যাচেটির হাতলটা যদি লাগে, কিংবা ব্লেডের চ্যাপ্টা দিকটা, যে-কোন লোক অন্তত তাল হারিয়ে পড়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু না, ম্যাচেটির ডগাটা আঘাত করল, পাঁজর ভেদ করে প্রায় পুরোটাই ঢুকে গেল ভেতরে।

মুখ খুলে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, বিস্ফারিত চোখে অবিশ্বাস। বিষম খাবার মত আওয়াজ বেরুল গলা থেকে, থেমে থেমে। মাথার ওপর তোলা রাইফেলটা খসে পড়ল হাত থেকে। তারপর ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু দুটো, পড়ল সরাসরি পাসকেলের গায়ে।

রানা লোকটাকে মেরে ফেলতে চায়নি। ছুটে এসে দেখে এরইমধ্যে মারা গেছে। ক্ষতটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে পাসকেলের শার্ট। ধাক্কা দিয়ে পাসকেলের গা থেকে লাশটা সরাল ও। 'আপনার কোথাও লাগেনি

তো?' ঝুঁকে পাসকেলকে তুলতে চাইছে।

'গড!' দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরল পাসকেল। 'আমি শেষ!'

ট্রেইলের দু'দিকে দ্রুত চোখ বুলাল রানা। কোন সন্দেহ নেই, গুলির শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা গেছে। 'আসুন, ট্রেইল থেকে সরে যাই—জলদি!' পাসকেলের হাত থেকে খসে পড়া ম্যাচেটিটা তুলে নিয়ে ট্রেইলের পাশের জঙ্গল কাটছে ও। ঘন ঝোপের ভেতর দশ ফুট এগোল। পাসকেল হাঁটতে পারছে না, তুলে আনতে হলো তাকে।

সদ্য ফাঁক করা সরু জায়গাটায় শুয়ে থাকল পাসকেল। মুখটা বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে। কি বলছে শোনার জন্যে ঝুঁকল রানা। 'আমার বুক—ভীষণ ব্যথা করছে।'

তার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে পানি খাওয়াল রানা। 'আসছি,' বলে ট্রেইলে ফিরে এল আবার, ঝোপের ভেতর টেনে এনে লাশটা লুকিয়ে রাখল। ট্রেইলের ওপর রক্ত জমে আছে, মাটি আর ধুলো ছড়াতে চাপা পড়ে গেল সব। রাইফেলটা নিয়ে ফিরে এল পাসকেলের কাছে।

একটা গাছে হেলান দিয়েছে পাসকেল, বুকটা দু'হাতে জড়ানো। অলস ও ভারী চোখের পাতা তুলে জোর করে হাসল। 'আর হয়তো সময় পাব না, ধন্যবাদটা দিয়ে রাখি। আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন, মি. রানা। তবে কোন লাভ নেই।'

'কেন, এত মুষড়ে পড়ছেন কেন?' তার পাশে বসল রানা।

'আপনাকে এতক্ষণ জানতে দিইনি,' ফিসফিস করল পাসকেল। 'শুধু যে পাঁজরের হাড় ভেঙেছে তা নয়, হাড়গুলো ফুসফুসে ঢুকে পড়েছে।' রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়িয়ে নেমে আসছে ঠোঁটের কোণ থেকে।

'ফর গড'স সেক! বলেননি কেন? আমি ভেবেছি দাঁত ভেঙে যাওয়ায় রক্ত বেরুচ্ছে।'

'বললে কি লাভ হত?' হাসল পাসকেল, রানাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে অদ্ভুত এক ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে বুক থেকে।

চুপ করে থাকাটাও অস্বস্তিকর, অথচ রানার কিছু বলার নেই।

'ওয়াশওয়ানোকে আমার যাওয়া হচ্ছে না,' বিড়বিড় করল পাসকেল। 'দেরি করবেন না—আপনি যান।'

'থামুন! আপনাকে আমি এত সহজে হাল ছাড়তে দেব না।' কোথায় যাচ্ছে পাসকেলকে বলল না, লাশটার কাছে ফিরে এল রানা। পানির বোতল আর একটা ন্যাপস্যাক পেল, বোতলটায় প্রায় আধ গ্যালন পানি আছে। পকেট হাতড়ে পেল দেশলাই, সিগারেট, সুইচ-ব্লেড নাইফ, আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। ন্যাপস্যাকে রয়েছে নোংরা কাপড়চোপড়, টিনে ভরা শুকনো মাংস, শক্ত চামড়া হয়ে যাওয়া দু'খানা আটার রুটি, এক কৌটা জেলি।

ফিরে এসে পাসকেলকে বলল, 'পেটে কিছু পড়লে চাঙা হয়ে উঠবেন। নিন, শুরু করুন।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পাসকেল। 'আমার খিদে নেই। স্যার, নিশ্চয়ই কোন পুণ্য করেছিলাম, তাই এরকম সময়ে আপনাকে পেয়েছি।' এর আগে রানাকে একবারও স্যার বলেনি সে। 'কিন্তু এখনও যদি আপনাকে দেরি করিয়ে দিই, আমার পাপ হবে। নিজে তো বাঁচবই না, আপনাকেও মেরে ফেলা হবে। আপনি যান, প্লীজ। এক্ষুণি রওনা হন।'

'যত খুশি বকবক করুন, আপনাকে ফেলে কোথাও আমি যাচ্ছি না।' ছোট এক টুকরো মাংসের টুকরো নিয়ে পাসকেলের মুখে গুঁজে দিতে যাচ্ছে রানা, পারল না। পাসকেলের মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ল, তীব্র ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

এতক্ষণে বিশ্বাস হলো রানার, পাসকেল সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছে। তার গালের মাংস এত বেশি ঝরে গেছে, মুখটাকে খুলির একটা বর্ধিত অংশ মনে হচ্ছে। কলকল করে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট থেকে, মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা রাঙা হয়ে উঠল।

কে বিপদের তোয়াক্কা করে, এই অবস্থায় একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ফেলে যেতে পারে না। পাসকেলকে ভাল করে শোয়াল রানা, উৎসাহ আর অভয় দিয়ে দু'একটা কথাও বলল।

পানি বা শক্ত কিছু খেতে রাজি নয় পাসকেল। জ্বরটা আবার তার বাড়ল। মাঝে মধ্যে প্রলাপ বকছে। তবে এক ঘণ্টা পর চেতনা আবার পুরোপুরি ফিরে পেল। 'স্যার, আপনি কখনও মেক্সিকোর টাকসানে গেছেন?'

'না, পাসকেল, যাইনি,' বলল রানা। 'আপনি শুধু আমার নাম ধরুন, আমি যেমন ধরছি।'

'যাননি, কিন্তু কোনদিন কি যাবেন, রানা?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ, পাসকেল। টাকসানে যাব।'

'তাহলে আমার বোনের সঙ্গে দেখা করবেন,' বলল পাসকেল। 'বলবেন কেন আমি ফিরছি না।'

'বলব,' নরম সুরে প্রতিশ্রুতি দিল রানা। 'আপনি যদি আমার সঙ্গে না থাকেন।'

'বিয়ে করিনি,' ফিসফিস করল পাসকেল। 'কোন বান্ধবীও কোন কালে ছিল না—মানে, সিরিয়াসলি কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি। চারদিকে ছটফট করে বেড়িয়েছি, সেটাই কারণ। কিন্তু আমি আর আমার ওই বোন···' অতীত স্মৃতি, নিশ্চয়ই মধুর, স্মরণ করে হাসছে সে, '···কি বলব, সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠ ছিলাম।'

'তাকে আমি আপনার সব কথাই বলব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজল পাসকেল, আর কিছু বলল না। আধ ঘণ্টা পর এমন কাশি শুরু হলো, থামতেই চায় না। দশ মিনিট পর মারা গেল সে।

নয়

পাসকেল মারা যাবার খানিক পরই শুরু হলো ব্যাপারটা। পাগলা কুত্তার মত রানাকে ধাওয়া করল ওরা।

মরা একজন মানুষের জন্যে কারুরই কিছু করার থাকে না, আবার থাকেও। একটা লাশেরও চাহিদা আছে—সম্মান ও নিরাপত্তা। রানা তো আর পাসকেলকে লাশখেকো পশুদের খোরাক হিসেবে ফেলে যেতে পারে না। কিন্তু পাসকেলের ম্যাচেটি দিয়ে কবর খুঁড়তে গিয়ে দেখল একটু নিচেই পাথর। কাজেই বাধ্য হয়ে চিৎ করে শুইয়ে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে রাখল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'বিদায়।' তারপর বেরিয়ে এল ট্রেইলে।

দুটো ভুল করল রানা। আরেকটা করতে যাচ্ছে। প্রথম ভুল কবর খুঁড়তে যাওয়াই উচিত হয়নি। চিকলেরোরা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা একটা লাশ দেখলে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেই পারত না। মরা মানুষ নিজের জন্যে কবর খুঁড়তে চেষ্টা করে না। মরার পর সে এমন সুন্দর ও গোছাল ভঙ্গিতে শুয়েও থাকে না।

তৃতীয় ভুলটা হলো নিহত চিকলেরোর সমস্ত জিনিস চুরি করা। প্রতিটি জিনিস প্রাণধারণের জন্যে জরুরী প্রয়োজন, ফেলেই বা যায় কিভাবে। রাইফেল, বান্ডিলে মোড়া কার্টিজ, নতুন চকচকে একটা ম্যাচেটি, কাঁধের ব্যাগ, পকেটের সমস্ত জিনিস, কিছুই বাদ দিল না। কাপড়চোপড়ও খুলছে, ছদ্মবেশের কাজে লাগবে। এই সময় ট্রেইল থেকে লোকজনের গলা ভেসে আসায় ভয় পেয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। মাথায় একটাই চিন্তা, পালাও, হে, পালাও। ধরতে পারলে স্রেফ জ্যান্ত পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।

লাশগুলো ওরা তখুনি দেখতে পেল, নাকি পরে, বলতে পারবে না রানা। সামনের জঙ্গলে যে দিকেই পা ফেলার মত ফাঁক বা জায়গা পেয়েছে সেদিকেই ছুটছে ও। এভাবেই কেটে গেল দিনের বাকি অংশ। অচেনা একটা ভীতিকর জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। তারপর মনে পড়ল, ওয়াশওয়ানোক শহরটা পশ্চিম দিকে কোথাও। কিন্তু ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে।

রাতটা একটা গাছে উঠে কাটাল রানা।

অদ্ভুত মনে হলেও, হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করার পর এখনই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে ও। সঙ্গে খাবার আছে, পানি আছে আধ গ্যালন, নতুন ম্যাচেটিটায় অসম্ভব ধার, সবচেয়ে কাজের জিনিস রাইফেলটা। ইতিমধ্যে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর পাসকেল সঙ্গে না থাকায় রানার কোন পিছুটানও নেই।

সকালে আলো ফুটতেই পশ্চিম দিকে রওনা হলো রানা, আশা ট্রেইলটা পেয়ে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এল, তারপর সন্দেহ হলো

মারাত্মক কোন ভুল করে বসেছে। ও খুব ভাল করেই জানে যে ট্রেইলটা খুঁজে না পেলে ওয়াশওয়ানোকে কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না, খাবার আর পানি শেষ হয়ে গেলে জঙ্গলের কোথাও ওর কঙ্কাল পড়ে থাকবে। ট্রেইলটা তো পেলই না, তার বদলে একটা চিৎকার শুনতে পেল, তারপরই গর্জে উঠল রাইফেল।

বুলেটটা মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল, যাবার পথে ছিঁড়ে গেল ঝোপের কিছু পাতা। ঘুরেই ছুটল রানা, ঘন জঙ্গলের ভেতর যত জোরে সম্ভব। সেই থেকে শুরু হলো বিচিত্র, মন্থরগতি ধাওয়া। এদিকের জঙ্গলে মাটি বলে কিছু নেই, সবুজ ঝোপ শাখা-প্রশাখা দিয়ে সব ঢেকে রেখেছে, পাতা আর ডালপালা ভেজা ভেজা। জঙ্গল এত ঘন, কেউ ঠিক দেড় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে দেখা যাবে না, যদি সে স্থির থাকে।

এরকম একটা জঙ্গলে শব্দ না করে ছোটা সম্ভব নয়। তবে রানা একা নয়, চিকলেরোরাও শব্দ করছে। জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসছে তারা, পরস্পরের উদ্দেশে চিৎকার করছে। আরও দুটো গুলি হলো, তবে একটাও রানার কাছাকাছি এল না। খানিক পর একটা বুদ্ধি গজাল রানার মাথায়। জঙ্গলের সবচেয়ে ঘন একটা অংশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলেই তো হয়।

তাই করল রানা। গায়ে গায়ে নিশ্ছিদ্রভাবে লেগে থাকা সবুজ পাতার অসংখ্য স্তর ওকে ঢেকে রেখেছে, কার সাধ্য খুঁজে বের করে। ঘামে ভেজা তালুতে রাইফেলটা শক্ত করে ধরে আছে ও, তবে একচুল নড়ছে না। চিকলেরোদের হৈ-চৈ দূরে মিলিয়ে গেল এক সময়। তবু রানা নড়ছে না। ও যা করছে, চিকলেরোদের একজন হয়তো ঠিক তাই করছে—ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষায় আছে রানা নড়লে যাতে দেখতে পায়। কাজেই পুরো এক ঘণ্টা রানা নড়ল তো নাই-ই, জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলল না। এক ঘণ্টা পর সাবধানে রওনা হলো—পশ্চিম দিকে।

আগে থেকে কিছুই টের পায়নি, ঝোপ কেটে এগোচ্ছে, হঠাৎ দেখতে পেল সামনে একটু ফাঁক, ডালপালা না কাটলেও চলে; এক পা বাড়াতেই উপলব্ধি করল ট্রেইলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাগ্যই বলতে হবে যে সরু পথটার দু'দিকে কেউ নেই। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল রানা, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচটা বাজে। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। খোলা ট্রেইল ব্যবহার করা উচিত হবে কি? দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আবার পা ফেলল ট্রেইলে। হাতে ম্যাচেটি রাখার আর কোন দরকার নেই, সেটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখে কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে রাখল রাইফেলটা। ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে, তবে সাবধানে।

এবার ও-ই একজন চিকলেরোকে চমকে দিল। ওর দিকে পিছন ফিরে ট্রেইলের ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। শব্দ না করে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কিন্তু লোকটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে। তৈরিই ছিল রানা, তার পায়ের কাছে একটা গুলি করল। চোখের পলকে পড়ে গেল লোকটা, গড়ান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে। পরমুহূর্তেই পাল্টা গুলি

হলো, এত কাছ থেকে যে চমকে ওঠা মুখে বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল রানা।

ট্রেইল থেকে লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ও। আবার শুরু হলো সেই লুকোচুরি খেলাটা। সবুজ একটা বেষ্টনীর ভেতর ঢুকল রানা। গায়ে গায়ে সেঁটে থাকা পাতা আর ডালপালা কয়েক স্তর পুরু পাঁচিল বললেই হয়, বাইরে থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। আশপাশ থেকে চিকলেরোরা চিৎকার করছে, শুনে মনে হলো ওকে খুঁজে বের করার চেয়ে পরস্পরকে অভয় দেয়াতেই বেশি ব্যস্ত তারা। কারণটাও পরিষ্কার, তাদের একজন বন্ধুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে—বুকে ম্যাচেটি গেঁথে। তাছাড়া, এই মাত্র রানা ওদেরকে গুলিও করেছে। অসহায়, নিরস্ত্র লোকজনকে খুন করতে অভ্যস্ত চিকলেরোরা, অভ্যস্ত বেয়াড়া বন্ধুকে পিছন থেকে ছুরি মারতে। অচেনা শত্রু খুন করার ইচ্ছা নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই ভয় তো পাবেই। রানা তাদের চেঁচামেচি শুনে বুঝতে পারছে, একসঙ্গে রয়েছে তারা, দল ভাঙছে না।

সন্ধের ঠিক আগে হাল ছেড়ে দিয়ে ট্রেইলে ফিরে গেল তারা, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল সমস্ত শব্দ। ওখানে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা-ভাবনা করল রানা। সারাদিনে দুটো দলের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। তিন কি চারজনের দল। তবে প্রথম চিকলেরো লোকটা ছিল ব্যতিক্রম, যাকে রানা খুন করেছে—একমাত্র সেই ছিল একা। এর মানে হলো, পাসকেলের লাশটা পেয়ে গেছে হেনেস, লাশ পাবার পর আন্দাজ করে নিয়েছে তার সঙ্গে কে ছিল। রানা নিশ্চিত হেলিকপ্টার স্যাবোটাজ করার পিছনে হেনেসের হাত ছিল, কাজেই এ-ও হয়তো সে জেনে নিতে পারবে পাইলটের সঙ্গে কে ছিল। সেজন্যেই ট্রেইলে চিকলেরোদের পাঠিয়েছে সে, রানা যাতে ওয়াশওয়ানোকে ফিরতে না পারে।

দিনের আলো সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ট্রেইলে বেরিয়ে এসে আবার হাঁটছে রানা। খানিক পরই রাত নামল। চিকলেরোদের হাতে ধরা পড়লে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে ও, বাঁচার একমাত্র উপায় যেভাবে হোক ওয়াশওয়ানোক ক্যাম্পে পৌঁছানো। রাতের জঙ্গলে নড়াচড়া করা বিপজ্জনক, তবু রানা গোমার কথা ভাবছে না। শহরে থেকে দূরত্ব যত কমিয়ে আনতে পারবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

কিন্তু বাদ সাধল আগুনটা। ট্রেইলের পাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে চিকলেরোরা, আগুনটা জ্বেলেছে ট্রেইলের ঠিক মাঝখানে। জেগে আছে সবাই, বসে বসে গল্প করছে। ট্রেইল এড়াতে হলে জঙ্গলে ঢুকতে হবে, রাতের অন্ধকারে তা সম্ভব নয়। কাজেই বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে ট্রেইলের পাশেই একটা গাছে চড়তে হলো ওকে। যথেষ্টই পিছিয়ে এসেছে, হাঁচি বা কাশি দিলে চিকলেরোরা শুনতে পাবে না। রাতে মশার কামড়ে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারল না।

সকালে ট্রেইল থেকে আরও অনেকটা দূরে এসে অন্য একটা গাছে চড়ল রানা। চল্লিশ ফুট ওপরে মোটা ডালপালা একটা প্লাটফর্ম বানিয়ে রেখেছে.

সেটার নিচে পাতার আবরণ এত ঘন যে মাটি থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত, প্রতিটি গাছে চড়ে ওকে খোঁজা সম্ভব নয়।

শরীরটা ক্লান্ত ও দুর্বল, সারাটা দিন বিশ্রাম আর ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিল রানা। ঠিক করেছে চব্বিশ ঘণ্টা এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নড়বে না।

সবটুকু পানি আর খাবার রাতেই শেষ হয়ে গেল। তবে ঘুমটা খুব ভাল হলো। সকালে পানির বোতল, ন্যাপস্যাক ইত্যাদি গাছের ডালে রেখেই নিচে নামল রানা। সঙ্গে শুধু রাইফেল, ম্যাচেটি আর ছুরিটা নিয়েছে। কার্ট্রিজের বান্ডিলটাও সঙ্গে রাখেনি, পকেটে শুধু ছয় রাউন্ড বুলেট আছে।

ট্রেইল ধরে চিকলেরোদের অস্থায়ী ক্যাম্পটাকে পার হয়ে এল রানা। আগুনটা এখনও নেভেনি, তারমানে মাত্র কিছুক্ষণ আগে রওনা হয়েছে তারা। কিন্তু কোন দিকে গেছে? সামনে, নাকি পিছনে? যেদিকেই যাক, গ্রাহ্য না করে সামনের দিকে এগোল রানা। মাঝখানে একবার থেমে ম্যাপ দেখে নিল। আন্দাজ করল ওয়াশওয়ানোক থেকে আর মাত্র তিন মাইল দূরে রয়েছে ও।

এবারও রানাই তাদেরকে প্রথম দেখতে পেল। না, প্রথমে তাদের গলা শুনতে পেল। ট্রেইল ধরে এক লাইনে হেঁটে আসছে চারজন, নিজেদের মধ্যে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে। কয়েদীরা যেমন হয়, প্রত্যেকেরই হিংস্র চেহারা, হাতে একটা করে রাইফেল। আওয়াজ পেয়েই ট্রেইল থেকে সরে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে রানা, তবে খুব একটা পিছায়নি। চিকলেরোরা পাশ ঘেঁষে চলে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালও না। তাকালে হয়তো দেখতে পেত ওকে।

তারা চলে যেতেই আবার ট্রেইল ধরল রানা, হন হন করে হাঁটছে। এভাবে দু'ঘণ্টা হাঁটার পর হঠাৎ দেখল ট্রেইলটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে বাম দিকে। সাবধানে বাঁকটা ঘুরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ও। একশো গজ এগিয়ে এসে দেখল সামনে একটা ফাঁকা জায়গা। দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। তারপর ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ওর ডান দিকে, সামান্য উঁচু একটা মাটির ঢিবিতে শুয়ে রয়েছে এক লোক, একজন চিকলেরো। চোখে বিনকিউলার, দূরে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। ধীরে ধীরে রাইফেলটা তার দিকে তাক করল রানা। চোখ থেকে বিনকিউলার না সরিয়েই লোকটা কথা বলে উঠল, 'এস উস্টেড, পেড্রো?'

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'সাই।' সাই মানে হ্যাঁ।

'সিগার রিলোস?'

ব্যাটা সিগারেট চাইছে, শুনে কোন রকমে হাসি চাপল রানা। 'সাই,' বলে ঢাল বেয়ে ঢিবির ওপর উঠল ও, দাঁড়াল লোকটার মাথার সামান্য পিছনে। লোকটা চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে হাত পাততে যাবে, উল্টো করা রাইফেলটা তার মাথার ওপর সবেগে নামিয়ে আনল রানা।

লোকটা মরল কি জ্ঞান হারাল, পরীক্ষা না করেই বিনকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল রানা। ওর সামনে লাফ দিয়ে উঠে এল ওয়াশওয়ানোক শহর

আর ওদের তিন নম্বর ক্যাম্প, টিবি থেকে সিকি মাইল দূরেও নয়।

শহরে ঢোকার সময় প্রথমে ওকে দেখতে পেল বিগ কার্ল। হেঁড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিল সে। নিজের কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'রানা, মাই ডিয়ার বয়!' অপ্রত্যাশিত আবেগে রানাকে তিনি আলিঙ্গন করলেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম···'

গরম আর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সারল রানা। বিছানায় শুয়ে প্রচুর পানি খেলো। একটা ক্যাম্প চেয়ারের পাশেই বসে আছেন প্রফেসর বেলফোর্স, মন দিয়ে রানার কথা শুনছেন। প্রায় এক হপ্তা জঙ্গলে ছিল রানা, এই সাতদিনের প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করতে সময় নিল মাত্র বিশ মিনিট। সবশেষে বলল, 'রয় হেনেস আমাদের ওপর নজর রাখছে। হেলিকপ্টারটা অ্যাক্সিডেন্ট করেনি, ওটাকে স্যাবোটাজ করা হয়েছে। রেডিওরুমের আগুনটাও স্যাবোটাজ। এক নম্বর ক্যাম্প থেকে বড় হেলিকপ্টার আর মেক্সিকো সিটি থেকে আপনার জেট উড়তে পারছে না, সে-ও ওই একই কারণে—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। এসবের মানে বুঝতে পারছেন তো? আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।'

'হেনেসের সঙ্গে আপনি কতজনকে দেখেছেন?' জানতে চাইলেন বেলফোর্স, থমথম করছে চেহারা।

'পঁচিশ-ত্রিশজনকে,' বলল রানা। 'তবে সবাইকে না-ও দেখে থাকতে পারি। এরপর ওরা কি করবে বুঝতে পারছেন তো?'

'কি?'

'ব্যাপারটা তো পরিষ্কারই। ওরা আমাদেরকে হাইজ্যাক করবে, প্রফেসর। সিনোট থেকে আমরা যা উদ্ধার করেছি, হেনেস ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। ওগুলো সব এখনও এখানে আছে তো?'

প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন। 'আমার উচিত ছিল আগেই সব পাঠিয়ে দেয়া।' চেয়ার ছেড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। 'সিনোট থেকে আমরা কি তুলেছি হেনেস তা জানল কিভাবে? কে তাকে বলল?'

'এ প্রশ্ন আমারও,' বলল রানা। 'আমি আরও একটা কথা ভাবছি। হেলিকপ্টার স্যাবোটাজ করার পর প্রায় এক হপ্তা পেরিয়ে যাচ্ছে, হেনেস এখনও আমাদের ক্যাম্পে হানা দেয়নি কেন? কেন সে অপেক্ষা করছে?'

'তাহলে সে হয়তো জানে না এখানে ঠিক কি পেয়েছি আমরা।' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন প্রফেসর। 'মি. রানা, ইয়াম চ্যাচ মন্দির থেকে আলফাঁসো বিপুল গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। তাকে আমি খুঁড়তে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তারপরও খোঁড়ে। গোপন একটা টানেল আবিষ্কার করে সে, শেষ মাথায় দুটো বিশাল গুহার ভেতর পেয়েছে ওগুলো। অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট, মি. রানা। এরকম আগে কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'এখন তাহলে কি করা হবে? হেনেস এলে সব তার হাতে তুলে দেবেন?'

'আলফাঁসোকে ডাকি, সে কি বলে শোনা যাক,' বললেন প্রফেসর।

রানার আশঙ্কা শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল রিমরিগো। 'আপনারা

কাল্পনিক আতঙ্কে ভুগছেন। এরকম কিছু ঘটবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

রানা বলল, 'জঙ্গল থেকে একটু হেঁটে আসুন, কাল্পনিক বুলেট খেলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'আমার ধারণা, আপনার অবহেলায় পাসকেল মারা গেছে,' বলল রিমরিগো। 'সেটা চাপা দেয়ার জন্যে আপনি আমাদেরকে অহেতুক ভয় দেখাচ্ছেন।'

'আলফাঁসো, মুখ সামলে কথা বলো!' ধমক দিলেন বেলফোর্স।

এই প্রথম অপ্রত্যাশিতভাবে মারিয়াও স্বামীকে আক্রমণ করল। 'হ্যাঁ, বুঝে-শুনে কথা বলো, আলফাঁসো। তোমার আচরণে আমি অসুস্থ বোধ করছি।'

স্ত্রীর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রিমরিগো। 'কি? মানে? তুমি কি আবার মি. রানার পক্ষ নিচ্ছ?'

'এখানে পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু নেই—কখনও ছিলও না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল মারিয়া। 'কে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করছে, জানি না—তবে জানি রানা করছেন না।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দুঃখিত, রানা।'

'আমার স্ত্রী হয়ে ওর কাছে ক্ষমা চাও তুমি?' গর্জে উঠল রিমরিগো। 'তাও আমার হয়ে?'

'তোমার হয়ে নয়, আমি নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইছি—ওনার কথায় আগে কান দিইনি বলে,' তীক্ষ্ণস্বরে বলল মারিয়া। 'এখন তুমি চুপ করে থাকো, তা না হলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। প্রফেসর কি বলেন শুনি আমরা।'

চুপ হয়ে গেল রিমরিগো। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল বিগ কার্ল। 'আমি মনে করি, এই রয় হেনেস যদি চিকলেরোদের নিয়ে দল পাকিয়ে থাকে, সেটা সাংঘাতিক একটা দুঃসংবাদ। আমি, স্মিথ বা ফাউলার গুলি খেয়ে মরার চুক্তিতে এখানে আসিনি।' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো বাকি দু'জন লোক তাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল।

'চুক্তিতে কি ছিল সে-কথা ভুলে যান,' বলল রানা। 'প্রফেসর আপনাদেরকে জেনেশুনে এই বিপদে ফেলেননি। এখানে আমরা আলোচনায় বসেছি এখন কি করা হবে তা ঠিক করার জন্যে।'

প্রফেসর বললেন, 'একটাই কাজ করার আছে। সে যদি সব নিয়ে যেতে চায়, যাক নিয়ে।'

স্মিথ আর ফাউলার দোরগোড়া থেকে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল। কার্ল বলল, 'আমিও তাই বলি।'

মারিয়া কিছু বলল না, তার ঠোঁট জোড়া শুধু পরস্পরকে চেপে ধরল।

রিমরিগো তীক্ষ্ণ চোখে সবাইকে লক্ষ করছে, কথা বলছে না।

'আপনারা কি সত্যি এত বোকা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এক টন ওজনের সোনার চেইনটা সহ এখানে আমরা যা আবিষ্কার করেছি তার দাম কত ভেবে দেখেছেন? আমি লোভ করতে বলছি না। বলতে চাইছি, ধনী একটা রাষ্ট্রের ট্রেজারিতে যে পরিমাণ টাকা থাকে সেই পরিমাণ টাকার জিনিস নিয়ে

হেনেস যখন চলে যাবে, তখন কি সে আপনাদের গালে চুমো খাবে? নাকি তার বিরুদ্ধে কেউ যাতে পরে কিছু করতে না পারে সে-কথা ভেবে সব ক'টাকে মেরে রেখে যাবে? সবাই নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না।'

এমন কেঁপে উঠলেন প্রফেসর, যেন কেউ তাঁকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়েছে। 'ওহ্, মাই গড!'

'আপনি বলতে চাইছেন আমাদেরকে সে খুন করবে···আমাদের সবাইকে?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কার্ল। 'সব আমরা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়ার পরও?'

'তার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনিও যদি তার মত খুনী হতেন?'

অকস্মাৎ সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করল। সবাইকে ছাপিয়ে উঠল কার্লের ভারী গলা, ভাগ্যকে অকথ্য ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছে। স্মিথ বলল, 'আমি এখান থেকে পালাচ্ছি।'

টেবিলে চাপড় মারল রানা, পটকা ফোটার মত আওয়াজ হলো। 'কেউ এখান থেকে নড়বেন না! সবাই চুপ!' নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবার চোখ রানার ওপর স্থির। স্মিথের দিকে আঙুল তাক করল ও। 'যাচ্ছেন, ভাল কথা; কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি, কোথায় যাচ্ছেন? জঙ্গলে ঢুকে দশ গজও এগোতে পারবেন না, গুলি খেয়ে মারা যাবেন। ঠিক আছে, ইচ্ছে হলে এবার আপনি যেতে পারেন।'

স্মিথ নড়ল না, নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা ঢোক গিলল।

ফাউলার বলল, 'যিশুর কিরে, স্মিথ, মি. রানা ঠিক কথাই বলছেন। পালানোর কথা ভুলে যাও।'

প্রফেসর বেলফোর্সকে অসন্তুষ্ট দেখাল। 'মি. রানা, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। হেনেস পাইকারীভাবে আমাদেরকে মেরে ফেলবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তার ভয় নেই? এত বড় অপরাধ করে কেউ কখনও পার পায়?'

'আগেও অনেকে পেয়েছে, হেনেসও পাবে,' বলল রানা। 'শুনুন, ব্যাখ্যা করছি। আমরা ছাড়া আর কেউ জানে হেনেস এখানে আছে? জানে না। খুন-খারাবিতে অভিজ্ঞ সে, তার নিজস্ব একটা অর্গানাইজেশন আছে। পরে যদি কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও, অন্তত একশো সাক্ষী কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবে পাইকারী খুনের ঘটনাটা যখন ঘটে তখন সে মেক্সিকো সিটিতে ছিল।'

মারিয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের লাশ যখন পাওয়া যাবে তখন তো তদন্ত হতে বাধ্য···'

'দুঃখিত, মারিয়া। কেউ আমাদের লাশ খুঁজে পাবে না। কুইনটানা রুতে পুরো একটা সেনাবাহিনীকে কবর দিন, কেউ কোন দিন খুঁজে পাবে না। আমরা স্রেফ নিখোঁজ হয়ে যাব।'

'আপনি নিজের কথায় নিজেই ফেঁসে যাচ্ছেন, রানা,' বলল রিমরিগো। 'কে জানে যে রয় হেনেস এখানে আছেন? আমরা জানি। আমরা কিভাবে

জানলাম? আপনি বলেছেন। আমি তাঁকে দেখিনি, আমাদের কেউই তাঁকে দেখেনি, শুধু আপনি বাদে। আমার ধারণা, এটাও আপনার আরেকটা মিথ্যেকথা।'

'কেন, মিথ্যে বলে আমার কি লাভ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল রিমরিগো। 'নিশ্চয়ই আপনার কোন বদ মতলব আছে। এই অভিযানে এসেছেনও তো এক রকম জোর করে, আপনাকে আমরা আনতে চাইনি। আমি লক্ষ করেছি, উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্টের কোনটার কত দাম জানার খুব আগ্রহ আপনার। আর কিছু বলার দরকার আছে কি?'

হেসে ফেলল রানা। তারপর বলল, 'আপনি শুধু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার অভিযোগ, আর্টিফ্যাক্টগুলো আমি একা পেতে চাইছি। সেক্ষেত্রে স্মিথকে আমি পালাতে বাধা দিলাম কেন? কেন আমি চাইছি সবাই একসঙ্গে থাকি?'

ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল কার্ল। 'ওহ্, যিশু!' রিমরিগোর দিকে তাকাল সে, চোখে তীব্র ঘৃণা। 'আপনার ওপর শয়তান ভর করেছে!' রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার কথা শেষ করুন, মি. রানা। আপনিই বলুন এখন আমাদের কি করা উচিত।'

'হেনেস আর বেশি দেরি করবে না,' বলল রানা। 'আমাদের কাছে অস্ত্র কি আছে?'

'একটা শটগান আর একটা রাইফেল,' বলল কার্ল। 'ওগুলো ক্যাম্প স্টোরের জিনিস। আর আমার কিটে আছে একটা হ্যান্ডগান, সেটা আমার নিজের।'

'আমারও নিজের রিভলভার আছে,' বলল ফাউলার।

বাকি সবার দিকে তাকাল রানা। 'আর কিছু নেই?'

প্রফেসর মাথা নাড়লেন। রিমরিগো কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। মারিয়া বলল, 'আলফাঁসোর কাছে একটা পিস্তল আছে।'

'একটা শটগান, একটা রাইফেল, তিনটে পিস্তল। মন্দ নয়। কার্ল, তোমার দৃষ্টিতে কোন কুঁড়ে ঘরটা সবচেয়ে সুরক্ষিত?'

'আপনি কি যুদ্ধ করার কথা ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল রিমরিগো। 'কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? শত্রু কোথায়? ঠিক আছে, ধরে নিলাম এখানে আছেন হেনেস—যুদ্ধ করে কি তাঁর সঙ্গে পারব আমরা? আমার ধারণা, আপনি একটা উন্মাদ।'

কেউ তার কথায় কান দিল না। কার্ল বলল, 'মি. রানা, স্যার, আপনার কুঁড়েটাই সবচেয়ে ভাল। ওটাই সিনোটের সবচেয়ে কাছাকাছি, কাজেই পিছন দিক থেকে ওটার কাছে ওরা আসতে পারবে না।'

খালি শেলফগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'আর্টিফ্যাক্টগুলো কোথায়?'

'সব প্যাক করে রাখা হয়েছে,' বললেন প্রফেসর। 'ভেবেছিলাম হেলিকপ্টার ফিরলে পাঠিয়ে দেব।'

'প্যাক খুলে আবার সব বের করতে হবে,' বলল রানা। 'ওগুলো ফেলে

দেয়াই আমাদের প্রথম কাজ।'

ঝট করে চেয়ার ছাড়ল রিমরিগো। 'তারমানে? আপনার উদ্দেশ্য কি? অমূল্য সম্পদ—ফেলে দেবেন?'

'হেনেস ওগুলো পেলে আমাদেরকে খুন করবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তাই ওগুলোকে আমি অমূল্য সম্পদ হিসেবে দেখছি না। হেনেস ওগুলো না পেলে সাতজন মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু ফেলবেন কোথায়?'

'যেখান থেকে তুলেছি—সিনোটে,' বলল রানা। 'ডাইভিং অপারেশন ছাড়া হেনেস ওগুলো তুলতে পারবে না। যদি চেষ্টাও করে, প্রচুর সময় লাগবে।'

রিমরিগো চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কাজ আপনি করতে পারেন না! পরে হয়তো আর তুলতেই পারব না আমরা।'

'কেন পারব না? আর যদি না-ও পারি, তাতেই বা কি আসে যায়? প্রাণে তো বেঁচে থাকব।'

'ফেলে দিন, সব ফেলে দিন,' কর্কশ সুরে রানাকে সমর্থন করল কার্ল। 'আমি টাকা চাই না, বাঁচতে চাই।'

কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রফেসরকে অনুরোধ করল রিমরিগো, 'স্যার, ওরা মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছে। প্লীজ, আপনি ভেটো দিন।'

বেলফোর্স মাথা নেড়ে বললেন, 'নেতৃত্ব এখন মি. রানার হাতে। উনি যা ভাল বোঝেন, তাই করবেন।'

'গুহা,' হঠাৎ বলল মারিয়া। 'ওগুলো আমরা গুহার ভেতর রাখব। হেনেস সিনোটে ডুবুরী নামালেও খুঁজে পাবে না।'

ঝট করে মাথা ঘোরাল রিমরিগো। 'গুহা?' তার চোখে সন্দেহ। 'গুহা কোথায় পেলে?'

'সিনোটের ষাট ফুট নিচে, পানির তলায়, একটা ফাঁক আছে,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ, মারিয়া। আইডিয়াটা দারুণ। ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

'আমি আপনাকে সাহায্য করব,' বলল মারিয়া।

'কার অনুমতিতে? দাঁতে দাঁত চাপল রিমরিগো। 'অনেক সহ্য করেছি, আর নয়! ওই লোকের সঙ্গে তোমাকে আমি সিনোটে নামতে দেব না।'

সরাসরি স্বামীর দিকে তাকাল মারিয়া। 'আমি তোমার অনুমতি চাইনি, আলফাঁসো। এখন থেকে তুমি আমাকে কোন ব্যাপারে নির্দেশ দেবে না, আমার যেটা ভাল মনে হবে সেটাই করব আমি। ওয়াশওয়ানোক তোমাকে ধ্বংস করে ফেলেছে, আলফাঁসো। এখন যেমন তোমাকে দেখছি, এই লোককে আমি চিনি না—অন্তত একে আমি বিয়ে করিনি। আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, আলফাঁসো।'

মারিয়াকে আঘাত করল রিমরিগো। চড় নয়, ঘুসি। মারিয়ার চোয়ালের

নিচে লাগল সেটা, কামানের গোলার মত ছুঁড়ে দিল ঘরের আরেক প্রান্তে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে খসে পড়ল মেঝেতে। টেবিলের বোতলটা হাতে নিতে একটু দেরি করে ফেলল রানা, তবে রিমরিগো মারিয়ার দিকে পা বাড়াবার আগেই বোতলটা তার মাথায় নামিয়ে আনল। বোতলটা ভাঙল না দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রিমরিগোর, মাথাটা ঘাড়ের ওপর নড়বড় করছে। কাজেই আবার আঘাত করতে হলো রানাকে। এবারও বোতলটা ভাঙল না। তবে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রিমরিগো।

হেসে উঠে নিস্তব্ধতা ভাঙল কার্ল। 'স্যার, ধন্যবাদ—আপনি আমার মনের বাসনা পূরণ করলেন।'

তাড়াতাড়ি মারিয়াকে ধরে দাঁড় করালেন প্রফেসর, রানার বিছানায় বসিয়ে দু'ঢোক হুইস্কিও খাওয়ালেন। তারপর ফিসফিস করে রানাকে বললেন, 'আপনাকে আমি বারণ করেছিলাম, ওকে সঙ্গে রাখা উচিত হবে না।'

'স্বীকার করছি, ভুল হয়েছে,' বলল রানা। 'কার্ল, রিমরিগোর অস্ত্রটা দাও আমাকে। ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিছানার পাশে বাক্সটায় আছে,' বলল মারিয়া।

স্মিথের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল কার্ল, স্মিথ কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আরেক চুমুক হুইস্কি খেতে গিয়ে বিষম খেলো মারিয়া, এক হাতে চোয়াল ডলছে। কাশি থামতে রিমরিগোর দিকে তাকাল। 'ও আর মানুষ নেই,' বিড়বিড় করে বলল। 'একদম পাগল হয়ে গেছে।'

কার্লকে একপাশে সরিয়ে এনে নিচু গলায় বলল রানা, 'রিমরিগোকে তাঁর কুঁড়েতে রেখে আসুন। ব্যবস্থা থাকলে বাইরে থেকে তালা দিন দরজায়।'

জ্ঞান ফিরে আসছে রিমরিগোর, সেই অবস্থাতেই তাকে তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কার্ল আর ফাউলার। ওরা বেরিয়ে যাবার পর দু'মিনিটও পেরোয়নি, কুঁড়ের বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ঝট করে দরজার দিকে ফিরল রানা। কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা গুলি হলো। পরমুহূর্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল, কোন নিয়মিত ছন্দ নেই, এলোপাতাড়ি বলে মনে হলো। ছুটে বাইরে বেরুল রানা, ক্যাম্পের শেষ সীমায় পৌঁছে কার্লের পাশে দাঁড়াল। একটা কুঁড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্ল। 'কি ব্যাপার, কার্ল?'

'রিমরিগো পালিয়েছে!' হাঁপাচ্ছে কার্ল। 'কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে দেখে আমরা ধাওয়া করি। কিন্তু জঙ্গল থেকে ওরা গুলি করায় আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'ওরা মানে চিকলেরোরা? রিমরিগো মারা গেছে?'

'বোধহয়,' বলল কার্ল। 'জঙ্গলে ঢোকার মুহূর্তে তাকে আমি পড়ে যেতে দেখেছি।'

কাতর একটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। মারিয়াকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঘরে ফিরে যান,' ধমক দিল ও। 'এখানে

থাকলে মারা পড়বেন।'

দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, প্রতিবাদ না করে ঘুরে দাঁড়াল মারিয়া, হাঁটার সময় হতাশায় কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল।

ক্যাম্পের কিনারায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা, কিন্তু নতুন কিছু ঘটল না। জঙ্গল স্থির পাঁচিল, কোথাও কিছু নড়ছে না।

দশ

রানা নিশ্চিত, ওদের প্রতিটি কাজ লক্ষ করা হচ্ছে। আর্টিফ্যাক্টগুলো সিনোটে ফেলতে হলে প্রথমে বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওখানে। কাজটা শুরু করা মাত্র হেনেস হামলা চালাতে পারে। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো, যা কিছু করার রাতের অন্ধকারে গোপনে করতে হবে।

দিনের আলোয় ক্যাম্পের সবাইকে স্বাভাবিক আচরণ করতে বলে দিল রানা। কুঁড়েগুলোয় ঘন ঘন আসা-যাওয়া করল ওরা, তবে কোন তাড়াহুড়ো নেই। এভাবেই সারাদিনে একটা একটা করে সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট রানার কুঁড়েতে জড়ো করা হলো। সিনোট থেকে ওগুলো তোলার সময় মেটাল বাস্কেট ব্যবহার করা হয়েছিল, প্যাক থেকে খুলে আবার সেগুলো ওই বাস্কেটেই ভরে রাখল কার্ল।

জরুরী কাজের মধ্যে আরেকটা হলো ক্যাম্পটাকে সুরক্ষিত দুর্গ বানানো। প্রাথমিক কাজ দিনেই শুরু হলো, তবে মূল কাজ সারা হবে রাতের অন্ধকারে। স্মিথ আর ফাউলার গাছের গুঁড়ি আর দীর্ঘ কাণ্ড টেনে এনে এমন সব জায়গায় ফেলে রাখল, গোলাগুলি শুরু হলে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে ওগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, সেই আড়ালে থেকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে।

তারপর এক সময় সন্ধে ঘনাল। অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। কার্ল আর স্মিথ প্রচুর কাঠ নিয়ে এল, কুঁড়েগুলোর গায়ে তার ও রশি দিয়ে বাঁধা হলো সেগুলো, বুলেট ঠেকাবার কাজে লাগবে। বড় আকৃতির এয়ার বটলগুলো সিনোটের কিনারায় জড়ো করল কার্ল, ভেলাটা টেনে এনে তাতে তোলা হলো সব। অন্ধকারে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে, সময়ও বেশি লাগছে। আর্টিফ্যাক্টগুলো ভেলায় তুলতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল।

সবশেষে মারিয়াকে নিয়ে সিনোটে ডুব দিল রানা।

ফাঁক বা গুহাটা যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনই আছে, ভেতরের বাতাসও যথেষ্ট। গুহার ভেতরে ঢুকে পানির ওপর মাথা তুলল রানা। প্রথমে রেখে যাওয়া ল্যাম্পটার সুইচ অন করল, তারপর সঙ্গে নিয়ে আসা ল্যাম্পও জ্বালল। ওয়াটার-লেভেলের খানিক ওপরে একটা চওড়া কার্নিস রয়েছে, আর্টিফ্যাক্টগুলো ওখানে তুলে রাখা যাবে। কার্নিসে উঠে বসল রানা,

মারিয়াকেও উঠতে সাহায্য করল। 'জায়গা তো প্রচুর, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বলল মারিয়া, অন্যমনস্ক। 'আলফাঁসো এত সব সমস্যা সৃষ্টি করায় সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি।'

'কি কারণে হঠাৎ বিদ্রোহ করলেন?'

'আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—ভালবাসা, নাকি মিসপ্লেইসড লয়্যালিটি?. তখন থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করি আমি। এক সময় উপলব্ধি করলাম, আলফাঁসো সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, এ সে লোক নয়। রানা, সে কি···ও কি··· বেঁচে নেই?'

'আমি জানি না। ঘটনার সময় আমি ওখানে ছিলাম না। কার্লের অবশ্য তাই ধারণা। সম্ভবত আহত হয়েছে, মারা যায়নি।'

'এই বিপদ থেকে যদি বাঁচি, আলফাঁসোকে আমি ডিভোর্স করব,' বলল মারিয়া। 'যা ঘটে গেছে, তারপর আর তার সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। মেক্সিকান ডিভোর্স নেব আমি, সব জায়গায় ভ্যালিড হিসেবে গণ্য হবে সেটা, কারণ মেক্সিকোতেই আমরা বিয়ে করেছিলাম।'

'আপনার তো টাকার অভাব নেই, র‍্যাঞ্চ থেকে ভালই আয় হয়,' বলল রানা। 'ডিভোর্স নেয়ার পর কি করবেন?'

'আলফাঁসোকে ভাল লেগেছিল, কারণ তার একটা আদর্শ ছিল,' বলল মারিয়া। 'পুরানো সভ্যতা আবিষ্কার করা, আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করা, নিঃসন্দেহে মহৎ একটা কাজ। তখন তার মধ্যে লোভ-লালসার ছিটেফোঁটাও আমি দেখিনি। আমার নিজেরও একটা আদর্শ ছিল, মহৎ একটা কাজে ওকে সাহায্য করা।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'কিন্তু আমি হেরে গেছি। ওকে সৎ পথে ধরে রাখতে পারিনি। তাই ভাবছি ডিভোর্স দেয়ার পর আমি সমাজের কোন ভাল কাজে নেমে পড়ব। জাতিসংঘ একবার স্বেচ্ছাসেবক চেয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বের শিশুদের পোলিওর টিকাদান কর্মসূচীতে কাজ করার জন্যে। আমি অ্যাপ্লিকেশনও করেছিলাম, কিন্তু আলফাঁসোকে রাজি করাতে পারিনি বলে যাওয়া হয়নি। ভাবছি আবার অ্যাপ্লিকেশন করব। শুধু নিজের কথাই বলছি, আপনার কোন কথা শুনছি না। কিছু বলুন!'

'আমি সরকারী চাকুরে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে,' বলল রানা। 'তবে একসময় সেনাবাহিনীতে মেজর ছিলাম। আপনার কথা শুনে খুশি হলাম, মারিয়া।' কার্নিস থেকে নেমে পড়ল ও। মারিয়াকে নামতে সাহায্য করছে। এই সময় গুহার পিছনে পাথুরের দেয়ালটার ওপর চোখ আটকে গেল। প্রথমবার যখন দেখে তখনও প্রশ্নটা জেগেছিল মনে—দেয়ালটা পাথরের কেন?

মারিয়াকে নামানোর পর দেয়ালের গায়ে হাত রাখল রানা। 'বলতে পারেন, এটা পাথর দিয়ে গাঁথা হয়েছে কেন?'

হেসে ফেলল মারিয়া। 'দেবতা চ্যাচকে জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু তাঁকে এখন পাই কোথায়?'

'আপনিই তো বলেছেন, সব সিনোটেই তাঁর বাস।' দেয়ালটা পরীক্ষা

করছে রানা, লক্ষ করল মেঝের কাছে দেয়ালটা ইঞ্চি খানেক ফাঁক হয়ে আছে, ভেতরে আঙুল ঢোকানো যায়। দু'হাতের চারটে করে আঙুল ভেতরে ঢুকিয়ে ওপর দিকে টানছে ও।

'কি করছেন?'

'কেন যেন মনে হচ্ছে এই দেয়াল নড়ানো সম্ভব, সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে।'

'মানে? কি বলছেন?' মারিয়া বিমূঢ়।

'আসুন, আপনিও হাত লাগান,' ডাকল রানা।

'ধ্যেত!' আপত্তি করলেও, রানার কথা মত সে-ও দু'হাতের চারটে করে আঙুল ফাঁকের ভেতর গলিয়ে ওপর দিকে টান দিচ্ছে।

অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত ব্যাপার। ঘড়ঘড় শব্দে গোটা দেয়াল ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। দেয়ালটা যতই ওপরে উঠল ততই উন্মুক্ত হলো কাঠের একটা চৌকাঠ। চৌকাঠের সঙ্গে পাথরের দেয়ালটা এমনভাবে খাড়া করে রাখা হয়েছে, নিচে থেকে ওপর দিকে চাপ দিলে প্রায় সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে যাবে ওপরে। চার ফুট উঠল দেয়ালটা। একটা ল্যাম্প নিয়ে ভেতরে আলো ফেলল রানা। মারিয়া অনবরত ফিসফিস করছে, 'মাই গড! মাই গড! মাই···'

'দু'একবার চ্যাচকেও ডাকুন,' কৌতুক করল রানা, গলায় উল্লাস। 'ভেতরে টানেল, মারিয়া। এত লম্বা যে শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না। আসুন, দেখি কোথায় শেষ হয়েছে।'

'না!' সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল মারিয়া। 'আমার ভয় করছে।'

'ভয় কিসের? আমি আছি না!' বলে মারিয়ার হাত ধরে ঝুঁকল রানা, মাথার ওপর ঝুলে থাকা দেয়াল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল টানেলে। 'লক্ষ করুন, টানেলের মেঝেও পাথরের। ছাদও তাই।'

মুখে ভয় পাবার কিছু নেই বললেও, ল্যাম্পের আলোয় পথ দেখে এগোবার সময় গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রানার। টানেলটা প্রথম দিকে সরু, তবে ক্রমশ চওড়া হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দু'বার বাঁক ঘোরার পর এক প্রস্থ সিঁড়ি পেল ওরা। উনিশটা ধাপ পেরিয়ে সমতল একটা পাকা চত্বরে উঠল। চত্বরটাকে ছোটখাট একটা মাঠ বললেই হয়। প্রথমে মনে হলো ফাঁকা, কিছুই নেই। তারপর ল্যাম্পের আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করতে দেখা গেল, চত্বরের বৃত্তাকার দেয়ালে বিশাল আকারের সারি সারি খোপ তৈরি করা হয়েছে, সেই খোপ ভরা হয়েছে চৌকো বাক্স আকৃতির লাইমস্টোন দিয়ে। নখ দিয়ে খুটরে খানিকটা লাইমস্টোন হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। ওর সন্দেহ হলো, লাইমস্টোনের সঙ্গে আরও কিছু মেশানো থাকতে পারে—আঠা বা আঠাল কোন পদার্থ।

'কি এগুলো?' ফিসফিস করল মারিয়া।

'বুঝতে পারছি না,' রানার গলা দিয়েও আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'সিনোটে, পানির অনেক নিচে, টানেল আর চত্বর তৈরি করা হলো, মূল্যহীন লাইমস্টোন রাখার জন্যে?'

'শুনে পাগলও হাসবে,' মন্তব্য করল মারিয়া।

রানার হাতে ছুরি বেরিয়ে এল। 'দেখা যাক,' বলে লাইমস্টোন চাঁছতে শুরু করল। একেকটা বাক্স দশ ফুট উঁচু, চওড়াও তাই। যেহেতু চারকোনা, দশ বর্গ ফুট বলেই মনে হলো, যদিও খোপগুলো কতটুকু লম্বা বোঝা যাচ্ছে না। ইঞ্চি দেড়েক লাইমস্টোন চাঁছার পর ভেতরে কি যেন চকচক করতে দেখল রানা, ল্যাম্পের আলোয় রীতিমত দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

স্থির হয়ে গেল রানার হাত। পরস্পরের দিকে বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকল ওরা।

কতক্ষণ পর কে জানে, প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙল মারিয়া। 'সো··· সো···'

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলে বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে বাক্সগুলো গুনছে মারিয়া, '···পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ···উনিশ, বিশ—বিশটা!' রানার গায়ে হেলান দিল সে। 'আমার অসুস্থ লাগছে, রানা। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলব।'

রানারও মাথা ঘুরছে। তবে ওর বোধশক্তি আর দৃষ্টি আরও যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। 'বাক্স বিশটা, কিন্তু খোপ একুশটা, মারিয়া,' বলে তাঁর হাত ধরে টান দিল ও।

একুশ নম্বর খোপের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ল্যাম্পের আলোই বলে দিল তোরণ আকৃতির মাথা নিয়ে এই খোপ আসলে একটা টানেলের প্রবেশপথ। রানার কব্জিটা এত জোরে চেপে ধরল মারিয়া, ধারাল নখ মাংসে ডেবে যাচ্ছে। 'ওদিকেও কি এরকম চত্বর আর খোপ আছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল। 'যাবেন?'

'কিছু না কিছু তো আছেই, তা না হলে টানেলটা বানাবে কেন,' বলল রানা, তারপর মাথা নাড়ল। 'পরে যাব। আমাদের দেরি দেখে চিন্তা করছে কার্ল। মারিয়া, এখুনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, ঠিক আছে?' নিঃশব্দে মাথা নাড়ল মারিয়া।

টানেল ধরে গুহার মুখে ফিরে এল ওরা, তারপর মাস্ক পরে পানিতে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে ভেলা থেকে আর্টিফ্যাক্ট ভর্তি বাস্কেট নামিয়েছে কার্ল, সেগুলো গুহায় এনে কার্নিসে তোলার দীর্ঘ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজটা শুরু হলো। একের পর এক বাস্কেট নেমে আসছে, দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করতে হচ্ছে দু'জনকে। তবে কিভাবে যে সময় কেটে গেল, বলতে পারবে না ওরা। এক সময় কাজটা শেষ হলো। সিনোটের নিচে দু'ঘণ্টা হলো রয়েছে ওরা, তবে পঁয়ষট্টি ফুটের বেশি নিচে নামেনি, তাই ডিকমপ্রেসন-এর জন্যে পুরো এক ঘণ্টাও ব্যয় করতে হলো না। কার্ল ভেলা থেকে হোস নামিয়ে দিল, শট লাইনের পাশে ঝুলতে থাকল সেটা, শেষ মাথায় দুটো ভালভ রয়েছে; ওদের স্কুবা গিয়ারের ডিমান্ড ভালভের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো সেগুলো, ফলে ওপরে ওঠার সময় ভেলায় রাখা বড় আকৃতির বটল থেকে এয়ার সাপ্লাই পেল ওরা, এয়ার কমপ্রেসর ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনই হলো না।

সারফেস থেকে মাথা তুলতে কার্ল জানতে চাইল, 'সব ঠিক তো? প্রথম

বাস্কেট খালি করতে এত সময় লাগল যে?'

'গুহাটা পরীক্ষা করছিলাম,' বলল রানা, তবে কি পেয়েছে বলল না। 'কার্ল, ভেলা থেকে বটলগুলো পানিতে ফেলে দিন। ওগুলো দেখলে হেনেসের মাথায় বুদ্ধি গজাবে। আমরা জানি না, তার সঙ্গে হয়তো ডুবুরীও আছে।'

এয়ার বটলগুলো ভেলা থেকে পানিতে ফেলে দিল কার্ল।

ক্যাম্পে ফিরে রানা জানতে চাইল, 'প্রফেসর কোথায়?'

স্মিথ বলল, 'সম্ভবত নিজের কুঁড়েতে।'

প্রফেসরের কুঁড়েতে ঢুকে রানা দেখল মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দিল ও, তারপর জানতে চাইল, 'কিছু হয়েছে?'

'ভুল, মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছি!' পায়চারি থামিয়ে বললেন প্রফেসর। 'লোকজনের সঙ্গে আর্কিওলজিস্টরা যখন ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে চিঠি পাঠিয়েছি আমি—মেক্সিকো সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে লেখা।'

'ভালই করেছেন। ভুল বলছেন কেন?'

'ভুল নয়? ওগুলো যদি হেনেসের হাতে পড়ে থাকে? সবগুলো চিঠিতে লেখা আছে এখানে কি পেয়েছি আমরা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'চারটে চিঠিই হেনেসের হাতে পড়বে, এ সম্ভব নয়। মেক্সিকো কর্তৃপক্ষ ঠিকই সব জেনে ফেলেছে। আমি বলব, তবু মেসেজ পাঠাতে দেরি করে ফেলেছেন আপনি। কাজটা আরও আগে করা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, আরও আগে করা উচিত ছিল,' রানার শেষ কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন প্রফেসর। টেবিলের সামনে এসে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢাললেন। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা। 'বব চ্যাপেল আমাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি তার কথায় কান দিইনি।' দুই ঢোকে আধ গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ফেললেন। 'আমি স্বার্থপরের মত আচরণ করেছি। কারণ জানতাম, খবর পাওয়ামাত্র অ্যান্টিকুইটিজ ডিপার্টমেন্ট পুরো একটা বাহিনী নিয়ে এখানে হাজির হবে। ওরা এসে পৌঁছুনোর আগে ওয়াশওয়ানোক শহরটাকে কিছুটা সময় একা পেতে চেয়েছিলাম আমি। এখন দেখছি, তাও আমার ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।'

রানা বলল, 'এত অস্থির হচ্ছেন কেন। পরবর্তী মরশুমে আবার ফিরে আসবেন।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'না, আসব না। কোনদিনই আর ফেরা হবে না আমার। দায়িত্ব নেবে অন্য কেউ, কোন তরুণ আর্কিওলজিস্ট। ওরকম বেপরোয়া আর অধৈর্য হয়ে না উঠলে, সুযোগটা আলফাঁসোও পেতে পারত।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন বলুন তো?'

প্রফেসরের মুখে ভৌতিক হাসি। হঠাৎ তাঁকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। 'আর তিন মাস, মি. রানা।'

'তিন মাস মানে?' রানা বুঝতে পারছে না।

'তিন মাসের মধ্যে মারা যাচ্ছি,' বললেন বেলফোর্স। 'মেক্সিকো সিটি থেকে রওনা হবার ঠিক আগে ওঁরা আমাকে জানালেন। সময় ছিল ছ'মাস।' চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসলেন। 'ওঁরা, ডাক্তাররা, আমাকে এখানে আসতে দিতে চাননি। কিন্তু তবু আমি আসি। সেজন্যে আমি খুশি, রানা। আমার জীবনের একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন আমি মেক্সিকো সিটিতে ফিরে হাসপাতালে ভর্তি হব—চিকিৎসা পাবার জন্যে নয়, মরার জন্যে।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'সেই পুরানো শত্রু—ক্যানসার।'

ক্যানসার—শব্দটা সীসার মত ভারী হয়ে নেমে এল নিস্তব্ধ কুঁড়ের ভেতর। রানা কিছু বলতে পারছে না। এতদিনে বোঝা গেল কেন প্রফেসর সারাক্ষণ বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক থাকতেন, কেন সব কাজ তাড়াহুড়ো করে সারতে চাইছিলেন। মারা যাবার আগে ওয়াশওয়ানোক শহরটা দেখে যেতে চেয়েছিলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর নরম সুরে রানা বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'আপনি দুঃখিত? কেন? সব দোষ আমার। হাসপাতালে শুয়ে মরব, নিজের ভুলে এখন সে সুযোগটাও হারিয়েছি। আমার কথা বাদ দিন, কি আসে যায় হাসপাতালে মরলাম না এখানে মরলাম। কিন্তু হেনেস তো আপনাদের কাউকেই ছাড়বে না। আমার ভুলে এতগুলো মানুষ সবাই আপনারা মারা যাবেন।'

'এত সহজ ভাবছেন কেন? ওরা মারতে এলে আমরা কি ওদের ছেড়ে দেব?' অভয় দিয়ে হাসল রানা। তারপর এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল। 'প্রফেসর, আমি এসেছি আপনাকে একটা তথ্য দিতে।'

'আর কোন তথ্য আমার কি জানার প্রয়োজন আছে?' বিষণ্ণ হাসি ফুটল বেলফোর্সের ঠোঁটে। 'কোন কাজে লাগবে—আমার বা আর কারও?'

'ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস যদি সত্যিও হয়,' বলল রানা, 'এই তথ্যটা আপনার রোগের মহৌষধ হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন অনেক ক্যানসারের কথা শুনেছি, চিকিৎসায় ভাল হয়নি, ভাল হয়েছে সীমাহীন আনন্দ-উল্লাসে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর। 'তাহলে বলি। আপনাকে আমার অসম্ভব ভাল লেগেছে। আপনার মত গুণধর ব্যক্তি আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করবেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'কৌতুক নয়, প্রফেসর বেলফোর্স। আমি আপনাকে নিরেট একটা তথ্য দিতে চাই। শুনে আপনি এমন খুশি হবেন, জীবনে কখনোই এত খুশি হননি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন প্রফেসর। 'সিনোটের তলায় কিছু পেয়েছেন। কি? আরও একটা চেইন? আরও দুটো চেইন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এক টনী চেইন সিনোটের তলায় আরও হয়তো

পাওয়া যেতে পারে। তবে আমি আর কোন চেইন পাইনি।'

'তাহলে কি?'

'তথ্যটা আপনাকে দেয়ার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা করা দরকার,' বলল রানা। 'আপনি যেমন একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে এখানে আসার আগে ও পরে নিজস্ব বুদ্ধি, স্বার্থ, কৌশল ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেছেন, আমিও তেমনি। আমার স্বার্থ ছিল যদি সম্ভব হয় নিজের দেশের জন্যে কিছু আয় করা। সেজন্যেই মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক ও মৌখিক একটা চুক্তি করি আমি, সে-কথা আগেই আপনাকে জানিয়েছি।'

'ফাইন্ডার'স ফী?'

'জ্বী।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট দু'ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে মেক্সিকো সরকার, বাকি এক ভাগ আমরা সবাই—খরচ বাদ দিয়ে। কিন্তু আর্টিফ্যাক্ট নয়, এমন কিছু পাওয়া গেলে কিভাবে তা ভাগ হবে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি।'

'আর্টিফ্যাক্ট নয়, এমন কিছু পাওয়া গেছে? দামী?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি।'

'বলুন।'

'আপনি জানেন, আমি বাংলাদেশের ছেলে। সম্ভবত এ-ও জানেন যে বাংলাদেশ খুবই দরিদ্র একটা দেশ?'

কথা না বলে প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন।

'আমি চাই, আর্টিফ্যাক্ট নয় এবং আমার আবিষ্কৃত দামী কিছু যদি পাওয়া যায়, মেক্সিকো সরকারকে বলব আমাকে তার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে। এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে সমর্থন করবেন।'

'আপনি একা আবিষ্কার করেছেন?'

'একাই বলতে হবে, যদিও আমার সঙ্গে মারিয়া ছিলেন,' বলল রানা। 'আমি তাঁকে সঙ্গে রাখি, তাই ছিলেন। না, মেক্সিকো সরকারকে রাজি করাতে পারলে আমার ভাগের অর্ধেকটা সবই আমি একা নিতে চাইছি না। মারিয়া জাতিসংঘের যে-কোন জনহিতকর কাজে স্বেচ্ছাসেবক হতে চান, তিনি যদি ওই কাজের তহবিলে আমার ভাগের বিশ পার্সেন্ট দান করতে চান, আমি আপত্তি করব না।'

'হেঁয়ালি অনেক হয়েছে, রানা। এবার বলুন তো, কি পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আগে আপনাকে কথা দিতে হবে। আলোচনার সময় আপনি আমাকে সমর্থন করবেন।'

প্রফেসরকে চিন্তিত দেখাল। ধীরেসুস্থে পাইপ ধরালেন তিনি। 'জিনিসটা কি, কত দাম, কিছুই জানলাম না—কথা দিয়ে ফেলব?'

'জিনিসটা সোনা,' বলল রানা। 'অনেক সোনা।'

'অনেক আর কত,' বললেন প্রফেসর। 'ওয়াশওয়ানোকে বা আশপাশে কোন সোনার খনি কোনকালেই ছিল না। মায়ারা কোথাও থেকে আমদানি করেছিল। ঠিক আছে, কথা দিলাম, আপনাকে আমি সমর্থন করব।'

'কয়েক হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা,' বলল রানা। 'আপনারা, আর্কিওলজিস্টরা, বলছেন মায়ারা মিশর থেকে এসেছিল। পিরামিডের নির্মাণ কৌশল সেটাই নাকি প্রমাণ করে। ইউকাটান বা ওয়াশওয়ানোকে সোনার খনি নেই তো কি হয়েছে, মিশরে তো ছিল বা আছে। আমি যে সোনার কথা বলছি তা মিশর থেকেও আনা হতে পারে।'

'তা পারে।'

'সেই সোনার পরিমাণ যদি কয়েকশো টন হয়?'

'নাহ্!' হেসে উঠলেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'নাহ্! তা কি করে হয়!'

'সিনোটের পঁয়ষটি ফুট নিচে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়ে একটা পাথুরে টানেলে ঢোকা যায়। ঢোকার পথটা আমরা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। কাউকে না বললে ওটা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই। টানেল ধরে এগোলে এক সময় আপনি একটা পাকা চত্বর পাবেন। সেখানে লাইমস্টোন দিয়ে মোড়া সোনার বাক্স আছে বিশটা। প্রতিটির ওজন, আন্দাজ করছি, পঁচিশ টনের কম নয়।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুললেন তিনি, তবে অন্য প্রসঙ্গে। 'হেনেস কখন হামলা করবে বলে আপনার ধারণা?'

'কি করে বলি। তবে খুব বেশি দেরি করবে বলে মনে হয় না। আপনি বরং খানিকটা ঘুমিয়ে নিন।'

অন্ধকারে কার্লের সঙ্গে ধাক্কা খেলো রানা। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম,' বলল কার্ল। 'আপনি তো একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম চালান, সেনাবাহিনীতে মেজরও ছিলেন, তাই না? বুদ্ধি দিন, আক্রমণ ঠেকাবার আর কি উপায় করা যায়।'

'এ-সব তথ্য আপনি কোথায় পেলেন?'

'মিসেস আলফাঁসো বলছিলেন···'

'ভাল একটা বুদ্ধি আছে। কাজটা দু'জন মিলে করতে হবে, তাই আমিও আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কার্ল, তাতে অনেক মানুষ মারা যাবে।'

'আমরা তো আর নিরীহ মানুষকে মারতে চাইছি না,' বলল কার্ল। 'কেউ মারতে এলে তবেই মারব। কি বুদ্ধি, মি. রানা?'

'ক্যাম্পের শেষ মাথার দুটো খালি কুঁড়েতে আড়াল নেবে ওরা, যদি আক্রমণ করে,' বলল রানা। 'কাজেই আমাদের সমস্ত জেলিগনাইট ওই দুই ঘরে নিয়ে যান। আমার কুঁড়েতে প্লাঞ্জার রাখুন, তাতে তার ঢুকিয়ে জেলিগনাইটের সঙ্গে সংযোগ দিন।'

'ব্যাটা হেনেস, চোখে সর্ষে ফুল দেখবি!' বলেই ছুটল কার্ল।

দু'জন মিলে কাজটা শেষ করতে আধ ঘণ্টা লাগল। মাটির ওপর পড়ে থাকা তারের ওপর মাটি ছড়াতে হয়েছে, কেউ যাতে দেখে না ফেলে। এক সেট তারের শেষ প্রান্ত প্লাঞ্জার বক্সের টার্মিনালে জড়িয়েছে রানা। সেটার গায়ে

হাত বুলিয়ে কার্ল বলল, 'ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, মি. রানা। জানালার সামনে চলে এল সে। 'আকাশটা মেঘলা। প্রফেসর বলছিলেন যে-কোন দিন তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে।'

'স্মিথ আর ফাউলারকে ক্যাম্পের কিনারায় পাহারায় থাকতে বলে দিন,' নির্দেশ দিল রানা। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলেই চিৎকার করবে।'

কার্ল চলে যাবার পর কুঁড়ের বাইরে এসে বসল রানা। কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল, চোখে ঘুম চলে এল। সেটা ভাঙল কাঁধে কারও হাত পড়ায়। চোখ মেলে প্রফেসরকে দেখল রানা। ইতিমধ্যে ভোরের আলো পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

'কেউ একজন আসছে,' চাপা গলায় বললেন তিনি।

'কোথায়?' এক লাফে সিধে হলো রানা।

'জঙ্গল থেকে।' হাত তুলে দেখালেন প্রফেসর। 'ওদিকে···আমার সঙ্গে আসুন।'

প্রফেসরের সঙ্গে ক্যাম্পের কিনারায় এসে একটা কুঁড়ের ভেতর ঢুকল রানা, এখান থেকেই জঙ্গলের দিকে নজর রাখছিলেন তিনি। চোখে বিনকিউলার তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। সাদা স্যুট পরা লোকটাকে পরিষ্কারই দেখা গেল, ফাঁকা জায়গা ধরে অলস পায়ে হেঁটে আসছে।

ভোরের আলো আরও ফর্সা হয়েছে। রয় হেনেসকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না।

এগারো

হেনেস সময় নিয়ে হেঁটে আসছে। আচরণে এতটুকু জড়তা বা উদ্বেগ নেই, যেন নিজের বাগানে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে। মাঝে মধ্যে থামছে সে, উঁকি দিয়ে দু'একটা গর্ত দেখছে। স্যুটটার ভাঁজ একদম নিখুঁত, কোটের ব্রেস্ট পকেট থেকে সামান্য একটু বেরিয়ে আছে রুমালটা।

বিনকিউলার ঘুরিয়ে আশপাশের জঙ্গলে তাকাল রানা। কোথাও আর কেউ নেই, হেনেসকে একাই মনে হলো। কার্ল পাশে এসে দাঁড়াতে তার হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল রানা। 'এই লোক হেনেস?' হিসহিস করে উঠল সে।

'হ্যাঁ।'

'এত সময় নিচ্ছে কেন? যেন ফুল কুড়াতে কুড়াতে আসছে!'

ঝুঁকে মাটিতে কি যেন হাতড়াচ্ছে হেনেস। 'ইচ্ছে করে দেরি করছে, এখানে পৌঁছুতে আরও পাঁচ মিনিট লাগবে,' বলল রানা। 'আমিই বরং এগোই, শুনি কি বলতে চায়।'

'মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

'এখানে জেলিগনাইট রয়েছে, কাজেই এখানে তাকে ঢুকতে দেয়া যাবে না,' বলল রানা। 'আমাদের মধ্যে রাইফেলে কার হাত সবচেয়ে ভাল?'

'আমি···আমার···'

ফাউলার ইতস্তত করছে দেখে কার্ল বলল, 'ও পাকা মার্কসম্যান।'

'গুড!' খুশি হলো রানা। 'ফাউলার, সাইটে সারাক্ষণ ধরে রাখবে ওকে। কোন রকম চালাকি করতে দেখলেই খুলি উড়িয়ে দেবে।'

একটা রাইফেল তুলে নিয়ে সাইটস পরীক্ষা করল ফাউলার। 'স্যার, বেশিদূর যাবেন না,' বলল সে। 'আর ভুলেও হেনেস ও আমার মাঝখানে দাঁড়াবেন না।'

কুঁড়ের দরজার কাছে চলে এল রানা। 'সবাই আড়ালে থাকবেন,' বলে বেরিয়ে এল ও।

ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে হেনেসের দিকে এগোচ্ছে রানা। জঙ্গলে কাউকে দেখেনি বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানে হেনেসের লোকজন ওর ওপর নজর রাখছে। শুধু নজর রাখছে না, ওর দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে। কুঁড়ে থেকে দুশো গজ দূরে থামল ও, এক সেকেন্ড পর একপাশে সরে দাঁড়াল—ফাউলার যাতে তার সাইটে হেনেসকে সরাসরি পায়।

হেনেস দশ গজ দূরে থামল। রানার দিকে না তাকিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগার ধরাল। তারপর আবার এগোচ্ছে। এবার মুখ তুলে তাকাল। হাসল সে, বিনীত ভঙ্গিতে পানামা হ্যাটটা হাত দিয়ে উঁচু করল একটু। 'এই যে, মি. মাসুদ রানা, গুড মর্নিং। সকালটা ভারি সুন্দর, কি বলেন?'

রাগে পিত্তি জ্বলছে রানার। কথা বলছে না।

জবাব না পেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল হেনেস। 'প্রফেসর বেলফোর্সকে পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল সে।

'না,' সংক্ষেপে, কঠিন সুরে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সে, যেন বুঝতে পারছে কেন প্রফেসরকে পাওয়া যাবে না। লোকটা সম্পূর্ণ শান্ত, মিটিমিটি হাসছে। 'ইয়ে···মানে···এটা তো পরিষ্কারই, তাই না, কিছু নিতে এসেছি আমি।' স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুর, প্রশ্নবোধক নয়।

'তবে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে,' বলল রানা।

'আরে না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুর, হাসছে হেনেস। 'আমি কখনও কোথাও থেকে খালি হাতে ফিরি না।' সিগারের মাথার ছাই পরীক্ষা করছে সে। 'ধরে নিচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে প্রফেসরের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন। বুড়ো মানুষ, মরতে বসেছেন, ভয় পেয়ে লুকিয়ে থাকাটা স্বাভাবিক। সে যাক, কাজের কথায় আসি। সিনোট থেকে আপনারা প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট তুলেছেন। ওগুলো আমার চাই। সহজ কথা সহজ করে বললাম। কোন ঝামেলা না পাকিয়ে সব দিয়ে দিন, কথা দিচ্ছি আমার তরফ থেকে আপনাদের কোন বিপদ হবে না।'

'আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না, তার গ্যারান্টি কি?' জানতে চাইল

রানা।

'আমার কথাই গ্যারান্টি,' দু'পাশে হাত প্রসারিত করে বলল হেনেস, চোখে সরল আন্তরিকতা। 'ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবেন আপনারা, আমরা কাউকে ফুলের একটা টোকাও দেব না।'

হেসে উঠল রানা। তারপর কথা না বলে মাথা নাড়ল।

এই প্রথম হেনেসের চোখে চকচকে হিংস্র একটা ভাব ফুটল। 'তাহলে শুনে রাখুন, মি. রানা। আমরা আর্টিফ্যাক্টগুলো নিতে আসছি। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। ভালয় ভালয় দিলে প্রাণে বেঁচে যাবেন। জোর করে নিতে হলে কেউ বাঁচবেন না। ভেবে দেখার এটাই প্রথম আর শেষ সুযোগ।'

চোখের কোণে কিছু একটা ধরা পড়ায় জঙ্গলের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। ওদিক থেকে ধীর ভঙ্গিতে সাদা কয়েকটা মূর্তি এগিয়ে আসছে। পরস্পরের কাছ থেকে পাঁচ-সাত গজ দূরে রয়েছে তারা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। ঘাড় ফিরিয়ে উল্টোদিকে তাকাল রানা। সেদিকেও জঙ্গল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে আরও অনেক সশস্ত্র চিকলেরো।

আর দেরি করা যায় না, হেনেসকে ভয় দেখাবার এখনই সময়। শার্টের পকেট থেকে প্রথমে একটা দেশলাই বের করল রানা। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত ভরে অসহায় ভঙ্গি করল, যেন সিগারেটের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছে। তারপর হেনেসের দিকে ফিরে হাসল, দেশলাইটা বারবার শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি করছে। 'এটা একটা সিগন্যাল, ডায়নামো ডিকানডিয়া। দেশলাইটা আমি ফেলে দিলে খুলিতে একটা বুলেট খাবেন আপনি। কি বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনার লোকজন আর যদি দশ গজ এগোয়, এটা আমি ফেলে দেব।'

হেনেসের চোখে ক্ষীণ অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল। 'আপনি ধোঁকা দিচ্ছেন,' বলল সে। 'সেক্ষেত্রে আপনিও মারা যাবেন।'

'তাহলে পরীক্ষা করুন,' চ্যালেঞ্জ করল রানা। 'আমার সঙ্গে আপনার মৌলিক পার্থক্য আছে। আমি মরতে ভয় পাই না, আপনি পান। খেলাটায় আমি প্রাণ বাজি ধরেছি, ইচ্ছে হলে আপনিও ধরতে পারেন—আর কিন্তু পাঁচ গজ বাকি। মনে আছে তো, আপনি আমার বন্ধুকে খুন করেছেন। সেই খুনের প্রতিশোধ নিতে প্রাণ হারাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

হেনেস রানাকে নয়, চোখ দিয়ে দেশলাইটাকে অনুসরণ করছে। দেশলাইটা শূন্য থেকে লুফতে গিয়ে ফেলে দেয়ার ভঙ্গি করল রানা, হেনেস ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরমুহূর্তে আবার দেশলাইটা শূন্যে ছুঁড়ল রানা, এবার অনেক ওপরে। বলল, 'আর তিন গজ। তারপর আমার ও আপনার জীবন থেকে ওয়াশওয়ানোকের ট্রেজার চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।'

এবার মচকাল হেনেস। 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম, দু'জনেই বেকায়দায় পড়ে গেছি,' কর্কশ গলায় বলল সে। মাথার ওপর দু'হাত তুলে নাড়ল। লোকজনের সারি স্থির হয়ে গেল, তারপর জঙ্গলে ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। দেশলাইটা আবার শূন্যে ছুঁড়ে দিল রানা।

হেনেস প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ফর গড'স সেক, খেলাটা এবার বন্ধ করুন!'

ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল রানা। দেশলাইটা লুফল, তবে ধরে রাখল দু'আঙুলের ফাঁকে। সূর্য মাত্র উঠেছে, এখনও তাপ ছড়াতে শুরু করেনি, তাসত্ত্বেও হেনেসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল। 'আপনি বিপজ্জনক মানুষ,' এক নিঃশ্বাসে বলল সে। 'আপনার সঙ্গে আমি কোনদিন পোকার খেলব না।'

'ওই খেলায় জিতে আমি কোন আনন্দ পাব না,' বলল রানা। 'আমি আপনার সঙ্গে অন্য খেলায় জিততে চাই।'

'শুনুন, মি. রানা,' বড় করে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল হেনেস। 'এটা ঠিক যে একটা অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আপনাদের চেয়ে আমার শক্তি অনেক বেশি। আপনারা এখানে ক'জন আছেন, কার কি ইতিহাস আর যোগ্যতা, সবই আমার জানা। সেই প্রথম থেকেই জানা। আমি বলতে চাইছি, আপনারা দুর্বল, আমার সঙ্গে পারবেন না।'

'এত কিছু জানলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে সাহায্য করেছে।'

'আপনি জানেন না?' অবাক দেখাল হেনেসকে, তারপর হাসতে শুরু করল। 'জেসাস! আমাকে ওই বোকাটা সাহায্য করেছে, রিমরিগো। মেক্সিকো সিটিতে আমার সঙ্গে দেখা করে সে, আমাকে একটা লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। শহর আবিষ্কারের কৃতিত্বটা প্রফেসর বেলফোর্সের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি ছিল না রিমরিগো। চুক্তি হলো, শহর আবিষ্কারের কৃতিত্বটা সে নেবে, আর আর্টিফ্যাক্টগুলো আমি নিয়ে যাব। সে আরও একটা শর্ত দেয়—প্রফেসরকে মেরে ফেলতে হবে।' ঘৃণায় ঠোঁটের কোণ কুঁচকে গেল তার। 'ব্যাটা কাপুরুষ, খুনটা আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিল।'

রানা কঠিন সুরে জানতে চাইল, 'রিমরিগো এখন কোথায়?'

'মাটির তলায় পচছে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল হেনেস। 'আপনারা যখন ধাওয়া করলেন, ভুল করে চিকলেরোরা তাকে গুলি করে ফেলে দেয়।' চোখ মটকাল। 'আমরা আপনাদের ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছি, ঠিক কিনা?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'এখানে আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন, হেনেস। ইচ্ছে হলে আর্টিফ্যাক্ট নিতে আসতে পারেন আপনারা, তবে পেতে হলে ভিজতে হবে।'

'জানি, জানি,' বলল হেনেস। 'রিমরিগো মারা যাবার আগে সব বলে গেছে। ওগুলো আপনারা সিনোটে ফেলে দিয়েছেন। তবে না, আমি ভিজব না। ভিজবেন আপনি। আপনি আর রিমরিগোর বউটা।'

'কিন্তু আমরা যদি সিনোটে নামতে না চাই?'

'চাইবেন, চাইবেন। প্লায়ার্স দিয়ে একটা একটা করে প্রফেসরের আঙুল কাটব। তারপর কব্জি। তারপরও সিনোটে নামতে রাজি হবেন না?' সামনে ঝুঁকে রানার বুকে টোকা দিল হেনেস। 'কথাটা ঠিক, মি. রানা—আপনার

সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য আছে। আমি কঠিন মানুষ। আপনি নরম মানুষ। প্রফেসর মরে গেলে মেয়েটাকে ধরব আমরা। তখন নিশ্চয়ই সিনোটে নামতে রাজি হবেন আপনি।'

নিজেকে তিরস্কার করল রানা; সঙ্গে একটা পিস্তল আনলে শয়তানকে মেরে ফেলতে পারত। 'সেক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমি যাতে খুন হয়ে না যাই,' বিদ্রূপের সুরে বলল ও। 'সোনার ডিম পাড়া সেই হাঁসের গল্প নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।'

মাথা নাড়ল হেনেস, হিসহিস করে বলল, 'কথা দিচ্ছি, আপনি নিজের মৃত্যু কামনা করবেন!' জঙ্গলের দিকে ঘুরে হাঁটা ধরল সে। রানাও হন হন করে কুঁড়ের দিকে ফিরে আসছে।

দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেলো রানা, চেঁচিয়ে বলল, 'ফেলে দিন, বাস্টার্ডকে গুলি করে ফেলে দিন!'

'লাভ নেই,' জানালার সামনে থেকে বলল ফাউলার। 'লাফ দিয়ে আড়ালে চলে গেছে।'

'কি ঘটল?' জানতে চাইল কার্ল।

'বলে গেল হামলা করবে, সবাইকে খুন করে হলেও আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে যাবে। আমাকে আর মারিয়াকে দিয়ে সিনোট থেকে তোলাতে চায় ওগুলো।' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে রানা। 'দেরি নয়, চলুন এখুনি সবাই সিনোটের পাশের কুঁড়েতে চলে যাই। কার্ল, আমাকে একটা রিভলভার দিন।'

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে ছুটল ওরা। সিনোটের পথে মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে, শুরু হয়ে গেল হামলা। এক সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল, ওদের পায়ের চারপাশে বিস্ফোরিত হলো মাটি। 'ছড়িয়ে পড়ুন!' নির্দেশ দিল রানা, পরমুহূর্তে ধাক্কা খেলো কার্লের সঙ্গে। দু'জনেই ওরা ডাইভ দিয়ে একটা কুঁড়ের আড়ালে চলে এল। এক দফা গুলি হবার পর কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার শুরু হলো। রানা অবাক হয়ে বলল, 'চিকলেরোরা কোনদিকে?'

কার্লের বিশাল ছাতি হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। 'সামনের দিকে কোথাও।'

হেনেস জঙ্গলের ভেতর নিরাপদে পৌঁছানো মাত্র আক্রমণ শুরু করেছে চিকলেরোরা, সম্ভবত আগে থেকে ঠিক করা কোন সঙ্কেত পেয়ে। গুলি চারদিক থেকেই আসছে, দৃশ্যটা ওয়েস্টার্ন কোন সিনেমার মত, আন্দাজ করা মুশকিল ঠিক কোথায় রয়েছে চিকলেরোরা। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে একটা বাক্সের আড়ালে ফাউলারকে দেখতে পেল রানা। হঠাৎ আড়ালটা থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল সে। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল, ছুটন্ত পায়ের চারপাশে ধুলো ওড়াচ্ছে, তবে একটাও তাকে লাগল না। রানার দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল সে, একটা কুঁড়ের আড়ালে পৌঁছে গেছে।

'সিনোটের পাশের কুঁড়েতে পৌঁছুতে হবে আমাদের,' বলল কার্ল।

যক্তিটা রানা বুঝতে পারছে। ওই একটা কুঁড়েই সুরক্ষিত করা হয়েছে,

আর কোনটা আশ্রয় হিসেবে মোটেও নিরাপদ নয়। বাকি সবাই কি করছে ওর জানা নেই, তবে আশা করল গুলি শুরু হবার পর ওদিকেই গেছে সবাই, বা যাবে। কার্লের দিকে ফিরল ও। 'আলাদাভাবে যাব আমরা, কার্ল। তাহলে দুটো টার্গেটে গুলি করতে হবে ওদেরকে।'

'আপনি আগে যান,' বলল কার্ল। 'আমি আপনাকে কাভার দিই।'

তর্ক করার সময় নেই, কাজেই ছুটল রানা। ওদের পিছনে একটা কুঁড়ে, প্রথমে ওটার আড়ালে পৌঁছুতে হবে ওকে। প্রায় পৌঁছে গেছে, আর মাত্র দু'গজ বাকি, এই সময় অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে—সামনের কুঁড়ের কোণ ঘুরে—একজন চিকলেরো ছুটে এল। রানার চেয়ে কম চমকায়নি লোকটা, কারণ রানার হাতে ধরা রিভলভারটা একটু সামনে বাড়ানো ছিল, মাজলটা তার পেটে ডেবে গেল।

ট্রিগার টেনে নিল রানা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো হাতে। মনে হলো কোন দৈত্যের প্রকাণ্ড থাবা হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে নিল লোকটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল পিছন দিকে। লাফ দিয়ে লাশ টপকাল রানা, কোণ ঘুরে কুঁড়ের ভেতর ঢুকল। রিভলভারটা চেক করে জানালার সামনে চলে এল ও। পুরো লোড করা ছিল ওটা, আরও পাঁচটা বুলেট আছে।

কার্লকে রানা দেখতে পেল না, অন্য কোন দিকে চলে গেছে সে। কি করবে ভাবছে ও, ভাগ্যই ওকে পরবর্তী কাজ জুটিয়ে দিল। কুঁড়ের পাশের একটা দরজা বুটের লাথি খেয়ে ভেঙে গেল। ঘুরে তাকাতেই দোরগোড়ায় একজন চিকলেরোকে দেখতে পেল ও, রাইফেল উঁচিয়ে ট্রিগার টানতে যাচ্ছে। ঘোরার সময়ই রিভলভার ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়েছে রানা, শুধু ট্রিগার টানতে সময় লাগল। লোকটার চোয়ালের একটা পাশ অদৃশ্য হয়ে গেল, মুখের বাকি অংশ হয়ে উঠল রক্তাক্ত মুখোশ। রক্ত বেরুনোর কলকল আওয়াজ হচ্ছে, রাইফেল ফেলে দিয়ে মুখ চেপে ধরল সে। লোকটা পড়ে যাচ্ছে, এই সময় তার বুকে একটা ফুটো দেখল রানা। ওর বুলেটটা ওখানেই ঢুকেছে। চোয়ালের গুলিটা কোত্থেকে এসে লেগেছে জানে না ও। কৃতিত্বটা হয়তো কার্ল বা ফাউলারের। চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছে, সেমসাইডও হয়ে থাকতে পারে।

কুঁড়েটা নিরাপদ নয়, দোরগোড়ায় পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে নিয়ে আবার ছুটল রানা। চারদিক থেকে গুলি হচ্ছে, কিন্তু ওর দিকে সরাসরি কোন বুলেট আসছে না। তির্যক একটা পথ ধরে বাম দিকে ছুটছে রানা, ক্যাম্পের কিনারায় পৌঁছুতে চায়। ঘুরপথে আসতে হলো ওকে, সিনোটের পাশের কুঁড়েটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু দরজাটা খোলা কি না বা ভেতরে কেউ আছে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে দেখল লম্বা একটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে ছুটে আসছে ফাউলার, কুঁড়ের সামনের দরজায় পৌঁছুতে চায়।

প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় একটা গর্ত থেকে মাথা তুলল এক লোক। চিকলেরো নয়, হেনেসের পোষা আমেরিকান কসাইদের একজন। হাতে একটা সাব-মেশিনগান, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। দাঁড়িয়ে পড়ল

ফাউলার, বুলেটগুলো তাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। রানার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। কুঁড়ের পাশ ঘেঁষে খোলা জায়গায় ছুটে এল ও। রাইফেল তুলে একটা মাত্র গুলি করল। ফাউলার পড়ে গেল, মাথায় ফুটো নিয়ে গর্তের ভেতর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল কসাইটাও। পিছন ফিরল রানা, ছুটে ঢুকে পড়ল কুঁড়ের ভেতর। কোত্থেকে কে জানে একটা বুলেট ছুটে এল, রানার ঠিক মাথার ওপর থেকে দরজার চৌকাঠের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে গেল। মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও, শুনতে পেল কেউ একজন দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

সিধে হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ফাউলারের জন্যে কারও কিছু করার নেই। তার শরীর ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে। চিকলেরোরা টার্গেট প্র্যাকটিস করছে তার ওপর।

ধীরে ধীরে রাইফেলের গর্জন থেমে গেল। কামরার ভেতর চোখ বুলাল রানা। একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর বেলফোর্স, হাতে শটগান। স্মিথ দরজার কাছে, তার হাতে পিস্তল—সন্দেহ নেই সে-ই দরজাটা বন্ধ করেছিল। মেঝেতে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে মারিয়া। কামরায় আর কেউ নেই। 'কার্ল?' জানতে চাইল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালেন প্রফেসর। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। তাঁর দৃষ্টিতে কাতর বেদনা।

'তাহলে সে আর ফিরছে না,' রানার গলা কর্কশ।

বাইরে থেকে চড়া গলায় কথা বলছে কেউ। হেনেসের গলা, পোর্টেবল লাউড হেইলার ব্যবহার করছে। 'রানা! আপনি শুনতে পাচ্ছেন, রানা?'

প্রফেসর আর রানা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা।

'আমি জানি আপনি ওখানে আছেন, রানা,' বলল হেনেস। 'আপনাকে আমি কুঁড়েটায় ঢুকতে দেখেছি। চুক্তিতে আসতে রাজি কিনা জানান।'

ভুরু কোঁচকালেন বেলফোর্স। 'চুক্তি? কিসের চুক্তি?'

'শুনে লাভ কি, আপনার পছন্দ হবে না,' বলল রানা।

'আপনার একজন লোক মারা যাওয়ায় আমি দুঃখিত,' বাইরে চিৎকার করছে হেনেস। 'কিন্তু আপনি এখনও বেঁচে আছেন, রানা। ইচ্ছে করলে দরজার কাছে আপনাকে আমি শেষ করে দিতে পারতাম, কিন্তু করিনি। কেন করিনি আপনি জানেন।'

ঝট করে রানার দিকে তাকাল স্মিথ, চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকল।

'এখানে আমার সঙ্গে আপনার আরও একজন লোক রয়েছে,' হেনেসের গলা গম গম করছে। 'একটা দানব। বিগ ম্যান, বিগ কার্ল। কি, চুক্তি করবেন?'

রুদ্ধশ্বাসে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। 'তাকে জীবিত হাজির করুন, চুক্তির কথা ভেবে দেখব' বলল রানা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। রানা জানে না কার্ল যদি বেঁচে থাকে আর হেনেস যদি তার ওপর নির্যাতন চালায়, তখন কি করবে ও। যা-ই করুক, সেটা নিষ্ফল হতে বাধ্য। চুক্তিতে আসা মানে এই ঘরের চারজনকে হেনেসের হাতে তুলে দেয়া, সব কিছু তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া। সবশেষে ওদের সবাইকেই খুন করবে সে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কার্লকে টরচার করা হচ্ছে দেখলে ও সেটা সহ্য করতে পারবে কিনা।

নিস্তব্ধতা ভাঙল হেনেস। প্রথমে হেসে উঠল সে। তারপর বলল, 'আপনি দারুণ স্মার্ট, রানা। সত্যি দারুণ। তবে যথেষ্ট কঠিন নন। বেলফোর্স কি এখনও বেঁচে?'

প্রফেসরকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল রানা।

'জানি, তিনিও আপনার সঙ্গে ওখানে আছেন,' বলল হেনেস। 'আরও হয়তো দু'একজন থাকতে পারে। ওদের সঙ্গে তর্ক করার জন্যে এক ঘণ্টা সময় দিলাম আপনাকে, রানা। তবে ওই এক ঘণ্টাই, কোন অবস্থাতেই মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। তারপর আমি ম্যাসাকার শুরু করব।'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, দু'মিনিট কেউ নড়ল না বা কথা বলল না। তারপর হাতঘড়ি দেখল রানা। সকাল মাত্র সাতটা।

ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়লেন প্রফেসর। শটগানটা সাবধানে এক পাশে নামিয়ে রাখলেন। 'চুক্তিটা কি?' তাকিয়ে আছেন নিজের পায়ের দিকে। বৃদ্ধ, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত এক লোকের দুর্বল কণ্ঠস্বর।

প্রফেসরের দিকে নয়, রানা নজর রাখছে স্মিথের ওপর। অটোমেটিক পিস্তলটা আলগাভাবে ধরে আছে সে, কিন্তু তার চেহারায় রাজ্যের সন্দেহ। 'হ্যাঁ, চুক্তিটা কি, মি. রানা? বলুন আমাদের।'

'হেনেসের সঙ্গে কোন চুক্তি হচ্ছে না,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালার দিকটা ইঙ্গিত করল স্মিথ। 'ওই লোক বলছে হতে পারে।'

'বলুক, তার সঙ্গে কোন চুক্তি হবে না,' বলল রানা।

স্মিথের পিস্তল ধরা হাত আড়ষ্ট হয়ে উঠল। রানা কোন ঝুঁকি নিল না, রিভলভারটা সরাসরি তার পেটের দিকে তাক করল। 'তাহলে আসুন, নিজেরাই নিজেদেরকে খুন করে হেনেসের কাজ সহজ করে দিই।'

রানার হাতের দিকে তাকিয়ে স্মিথ বলল, 'আমি শুধু জানতে চেয়েছি চুক্তির শর্তগুলো কি।'

'ঠিক আছে, বলছি—তার আগে পিস্তলটা রেখে দিন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পিস্তলটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল স্মিথ। 'সবাই আমরা উত্তেজিত হয়ে আছি,' বিড়বিড় করল সে, প্রায় ক্ষমা চাওয়ার সুরেই।

মাথা না তুলে প্রফেসর বললেন, 'কি চায় হেনেস?'

'চায় আমাকে,' বলল রানা। 'আমাকে আর মারিয়াকে। সিনোট থেকে সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট তুলে আনতে বলছে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি। কিন্তু কার্ল?'

'সে ভাগ্যবান, মরে গেছে।'

হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল স্মিথ, 'কি বলতে চান আপনি?'

'আমাকে সিনোটে নামতে বাধ্য করার জন্যে একে একে আপনাদের সবার ওপর টরচার করার হুমকি দিয়েছে হেনেস। হাত-পা কাটবে। প্রয়োজনে পিঠে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

ঝাঁকি খেলো স্মিথ। 'আর আপনি তা ঘটতে দেবেন? আর্টিফ্যাক্টগুলোর লোভে?'

'তাকে আমি ঠেকাতে পারব না,' বলল রানা। 'সেজন্যেই কার্ল আর ফাউলার মারা যাওয়ায় আমি খুশি। আপনারা জানেন, এয়ার বটলগুলো সিনোটে ফেলে দেয়া হয়েছে। ওগুলো ছাড়া ডাইভিং সাংঘাতিক কঠিন। আমাদের সঙ্গে আছে শুধু অল্প কয়েকটা চার্জড অ্যাকুয়ালাঙ বটল, সিনোটে দু'একবার ওঠা-নামা করা যেতে পারে। কিন্তু আর্টিফ্যাক্টগুলো তুলতে অন্তত পঞ্চাশবার ডুব দিতে হবে। আমি যখন ডুব দিতে পারব না, হেনেস পাগল হয়ে যাবে। তারপর কি ঘটবে কল্পনা করুন।'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল স্মিথ। 'ওহ্ গড, আমি বাঁচতে চাই!' তারপর কান্না থামিয়ে চকচকে চোখে প্রফেসরের দিকে তাকাল সে। 'আপনিই আমাদেরকে এই বিপদে টেনে এনেছেন! আপনিই দায়ী!' ঝট করে রানার দিকে ফিরল সে। 'প্রফেসর বুড়োকে হেনেসের হাতে তুলে দিন, তাহলে সে আমাদের মারবে না।'

'শাট আপ!' কঠিন সুরে ধমক দিল রানা।

'কিন্তু আমি মরতে চাই না!' আবার ফুঁপিয়ে উঠল স্মিথ।

'মরতে না চাইলে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, স্মিথ,' একটু নরম সুরে বলল রানা। 'যুদ্ধ করে জিততে হবে। যুদ্ধ না করলেও মরব আমরা, তবে সেটা হবে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।'

'আপনি কেন যুদ্ধ করতে চাইছেন? হেনেস আপনাকে তো টরচার করবে না।'

'আমি কেন যুদ্ধ করতে চাইছি, বুঝতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভেবে দেখুন কারণটা কি হতে পারে।'

ভাব দেখে মনে হলো স্মিথ ভাবছে। 'কেন?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনাদেরকে বাঁচার একটা সুযোগ দেয়ার জন্যে, আবার কেন,' বলল রানা। 'তা না হলে আর কি কারণে আমি লড়তে চাইব?'

প্রফেসরের দিকে তাকাল স্মিথ। 'স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়েছে।' হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা তুলে নিল সে। ম্যাগাজিন চেক করে বলল, 'পাঁচটা বুলেট—একটা আমার জন্যে, চারটে ওদের জন্যে। হ্যাঁ, মরতেই যখন হবে, লড়াই করে মরব।'

'ধন্যবাদ, স্মিথ। আপনি সত্যি সাহসী। বাইরে কি ঘটছে লক্ষ রাখুন,

প্লীজ। এক ঘণ্টা বলেছে বটে, তবে হেনেসকে আমি বিশ্বাস করি না।'

হেঁটে এসে মারিয়ার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। তার চোখ শুকিয়ে গেছে, তবে গাল এখনও ভিজে। 'কেমন আছেন?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল।

'দুঃখিত, রানা,' ফিসফিস করল মারিয়া। 'আমি ভয়ে কাঁদছিলাম···'

'তাতে দুঃখিত হবার কি আছে? আমরা সবাই ভয় পাচ্ছি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে শুধু নির্বোধ মানুষ ভয় পাবে না।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঢোক গিলল মারিয়া। 'ওরা কি সত্যি ফাউলার আর কার্লকে মেরে ফেলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর ইতস্তত করে বলল, 'মারিয়া, ওরা রিমরিগোকেও মেরে ফেলেছে। হেনেস আমাকে বলেছে।'

মারিয়ার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, চোখ দুটো আবার ভরে উঠল পানিতে। 'ওহ্, মাই গড! বেচারা আলফাঁসো! এত বেশি পেতে চাইল···এত তাড়াতাড়ি।'

বেচারাই বটে, ভাবল রানা। এত তাড়াতাড়ি কত কিছু পেতে চেয়েছিল, আর কিভাবে পেতে চেয়েছিল, সে-সব কথা মারিয়াকে বলবে না ও। বলে কোন লাভ নেই, শুধু হৃদয়টাই আরও একটু ভাঙবে। তারচেয়ে বিয়ের সময় দেখা স্বামীর কথাই মনে রাখুক মারিয়া—তরুণ, নিজের কাজে ব্যাকুল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সব কথা জানানো নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে। শুধু বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত।'

রানার বাহু ছুঁলো মারিয়া। 'কোন আশাই কি নেই আমাদের—এতটুকুও না?'

রানা ব্যক্তিগতভাবে জানে, ওদের সবাইকে মরতে হবে। মারিয়ার চোখের দিকে তাকাল ও। 'বিপদ যত বড়ই হোক, তা থেকে মুক্তির পথ সব সময় থাকে, মারিয়া,' জোর দিয়ে বলল ও।

সিধে হলো রানা, জানালার কাছে স্মিথের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কি করছে ওরা?'

'ওদের কয়েকজন শেষ মাথার কুঁড়ে দুটোয় ঢুকেছে।'

'ক'জন?'

মাথা নাড়ল স্মীথ। 'বলা কঠিন—এক একটায় পাঁচ বা ছ'জন করে হতে পারে।'

'তাহলে একটা চমক দেয়া যেতে পারে,' বলল রানা। 'হেনেস কোথায়?'

'কই, তাকে তো দেখছি না।' জানালা দিয়ে কুঁড়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে স্মিথ। 'ওরা এত কাছ থেকে ফায়ার ওপেন করলে আমাদের এই দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্লাঞ্জার বক্স আর ওটা থেকে বেরোনো তারের দিকে তাকাল রানা। কুঁড়ে দুটোয় ঢুকেছে চিকলেরোরা, লুকিয়ে রাখা জেলিগনাইট দেখে ফেলেনি তো?

সময় বয়ে চলেছে। কেউই তেমন কোন কথা বলছে না। উত্তেজনা ক্রমশ

বাড়ছে, তবে নিঃশব্দে। অস্থিরতা কমাবার জন্যে মেঝেতে বসে পড়ল রানা, স্কুবা গিয়ার চেক করল, এগিয়ে এসে ওকে সাহায্য করল মারিয়া। ধীরে ধীরে মাথায় একটা বুদ্ধি গজাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সিনোটে ওকে নামতে হতে পারে।

অকস্মাৎ লাউড হেইলারে হেনেসের কর্কশ গলা ভেসে এল। 'রানা! আপনি কথা বলতে চান?'

ছুটে প্লাঞ্জার বক্সের কাছে চলে এল রানা, ওটার পাশে হাঁটু গাড়ল। অনেক সহ্য করা হয়েছে, এবার এদিক থেকে কঠিন জবাব দেয়া দরকার। আবার চিৎকার করল হেনেস। 'আপনার সময় শেষ, রানা।' হেসে উঠল। 'নাচুন, তা না হলে টুকরো টুকরো করা হবে—একে একে সবাইকে।'

'শুনুন! শুনুন!' স্মিথ সাংঘাতিক উত্তেজিত। 'প্লেন! প্লেনের আওয়াজ!'

সত্যি তাই। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। তারপর সরাসরি মাথার ওপর চলে এল ওটা। মরিয়া হয়ে প্লাঞ্জারের হাতলটা নব্বুই ডিগ্রী মোচড়াল রানা, তারপর হ্যাচকা টান দিয়ে নিচে নামাল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ওদের কুঁড়ে ঘর দুলে উঠল। উল্লাসে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল স্মিথ। কি ঘটেছে দেখার জন্যে জানালার দিকে ছুটল রানা।

একটা কুঁড়ে আক্ষরিক অর্থেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধোঁয়া সরে যাবার পর দেখা গেল শুধু কংক্রিটের ভিতটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয় কুঁড়ের অর্ধেকটা উড়ে গেছে, সেটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে কয়েকটা সাদা মূর্তি। স্মিথ গুলি শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চেপে ধরল রানা। 'স্টপ! বুলেট নষ্ট হচ্ছে।'

প্লেনটা আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, যদিও রানা সেটাকে দেখতে পেল না। 'কে জানে কোত্থেকে এল। প্লেনটা হেনেসের হবারই বেশি সম্ভাবনা।'

হেসে উঠল স্মিথ, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। 'শালাদের আমরা ভয় পাইয়ে দিয়েছি, মি. রানা! ওরা ভাবছে আমাদের কাছে আরও না জানি কত চমক আছে। আর প্লেনটাকে আমরা কি একটা সিগন্যাল দিলাম। আপনি বলছেন ওটা হেনেসের? কিন্তু না-ও তো হতে পারে!'

হেনেসের তরফ থেকে কোন সাড়া নেই। বিস্ফোরণের সঙ্গে লাউড হেইলার বোবা হয়ে গেছে। জানে মিথ্যে, তবু রানা আশা করল, ডায়নামো ডিকানডিয়া বেঁচে নেই।

এক ঘণ্টা কোন শব্দ হলো না বা কিছু নড়ল না। তারপর শুরু হলো রয়ে-সয়ে নিয়মিত রাইফেল ফায়ার। কুঁড়ের প্লাস্টিক দেয়াল ফুটো হতে শুরু করল। ভেতর দিকে অতিরিক্ত তক্তা লাগানো হয়েছিল, বুলেট ঠেকাতে সেগুলো কোন কাজে এল না। ফুটোর পাশে ফুটো তৈরি হচ্ছে, আকারে বড় হচ্ছে ফাঁক। হেনেসের পরিকল্পনা পরিষ্কার, কুঁড়েটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে সে। ঘরের ভেতর মাত্র তিন চারটে গাছের গুঁড়ি এনে রেখেছিল কার্ল, ওগুলোই এখন

একমাত্র আড়াল। কিন্তু সমস্যা হলো, ওগুলোয় লেগে দিগ্বিদিক ছুটছে বুলেটগুলো। যে-কোন সময় যে-কেউ আহত হতে পারে।

কান পেতে রানা বুঝতে পারল, তিন কি চারজন লোক গুলি করছে। ভাবল, বাকি চিকলেরোরা কোথায়?

বিস্ফোরণের পর দুই কি তিনবার ক্যাম্পের ওপর চক্কর দিয়েছিল প্লেনটা, তারপর চলে গেছে। ওটা হেনেসের হয়ে থাকলে ওদের দুর্ভাগ্য। আর হেনেসের না হলেই বা কি, পাইলট যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেও, সাহায্য এসে পৌঁছুবার আগেই ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে যাবে।

দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকল একটা বুলেট, আশঙ্কায় ঝাঁকি খেলো রানা, এক টুকরো প্লাস্টিক পড়ল হাতে। দ্রুত চিন্তা করছে ও। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা যায়, আর নয়তো ছুটে পালাতে গিয়ে বাইরে গুলি খেতে হয়। আর কোন বিকল্প নেই।

স্মিথ বলল, 'বাকি সবাই কোথায় বলুন তো, মি. রানা? সামনে চিকলেরোরা চারজনের বেশি হবে না।'

ঠোঁট টান টান করে হাসল রানা। 'বাইরে গিয়ে দেখে আসতে চান?'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্মিথ। 'আমার দায় পড়েনি। মারতে হলে এখানে ঢুকতে হবে ওদেরকে। ওরা বাইরে থাকায় আমরা সুবিধে পাচ্ছি।'

রানার দেয়া রিভলভার হাতে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে রয়েছে মারিয়া। ভয় কে না পাচ্ছে, তবে সবার মত মারিয়াও সেটা লুকিয়ে রাখতে পারছে। বেলফোর্স চুপচাপ দাঁড়িয়ে, হাতে শটগান নিয়ে নিয়তি কি করে দেখার অপেক্ষায় আছেন।

সময় বয়ে চলেছে। রাইফেলের বুলেটগুলো নিয়মিত ছুটে আসছে, আঘাত করছে কুঁড়ের দেয়াল ঘেঁষে ফেলে রাখা গাছের গুঁড়িতে। মেঝের কাছাকাছি নিচু হলো রানা, দেয়ালের একটা ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে তাকাল—সন্দেহজনক নিয়মটার কথা মনে পড়ল, একই জায়গায় কখনও দু'বার বজ্রপাত হয় না। মার্কসম্যানরা সবাই লুকিয়ে আছে, তাদের পজিশন বোঝার কোন উপায় নেই। বুঝলেও তেমন কোন লাভ হত না—ওদের কাছে রাইফেল মাত্র একটা, আর তাতে গুলি আছে মাত্র দুটো।

কুঁড়ে থেকে ত্রিশ ফুট দূরে পড়ে রয়েছে ফাউলারের লাশ। বাতাস তার শার্টে টান দিচ্ছে, ঢেউ তুলছে কাপড়ে, চুলের গোছাগুলোকে নাচাচ্ছে।

চোখ আরও ওপরে তুলে বিধ্বস্ত কুঁড়ে দুটোর দিকে তাকাল রানা, তারপর ওগুলোকে ছাড়িয়ে ওয়াশওয়ানোক ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করল রানা। 'স্মিথ!'

'বলুন।'

'বাতাস বাড়ছে।'

একটা ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে তাকাল স্মিথ। তারপর ক্লান্ত সুরে বলল, 'হ্যাঁ। তো কি?'

জঙ্গলের দিকে আবার তাকিয়ে রানা দেখল গাছপালার মাথা নুয়ে নুয়ে

পড়ছে। 'প্রফেসর, বর্ষা কবে শুরু হবার কথা?'

'সময় হয়ে গেছে, যে-কোন দিন শুরু হবে,' বললেন প্রফেসর।

'এখন যদি আপনি আকাশে মেঘ আর বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেন, কি বলবেন?'

'বলব বর্ষা মরশুম শুরু হয়েছে।'

আরেকটা বুলেট আঘাত করল কুঁড়েতে, কাঠের একটা স্প্লিন্টার বিঁধল রানার পায়ের গোড়ালিতে। 'আরে!' আতঙ্কিত স্মিথ চেঁচিয়ে উঠল। 'বুলেটটা কোনদিক থেকে ঢুকল?' কাঠের মেঝেতে এবড়োখেবড়ো গর্তটার দিকে আঙুল তাক করল সে।

স্মিথ কি বলতে চায় বুঝতে পারছে রানা। অসম্ভব একটা কোণ ধরে ভেতরে ঢুকেছে বুলেটটা। গর্তটা রিকাশেট থেকে তৈরি হয়নি। আরেকটা বুলেট ঢুকল, ঝাঁকি খেয়ে উল্টে পড়ল একটা চেয়ার। এবার বুঝতে পারল রানা কি ঘটছে। পরের বুলেটটার জন্যে অপেক্ষায় থাকল ও। একটু পরই ঢুকল সেটা। ঢুকল ছাদ ফুটো করে। সিনোটের পিছনে পাহাড়ের গায়ে উঠে পড়েছে চিকলেরোরা, কুঁড়ের ছাদে গুলি করছে তারা।

পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটল। দেয়ালে গাছের গুঁড়ি থাকায় এতক্ষণ ওরা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ছাদ ফুটো করে আসা বুলেট ঠেকাবার কোন আয়োজন বা ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ল ওরা। ভঙ্গুর অ্যাসবেসটস বোর্ড দু'জায়গায় গুঁড়িয়ে গেছে, চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রানা। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে থাকলে গোটা ছাদ চিকলেরোরা ওদের মাথার ওপর নামিয়ে দিতে পারবে। অবশ্য তার আগেই সবাই ওরা মারা যাবে।

কুঁড়ের যে দেয়ালটা পাহাড়ের সবচেয়ে কাছে সেটার কোণে সরে যেতে পারে ওরা, তাহলে আপাতত ছাদ থেকে নেমে আসা বুলেট ওদেরকে লাগবে না, কিন্তু ওখান থেকে দেখা যাবে না কুঁড়ের সামনে কি ঘটছে। তা যদি সরে যায় ওরা, হেনেসকে শুধু হেঁটে এসে দরজা ভাঙতে হবে—কেউ ওরা তাকে গুলি করার পজিশনে থাকবে না।

ওপর থেকে আরেকটা বুলেট ছুটে এল। 'স্মিথ, যাবে? তুমি গেলে তোমার সঙ্গে থাকব আমি।'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না!' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল স্মিথ। 'আমি এখানেই মরব।'

কথাগুলো বলার দশ সেকেন্ড পর চাঁদিতে বুলেট খেয়ে মারা গেল সে। লাশটার ওপর ঝুঁকল রানা, তখুনি আরেকটা বুলেট নেমে এল—না ঝুঁকলে রানার কপালে লাগত। বেলফোর্স চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রানা! জানালা!' পরমুহূর্তে শটগানের আওয়াজ পেল রানা।

একজন লোক আর্তনাদ করে উঠল। মাটিতে বসা অবস্থায় পাক খেলো রানা, হাতে রিভলভার। দেখল ভাঙা জানালা থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে একজন চিকলেরো, ধূমায়িত শটগানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে প্রফেসর। নির্ভয়ে এগিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি, শটগান থেকে

আরেকটা গুলি করলেন। বাইরে কেউ আর্তনাদ করে উঠল।

পিছিয়ে এসে শটগান ভাঁজ করলেন প্রফেসর, রিলোড করছেন। কাজটা শেষ হতেই লাফ দিয়ে আবার জানালার সামনে চলে গেলেন। তাঁর পাশে সিধে হলো রানা। দেখল একজন চিকলেরো এক পায়ে লাফাতে লাফাতে আড়ালের দিকে ছুটছে, আরেকজন লাটিমের মত ঘুরছে আর সাইরেন বা সদ্যপ্রসূত শিশুর মত ওঁয়া-ওঁয়া করছে। দু'জনকেই প্রফেসরের হাতে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় চিকলেরোর দিকে রিভলভার তুলল রানা। লোকটা দরজার কাছে চলে এসেছে, চার ফুট দূরেও নয়। একটাই গুলি করল ও। হার্টের ওপর বুক চেপে ধরে পড়ে গেল সে।

ঝপ করে বসে পড়ল রানা, পরমুহূর্তে জানালার অবশিষ্ট কাচ চুরমার হয়ে গেল। একই সঙ্গে আরও দুটো বুলেট নেমে এল ছাদ থেকে। রানার আগেই মেঝেতে শুয়ে পড়েছেন প্রফেসর। কনুই দিয়ে রানাকে গুঁতো মারলেন তিনি। বললেন, 'আপনি বেরিয়ে যান, ফর গড'স সেক! এখুনি, জলদি!'

'আর আপনি?'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আমি তো এমনিতেও একটা লাশ। নিশ্চিন্ত থাকুন, হেনেস আমাকে জীবিত পাবে না।'

চিন্তা করার বেশি সময় নেই। মারিয়াকে নিয়ে সিনোটে পৌঁছুতে পারলে আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকার উপায় হয়। কিন্তু তারপর কি হবে? সিনোট থেকে এক সময় না এক সময় উঠতে হবে ওদেরকে। আর উঠলেই গুলি করবে হেনেস। তারপর টানেলটার কথা মনে পড়ল।

মারিয়ার কব্জি ধরে ঝাঁকাল ও। 'তৈরি হন, জলদি!'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মারিয়া। মাথা কাজ না করায় বুঝতে পারছে না কি বলছে রানা। ঠাস করে তার গালে একটা চড় মারল রানা। 'তৈরি হন, তৈরি হন! স্কুবা গিয়ার···' আঙুল দিয়ে দেখাল ও।

চড় খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে মারিয়া। গা থেকে কাপড়চোপড় প্রায় ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলল, দ্রুত হাতে পরে নিল ওয়েট-স্যুট, রানা তাকে হারনেস পরতে সাহায্য করল। 'প্রফেসরের কি হবে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'তাঁর কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনার কাজ আপনি করুন।'

রাইফেল ফায়ারের সংখ্যা কমে গেছে, কারণটা রানা বুঝতে পারছে না। হেনেসের জায়গায় ও হলে ঠিক এই সময়েই গুলির মাত্রা বাড়িয়ে দিত। ওরা তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে মাত্র একটা বুলেট ছাদ ফুটো করল। প্রফেসরের দিকে ফিরল রানা। 'বাইরে কি দেখছেন?'

জানালা দিয়ে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর, হঠাৎ দমকা বাতাস এসে মাথার সাদা চুল এলোমেলো করে দিল। 'আমার ভুল হয়েছে, রানা,' হঠাৎ বললেন তিনি। 'একটা ঝড় আসছে।'

'তাতে আমাদের কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। জোড়া এয়ার বটলের প্যাকটা খুব ভারী লাগছে ওর কাঁধে, জানে খুব জোরে দৌড়াতে পারবে না। মারিয়া তো আরও পারবে না। হেনেস যদি গুলি নাও

করে, চিকলেরোরা ওদেরকে ধরে ফেলতে পারে।

'যাবার সময় হয়েছে,' বললেন প্রফেসর, হাতে একটা রাইফেল নিলেন। সমস্ত অস্ত্র জানালার কাছে জড়ো করেছেন তিনি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কিছুই বলার দরকার নেই, রানা। এমন কি বিদায় চাওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। স্রেফ এই নরক ছেড়ে বেরিয়ে যান।' রাইফেল উঁচিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরলেন তিনি, জানালার পাশে সরে গেলেন। 'আমি আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করব।'

দরজায় ঠেকিয়ে রাখা টেবিলটা সরাল রানা, তারপর মারিয়াকে বলল, 'কবাট খুললেই ছুটবেন। শুধু একটা কথা মাথায় রাখবেন, আপনাকে সিনোটে পৌঁছুতে হবে। ওখানে পৌঁছে এক সেকেন্ডও দেরি করবেন না, ডুব দেবেন পানিতে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়া, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'কিন্তু ওনার···'

'আপনাকে ভাবতে হবে না,' বলল রানা। 'যান···এখুনি!'

রানা দরজা খুলতেই ছুটে বেরিয়ে গেল মারিয়া। মাথা নিচু করে তাকে অনুসরণ করল রানা, বাইরের মাটিতে পা ফেলেই দিক পরিবর্তন করল। একটা রাইফেল গর্জে উঠল, তবে বোঝা গেল না চিকলেরোরা করছে, নাকি প্রফেসর ওদেরকে কাভার দিচ্ছেন। মারিয়া সামনে, কুঁড়ের কোণ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা বাঁক নিচ্ছে, নিরেট দেয়ালের মত বাড়ি মারল বাতাস। দু'জনের কেউই ছুটতে পারছে না, বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোচ্ছে। মাঝে মধ্যে গুলি হচ্ছে, না হবার মতই, কোনটাই ওদের দিকে আসছে না। চোখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কি কারণে গুলি হচ্ছে না। সিনোটের ওপর গোটা পাহাড়ে বিপুল আলোড়ন শুরু হয়েছে, একশো ফুটী গাছগুলো নুয়ে পড়তে চাইছে মাটিতে। রানা ধারণা করল, এই মুহূর্তে পাহাড়ে যারা আছে তারা বাঁচবে বলে মনে হয় না।

দূর থেকেই রানা দেখল সিনোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে মারিয়া। ছুটে এসে তার পিঠে ধাক্কা মারল ও। কিনারা থেকে ত্রিশ ফুট নিচের পানিতে পড়ল মারিয়া। এক সেকেন্ড পর রানাও লাফ দিল।

বারো

ডুব দিয়ে সিনোটের মাঝখানে চলে এল ওরা, ভেলা থেকে নিচে ফেলা শট লাইন ধরে পঁয়ষট্টি ফুট লেভেলে নেমে এল। এরপর সাঁতরে গুহার মুখে পৌঁছুতে কোন সমস্যা হলো না। রানার পাশেই পানি থেকে মাথা তুলল মারিয়া, তাকে ঢালে উঠতে সাহায্য করল ও। 'ওয়াশওয়ানোকে এরচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কোথাও আপনি পাবেন না।'

মাস্ক খুলে রানার দিকে তাকাল মারিয়া। 'কিন্তু কতক্ষণের জন্যে?' তার দৃষ্টিতে অভিযোগ। 'আপনি প্রফেসরকে ফেলে এলেন কেন? তাঁকে মেরে ফেলা হবে জানার পরও?'

'থেকে যাবার সিদ্ধান্তটা তাঁর নিজের,' জবাব দিল রানা। 'ভালভের সুইচ অফ করুন, বাতাস নষ্ট করছেন।'

অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গুহার পিছনের দেয়ালটা একার চেষ্টাতেই উঁচু করল রানা। মারিয়াকে একা রেখে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে ওকে, দেয়াল তুলে টানেল উন্মুক্ত করায় মারিয়াকে বাতাসের অভাবে কষ্ট পেতে হবে না। তবে সমস্যা অন্যখানে—সিনোটের এত নিচে যতক্ষণ থাকবে ওরা, ওঠার সময় ডিকমপ্রেশনের জন্যে ঠিক ততটা সময় ব্যয় করতে হবে—কিন্তু ব্যাকপ্যাকের বটলে দীর্ঘমেয়াদী ডিকমপ্রেশনের জন্যে যথেষ্ট বাতাস নেই। মাস্কটা তুলে নিল রানা, পরার আগে পানিতে ভেজাল।

কাত হয়ে শুয়ে ছিল মারিয়া, ঝট করে সিধে হয়ে বসল। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'সিনোটের তলায়,' বলল রানা। 'বেশি দেরি করব না। কোন ভয় নেই, আরাম করে শুয়ে থাকুন।' চোখ তুলে আলো আর আর্টিফ্যাক্টগুলোর দিকে তাকাল ও। 'কিংবা ওগুলো দেখে সময় কাটান। ইচ্ছে হলে কার্নিসে উঠে যেতে পারেন।'

'আমি কোন সাহায্যে আসব না?'

চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'না। শুধু শুধু বাতাস নষ্ট হবে। আপনার বটলে যে-টুকু আছে পরে আমার তা প্রয়োজন হতে পারে।'

মুখ তুলে আলোটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল মারিয়া। 'ওটা নিভে যাবে না তো? এখনও যে জ্বলছে, সেটাই তো আশ্চর্য।'

'ভেলার ওপরে ওগুলো নতুন ব্যাটারি। হাসিখুশি থাকুন, সময়টা কেটে যাবে।'

মাস্ক পরে পানিতে নামল রানা, সাঁতরে গুহা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সরাসরি সিনোটের তলায় চলে এল। নিচে নেমে প্রথমে একটা ওয়ার্কিং লাইট পেল ও। জ্বালবে কি জ্বালবে না ভেবে ইতস্তত করছে, জ্বাললে সারফেস থেকে আলোটা হয়তো দেখা যাবে। শেষে ঝুঁকিটা নিল; ভাবল, ডেপথ চার্জ না করে হেনেস ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ভেলা থেকে কার্ল আর ও, দু'জন মিলে কয়েকটা এয়ার সিলিন্ডার ফেলেছিল নিচে, সেগুলো খুঁজছে রানা। পেল বটে, কিন্তু ছড়ানো অবস্থায়। সিলিন্ডারের সঙ্গে যে ম্যানিফোল্ডটা ফেলেছিল, সেটা পেতে আরও বেশি সময় লাগল। কুণ্ডলী পাকানো এয়ার হোসের তলায় পড়ে আছে। লূপ রোপের সঙ্গে স্প্যানারটাও রয়েছে দেখে সন্তুষ্টবোধ করল ও।

সিলিন্ডারগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। ওগুলো এক করার পর ম্যানিফোল্ডের সঙ্গে সংযোগ দিতে হলো। ডাইভার আর অ্যাসট্রনটের ওজনহীনতার সমস্যা প্রায় একই

রকম—যতবার একটা নাট টাইট করতে চাইল রানা, ততবার সিলিন্ডারকে ঘিরে উল্টোদিকে সরে যেতে চাইল শরীরটা। এক ঘণ্টার ওপর হয়ে যাচ্ছে সিনোটের তলায় রয়েছে ও, তবে ওর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সিলিন্ডারগুলোকে ম্যানিফোল্ডের সঙ্গে জোড়া লাগিয়েছে, সবগুলো কক খোলা। এখন সিলিন্ডারের সমস্ত এয়ার হোসের শেষ মাথায় ডিমান্ডে পাওয়া যাবে।

পিছনে হোস নিয়ে গুহায় মাথা তুলল রানা, ঢাল বেয়ে শুকনো মেঝেতে উঠে বসল। পিছনের পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে মারিয়া। 'ধরুন এটা,' বলল রানা। কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর আর নড়ল না। অগত্যা হোসটা আরও একটু টেনে তার ওপরই বসল রানা। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'কিছু না। আমি প্রফেসরের কথা ভাবছি।'

'ও।'

'ও? আর কিছু বলার নেই আপনার?' রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মারিয়া। তারপর জানতে চাইল, 'উনি কি মারা গেছেন?'

'গেলে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে,' জবাব দিল রানা 'তবে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

'হোয়াট?' আঁতকে উঠল মারিয়া 'মানে?'

'আপনি ভেবেছেন আমি একটা অমানুষ? শুনুন, উনি নিজের ইচ্ছায় থেকে গেছেন। কারণ আর মাত্র তিন মাস বাঁচবেন—ক্যান্সার উনি যদি সিনোটে নামতে চাইতেনও, আমরা তাঁকে আনতে পারতাম কি?'

'গড! ওহ্ গড! ওনার ক্যান্সার? মাত্র তিনমাস বাঁচবেন?' কেঁদে ফেলল মারিয়া। 'রানা, আপনাকে আমি···সত্যি আমি দুঃখিত।' কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর জানতে চাইল, 'তাহলে যাচ্ছেন কেন? আর যদি যানই, আমাকে কেন সঙ্গে নেবেন না?'

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। ব্যাটারি নিঃশেষ হয়ে গেলে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে ল্যাম্প, তারপর নিভে যায়। কিন্তু সেভাবে নিভল না। দপ করে নিভে গেল, যেন একটা সুইচ অফ করা হয়েছে। ভয়ে আঁতকে উঠল মারিয়া। 'শান্ত হন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি।'

'ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'সম্ভবত,' বলল রানা, তবে জানে কথাটা সত্যি নয়। হয় কেউ ইচ্ছে করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে, নয়তো সার্কিটে কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

'এই অন্ধকারে একা আমি থাকব কিভাবে?' কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইল মারিয়া। 'রানা, প্লীজ, আপনার সঙ্গে আমিও যাই।'

'সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?'

'মারিয়া ওপরে ওঠার জন্যে মাত্র একজনের মত বাতাস আছে। দু'জন

উঠতে চেষ্টা করলে দু'জনেই মারা পড়ব। আপনি একা যেতে পারবেন না, কারণ ওখানে কি ঘটে গেছে বা ঘটছে আমরা জানি না। হেনেস যদি হাল ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলেও আপনি কোন উপকারে আসবেন না। কমপ্রেসর পার্টস লুকিয়ে রেখে গেছে কার্ল, কমপ্রেসর আবার চালু করতে হলে ওগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আপনার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'না, সম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল মারিয়া।

'কাজেই আমাকে যেতে হচ্ছে। আপনাকে একা অন্ধকারে রেখে যেতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই।'

'ওপরে কতক্ষণ থাকবেন?'

'দু'ঘণ্টা লাগবে উঠতে। কমপ্রেসর চালু করতে আরও এক ঘণ্টা। অন্ধকারে থাকতে হবে, কিন্তু এখানে আপনার অন্য কোন সমস্যা নেই। টানেলে প্রচুর বাতাস। এক দু'মাসেও ফুরাবে না

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।' জোর করে হাসল মারিয়া। 'এক দু'মাস শুধু বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকতে বলেন?'

'কথার কথা বললাম আর কি।'

'না, একটা সময় বেঁধে দিয়ে যান। কতক্ষণ পর ফিরবেন?'

'খুব বেশি হলে পাঁচ কি ছয় ঘণ্টা,' বলল রানা। 'কথা দিলাম, এর ভেতরই ফিরে আসব।'

'ছ'ঘণ্টা পরও যদি না ফেরেন, আমি তাহলে ধরে নেব কোনদিনই আপনার ফেরা হবে না, তাই না?'

মারিয়া মিথ্যে আশঙ্কা করছে না। তবে রানা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। 'তার অনেক আগেই ফিরে আসব আমি।'

'এখানে একা না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে ডুবে মরা অনেক ভাল।'

'খবরদার, মারিয়া!' বিস্ফোরিত হলো রানা। 'আমি না ফেরা পর্যন্ত এই গুহা ছেড়ে এক পা-ও কোথাও যাবেন না। পানিতে তো নামবেনই না, টানেলেও ঢুকবেন না। আমি ফিরে এসে ঠিক এখানেই যেন পাই আপনাকে। কথা দিন!'

'ঠিক আছে,' ফিসফিস করল মারিয়া, তারপর অকস্মাৎ রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে শক্ত কাঠ হয়ে গেল রানা। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবে অনুভব করা যায়—কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে মারিয়ার পিঠ। রানার আড়ষ্ট ভাব টের পেয়ে সে-ও শক্ত হয়ে গেল। নিজেকে সরিয়ে নিতে যাবে, এই সময় পিঠে অনুভব করল রানার হাত—অভয় আর সান্ত্বনার স্পর্শ।

এক সময় ঠেলে মারিয়াকে সরিয়ে দিল রানা। 'আর দেরি করা উচিত নয়,' বলে হোসটা ধরার জন্যে অন্ধকারে হাতড়াল ও। আঙুলে লেগে ধাতব কি যেন একটা উল্টে গিয়ে আওয়াজ তুলল পাথরে, ঢাল বেয়ে পানিতে পড়ার আগেই খপ করে ধরে ফেলল। অপর হাতে হোসটাও চলে এসেছে। মাস্কটা কপাল থেকে মুখে নামাল। হাতের জিনিসটা কাজে বাধা সৃষ্টি করছে, বিরক্ত হয়ে হারনেস স্ট্র্যাপের পিছনে গুঁজে রাখল। 'আমি ফিরবই,' কথা দিল

মারিয়াকে, হড়কে নেমে এল পানিতে, হোসটা টেনে আনছে।

সত্তর ফুট হোসের ওজন নিচের দিকে টানছে রানাকে, সাঁতরে শট লাইনের অনেক নিচে পৌঁছুল ও। তবে পৌঁছানোর পর আর কোন অসুবিধে হলো না, বরং আরও খানিকটা হোস টেনে নিতে পারল, সেটাকে ওর ফিন-ফাসনার দিয়ে লাইনের সঙ্গে আটকেও ফেলল। এখন আর ফিন দরকার নেই ওর।

ধীরে ধীরে লাইনের থারটি ফুট মার্কে উঠে এল রানা। এবার শট লাইনের স্লিংটা মাথায় গলিয়ে হারনেসে আটকানো ডিমান্ড ভালভে হোসের প্লাগ ঢোকাল, ফলে সিনোটের তলায় পড়ে থাকা বড় আকৃতির বটলগুলো থেকে এয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে—ছোট হারনেস বটল রিজার্ভ হিসেবে থাকল। কাজটা সেরে হাতঘড়ি দেখল। ত্রিশ ফুটে পনেরো মিনিট, বিশ ফুটে পঁয়ত্রিশ মিনিট, আর দশ ফুটে পঞ্চাশ মিনিট থামতে হবে ওকে।

নিয়ম ধরে এক সময় ভেলার নিচে পৌঁছে গেল রানা, তবে ইতিমধ্যে রিজার্ভ বটলের এয়ারও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যা থাকে কপালে, ভেলার পাশে পানির ওপর মাথাও তুলল ও। দ্রুত চোখ বুলিয়ে সিনোটের চারদিকে কাউকে দেখতে পেল না। বাতাসের হাহাকার ধ্বনি ছাড়া অন্য কোন আওয়াজও নেই। তবে ঝড়ের সেই উন্মত্ততা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। খানিক পর ভেলায় উঠে স্কুবা হারনেস খুলে ফেলল রানা। ভেলার মেঝেতে কি যেন একটা গড়িয়ে গেল। ঝট করে চারদিকে তাকাল রানা, ভয় পাচ্ছে আওয়াজটা কেউ শুনে ফেলল কিনা। তারপর চোখ নামিয়ে দেখল কি গড়াল। জিনিসটা গুহা থেকে নিয়ে এসেছে ও—মায়ান কিশোরীর স্বর্ণমূর্তি, উলমা দে পেলায়েজ যেটা নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। মূর্তিটা বেল্টে গুঁজে আবার কান পাতল রানা।

সাঁতরে কার্লের তৈরি ডকে পৌঁছুল ও, ধাপ বেয়ে উঠে এল সিনোটের মাথায়। তারপর আর পা চলে না, ক্যাম্পের অবস্থা দেখে স্থির পাথর হয়ে গেল। ক্যাম্পটা নেই বললেই হয়। বেশিরভাগ কুঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু ভিত। গোটা এলাকায় পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে আছে ভাঙা ডালপালা, এমন কি শিকড় সহ গোটা গাছও উড়ে এসে এমন সব জায়গায় পড়েছে যেন পথ আগলানোই উদ্দেশ্য। চারপাশে কোথাও কোন মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই।

শেষ যে কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা, সেদিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। প্রকাণ্ড একটা গাছ পুরোপুরি চাপা দিয়ে রেখেছে কুঁড়েটাকে, গাছটার শিকড়গুলো তির্যকভাবে আকাশের দিকে তাক করা। নিজেকে সম্মোহিত লাগছে রানার, হাঁটার সময় পায়ে লেগে মট মট করে ডালপালা ভাঙছে। কুঁড়েটার কাছাকাছি চলে এসেছে, তিন কি চার রঙা একটা পাখি ভেতর থেকে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ল।

কুঁড়েটাকে ঘিরে চক্কর দিল রানা, তারপর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। গাছের শাখাগুলো ওর শরীরের মত মোটা। ওগুলোর ভেতরই কোথাও স্পেযার স্কুবা বটল আছে, সিনোটের নিচে থেকে মারিয়াকে তুলে আনার

জন্যে লাগবে ওর।

ভেতরে কোথাও প্রফেসর বেলফোর্সও আছেন!

পাশাপাশি একজোড়া ম্যাচেটি পড়ে থাকতে দেখল রানা, কেউ যেন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। ছোট শাখাগুলো কেটে আরেকটু ভেতরে ঢুকল ও। এভাবে দশ মিনিট ধরে এগোবার পর একটা হাত আবিষ্কার করল। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, এ নিশ্চয়ই কোন লাশের হাত। আরও কিছু ডালপালা কাটার পর দেখা গেল—না, হাতটা প্রফেসরের নয়, স্মিথের। তবে মিনিট পাঁচেক পর প্রফেসরকেও পেয়ে গেল।

যে শাখার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছেন বেলফোর্স, সেটাই তাঁকে কুঁড়ের মেঝের সঙ্গে চাপা দিয়ে রেখেছে। ঝুঁকে বাহু ছুঁতেই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা—শরীরটা এখনও গরম! তারপর পালসও পেল। প্রফেসর বেঁচে আছেন! মারিয়া ডন ডায়নামো ডিকানডিয়ার হাতে মারা পড়েননি, এমন কি প্রাচীন শত্রুর হাতেও না। তিনি বেঁচে আছেন প্রকৃতির উন্মত্ততাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, যে উন্মত্ততা প্রকাণ্ড একটা গাছকে তুলে এনে কুঁড়েটার ওপর আছড়ে ফেলে।

ম্যাচেটি দিয়ে ডালপালা কাটতে শুরু করল রানা। মেঝে আর দেয়ালের কোণে আটকা পড়েছে শরীরটা, কাজেই মুক্ত করতে বেশিক্ষণ লাগল না। অচেতন প্রফেসরকে বুকে তুলে নিল ও, খোলা জায়গায় রোদের মধ্যে এনে শুইয়ে দিল। জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই, তবে এরইমধ্যে চেহারার রঙ খানিকটা ফিরে এসেছে। আপাতত তাঁকে একা রেখে আরও জরুরী কাজে মন দিল রানা।

কমপ্রেসর পার্টস কুঁড়ের কাছাকাছি একটা গর্তে লুকানো হয়েছিল, গর্তটা ভরে ওপরে আলগা মাটি ছড়ানো আছে। কিন্তু গোটা এলাকা গাছের শাখা-প্রশাখা আর ভাঙা ডালপালায় ঢাকা, গর্তটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে। এত ডালপালা এল কোত্থেকে? প্রশ্নটা মনে জাগতেই চোখ তুলে সিনোটের মাথার ওপর পাহাড়ের দিকে তাকাল রানা। তাকাতেই দম আটকে এল ওর। গোটা রিজ থেকে সমস্ত গাছপালা অদৃশ্য হয়েছে, যেন কার্ল তার লোকজনকে নিয়ে পাওয়ার শ আর ফ্লেইম-থ্রোয়ার দিয়ে সাফ করে ফেলেছে সব।

পাহাড়টা থেকে শুধু গাছপালা নয়, মাটিও অদৃশ্য হয়েছে। মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে নগ্ন পাথর। আর চূড়ায়, আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত, সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াম চ্যাচ মন্দির। রানার চোখে পলক পড়ছে না, বহু বছর আগে উলমা দে পেলায়েজ প্রথম যখন দেখেছিলেন মন্দিরটা তখন তার চোখেও সম্ভবত পলক পড়েনি।

গোটা রিজটা আরও ভালভাবে দেখতে পাবার জন্যে খানিকটা পিছিয়ে এল রানা, হাতের ম্যাচেটি মাটিতে রেখে এক জায়গায় বসল। রোদ লাগায় হলুদ বর্ণ হয়ে আছে পাহাড়ের গা, চকচকে একটা ভাবও আছে, তবে পাহাড়টাকে সোনার একটা বিশাল স্তূপ বলে মনে হলো না। সম্ভবত পাথরের রঙটাই হলদেটে। তাছাড়া, চূড়া বা আশপাশে যীশুর কোন আকৃতিও চোখে

পড়ল না। অবশ্য কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে অনেক পাহাড়কেই মানুষের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া যায়। উলমা দে পেলায়েজ তাঁর চিঠিতে অনেক বিষয়েই অতিরঞ্জন করেছেন, এক্ষেত্রেও তাই ধরে নিতে হবে।

'আমি দেখে এসেছি, মি. রানা। কথায় বলে না, চকচক করলেই সোনা হয় না, এখানেও তাই ঘটেছে। পাহাড়টা সোনার নয়।'

ঘাড় ফেরাতেই রয় হেনেসকে দেখতে পেল ও, হাতে রিভলভার। চেহারা তোবড়ানো পুতুলের মত, যেন গোটা বনভূমি তার একার ওপরই আছাড় খেয়েছে। গায়ে জ্যাকেটটা নেই, ছেঁড়া শার্টটা কোন রকমে ঝুলে আছে কাঁধের সঙ্গে, লোম ঢাকা বুকে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন আর রক্ত। ট্রাউজারের একটা পায়া হাঁটু পর্যন্ত আছে, বাকিটা নেই। রানাকে ঘিরে ঘুরছে সে। খোঁড়াচ্ছে, এক পায়ে জুতো নেই। তবে রানার চেয়ে ভাল অবস্থা তার, হাতে রিভলভার আছে।

ঘামে ভেজা মুখে খালি হাতটা ঘষল হেনেস। 'নড়বেন না, রানা; যেমন বসে আছেন তেমনি থাকুন। দাঁড়ানো শত্রুকে আমি বিশ্বাস করি না।' আরেকটু হেঁটে রানার সরাসরি সামনে চলে এল সে।

কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ম্যাচেটিটা ওর পাশেই পড়ে আছে, ওদিকে একটু কাত হলেই আঙুলের নাগালে চলে আসবে। কিন্তু হেনেস ওকে নড়তে দেখলেই গুলি করবে।

'কি, বোবা হয়ে গেলেন যে? কিছু বলছেন না কেন? ডায়নামো ডিকানডিয়াকে আপনার কিছু বলার নেই? আজ সকালে তো মুখে খৈ ফুটছিল।' হেসে উঠল হেনেস। 'এখন আমার বলার পালা, রানা। তবে আমি আবার শুধু বলায় বিশ্বাস করি না, করায় বিশ্বাস করি। শুনতে চান কি করব? খুন করব, তবে সেটা আপনার জন্যে কোন আশ্চর্য খবর নয়, জানি। আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো কিভাবে খুন করব।'

রানা স্থির, চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না।

হেনেসের চোখে খুনের নেশা চকচক করছে। দীর্ঘকালের প্র্যাকটিস, এই কাজেই সবচেয়ে দক্ষ সে। সেজন্যেই আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। প্রতিপক্ষ এখন শুধু রানা, বাকি সবাই মারা গেছে, কাজেই এখন আর তার রানাকেও দরকার নেই। আর্টিফ্যাক্টগুলো কোথায় আছে জানে সে, পরে লোকজন এনে উদ্ধার করতে পারবে। 'আপনাকে কষ্ট দিয়ে মারা হবে, রানা। কারণ আপনি আমাকে সাংঘাতিক ভুগিয়েছেন। গরম একটা মাত্র বুলেট দিয়ে আপনার পেট ফুটো করব, তাতে মরতে অনেক সময় লাগবে।'

হেনেস অন্য কিছু নয়, এই মুহূর্তে শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাবছে।

আর রানা ভাবছে আত্মরক্ষার কথা। তবে পেটে গুলি করা হবে শুনে মনে মনে খুশি হয়েছে ও। পেটে গুলি খাওয়া মানুষ মরতে সময় নেয়, ঠিকই বলেছে হেনেস। সেই সময়টা কাজে লাগাতে পারলে হেনেসকেও সঙ্গে নিতে পারবে। ছুরি বা ম্যাচেটি ছুঁড়ে ও কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

প্রশ্ন হলো, হেনেসকে নিয়ে যখন মরতে চাইছে ও, পেটে গুলি খাবার

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

বিনা অনুমতিতে
সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

জন্যে অপেক্ষা করার কি দরকার?

কাত হলো রানা। আঙুল দিয়ে ম্যাচেটি ছুঁলো। ভঙ্গিটা শান্ত ও স্বাভাবিক।

'ওহ্, নো!' শক্ত হয়ে গেল হেনেস, হাতের রিভলভারটা ঝাঁকাল। 'ওহ্, নো! ছাড়ুন। ফেলে দিন ওটা!'

রানা ম্যাচেটিটা আরও শক্ত করে ধরল। সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাকিয়ে আছে রিভলভারের ট্রিগারে চেপে বসা আঙুলের দিকে।

'বোকা নাকি?' হেনেসকে একাধারে বিস্মিত আর বিরক্ত দেখাচ্ছে। 'আপনার ধারণা, রিভলবার আর ম্যাচেটি এক জিনিস?' হেসে উঠল। 'এক জিনিস যে নয়, এই দেখুন তার প্রমাণ।' রিভলভার ধরা হাতটা আরও একটু লম্বা করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

রানাও ম্যাচেটি ছুঁড়ে মেরেছে, মেরেই স্যাঁৎ করে সরে গেছে। তবে তা না গেলেও কোন ক্ষতি হত না। ঘ্যাঁচ করে বীভৎস একটা শব্দ হলো, ম্যাচেটিটা হেনেসের বাম স্তনের নিচে ঢুকে গেছে। গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে ছুঁড়েছিল রানা, ফলার সবটুকুই ঢুকেছে। ক্লিক করে আরও একটা শব্দ হয়েছে, খালি চেম্বারে হ্যামার আঘাত করার শব্দ। কিন্তু গুলি না হওয়ায় হেনেস যতটা বিস্মিত, তারচেয়ে বেশি বিস্মিত ম্যাচেটিটা বুকে গাঁথা রয়েছে দেখে। হাতের রিভলভার আর ম্যাচেটি, পালা করে দুটোর দিকেই তাকাচ্ছে সে, তবে ম্যাচেটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকছে।

উল্টোটা ঘটছে। মরতে প্রচুর সময় নিচ্ছে হেনেস। ইতিমধ্যে আরও দু'বার রিভলভারের ট্রিগার টেনেছে সে। গুলি বেরোয়নি। বেরুলেও রানার গায়ে লাগত না, নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে ও।

ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল হেনেসের। রিভলভার ফেলে দিয়ে ম্যাচেটির হাতল ধরে টানছে সে। নিজের কাজে ব্যস্ত, রানার দিকে ভুলেও একবার তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত একটা ধরাশায়ী গাছের আড়ালে দাঁড়াবার পর টলমল করছে রানা। হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

ম্যাচেটিটা এমনভাবেই গেঁথেছে, দু'হাতে টানাটানি করেও এক চুল নড়াতে পারল না হেনেস। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। পড়ে যাবার সময় একটা হাত মাটিতে ঠেকিয়ে রাখল, ফলে পড়ল কাত হয়ে। বাংলা দ-এর মত হয়ে থাকল শরীরটা, এখনও ম্যাচেটি ধরে আছে, তবে টানতে পারছে না, মনে হচ্ছে হাত বুলাচ্ছে।

চোখ খোলার পর রানার সন্দেহ হলো, ও বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। মাথাটা ঘুরে ওঠায় শুয়ে পড়ে, এটুকু মনে আছে। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে গাছটার কাণ্ডের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। মনের গভীর থেকে কি যেন একটা খোঁচাচ্ছে ওকে। খুব জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়া দরকার, কিন্তু পড়ছে না।

বন্ধু মিগুয়েল বয়কট, তার স্ত্রী লুসি আর ওদের মেয়ে টুসির কথা মনে পড়ল। লন্ডনে ফিরে প্রথমে ওদের সঙ্গেই দেখা করতে হবে। এটা একটা কাজ বটে, কিন্তু এখুনি করার মত জরুরী নয়, সম্ভবও নয়।

এদিক ওদিক তাকাল রানা। কাজের কথাটা মনে পড়ছে না কেন? ওর কি স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে? দূরে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে কাণ্ড থেকে নেমে এগোল সেদিকে। ডায়নামো ডিকানডিয়া ওরফে রয় হেনেস কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে, বুকে একটা ম্যাচেটি গাঁথা। দৃশ্যটার মধ্যে পরিচিত বা স্মরণযোগ্য কি যেন আছে, অথচ ধরতে পারছে না।

তারপর রানা ভাবল, প্রফেসর বেলফোর্স কোথায়?

প্রফেসরের কথা যখন স্মরণ করতে পারছে, নিশ্চয়ই ওর স্মরণশক্তি লোপ পায়নি।

তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মারিয়ার কথা মনে পড়ল। কি সর্বনাশ! তাকে তো রানা সিনোটের নিচে গুহায় রেখে এসেছে! আর হেনেসকেও তো ও-ই খুন করেছে!

প্রথমে গর্ত থেকে কমপ্রেসর পার্টস বের করতে হবে। ডালপালা আর শাখা-প্রশাখার আবর্জনার ভেতর গর্তটা কোথাও লুকিয়ে আছে। তা থাকুক, খুঁজে বের করে নিতে পারবে ও। মারিয়া অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে, কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করা দরকার।

প্রফেসরকে আবার খুঁজে বের করল রানা। চোখ মিটমিট করে রানার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি। জ্ঞান ফিরে পেলেও, এত দুর্বল যে উঠে বসতে চেষ্টা করেও পারলেন না। 'উঠবেন না, যেমন শুয়ে আছেন তেমনি শুয়ে থাকুন। এখানে কেউ নেই যে আপনাকে মারতে আসবে। আমার অনেক কাজ…'

'হেনেস?' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর।

'নেই।'

'মারিয়া?'

'আমি তাকে আনতে যাচ্ছি—সিনোটের নিচে থেকে।' ওখান থেকে সরে এল রানা।

রানাকে দেখে অপলক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মারিয়া। কৃতজ্ঞতা উথলে উঠছে গোটা অস্তিত্ব থেকে, তবু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে মেয়েটা, আগের মত রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। রানা ঢালের ওপর উঠে সিধে হতে এক পা এক পা করে এগোল সে, গায়ে গা ঠেকতেও থামতে চাইছে না। রানাকে আলিঙ্গন করল মারিয়া, তা-ও ধীরেসুস্থে। তবে বাঁধনটা শক্ত। রানার মাস্ক খোলা মুখ আর কপাল থেকে আঙুলের ডগা দিয়ে চুল সরাল। তারপর চুমো খেলো ওর ঠোঁটে। মাত্র একবারই। ফিসফিস করে বলল, 'আপনি যা-ই ভাবুন, তাতে আমার বয়েই গেল!'

আড়ষ্ট ভাবটুকু কাটিয়ে উঠে হাসল রানা। 'ভাল একটা খবর

দিই—প্রফেসর বেলফোর্স বেঁচে আছেন।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ…'

গুহার পিছনের দেয়ালটার দিকে তাকাল রানা, সেটা জায়গা মত নামানোই আছে। 'চলুন, ওপরে উঠি। আপনার জন্যে স্কুবা গিয়ার এনেছি…'

'একটু দাঁড়ান,' বলল মারিয়া। 'আপনি আসছেন না দেখে কি ভেবেছি বলে নিই। ভেবেছি, আপনি যদি মারা যান, সেটা আমি অপরাধ বলে গণ্য করব, এবং যতদিন বাঁচব আপনাকে ক্ষমা করব না। তারপর ভেবেছি, আপনার সাহায্য ছাড়া কোনভাবে যদি সিনোটের ওপরে উঠতে পারি, এখানকার শত শত টন সোনার কথা কাউকে বলব না। বলতে পারেন, এ আমার এক ধরনের অভিমান।'

'আর কিছু ভাবেননি?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, আরও একটা কথা ভেবেছি—যদি আমাকে উদ্ধার করতে আসেন, আপনার যে-কোন ইচ্ছায় আমি সায় দেব।'

রানার মুখ সামান্য গরম হয়ে উঠল। 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অতি সাধারণ মেয়েরা এভাবে নিজেকে দান করতে চায়,' বলল রানা। 'মারিয়া, আপনি তাদের দলে, এ আমি মানতে রাজি নই।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝলে আমিও তা মানব কেন?' ভাব দেখে মনে হলো অপমানিত বোধ করছে মারিয়া। 'আমি নিজেকে দান করতে চাইছি না। বলতে চাইছি, এখানে যে সোনা আছে তা নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন আপনি; আমি কোন বাধা হব না।'

'ভুল বুঝেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই,' আন্তরিক সুরে বলল রানা। 'সোনার ব্যাপারে প্রফেসরের সঙ্গে আগেই আমার কথা হয়ে গেছে। মেক্সিকো সরকারকে সব কথাই জানানো হবে, তবে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে চুক্তি হবার পর। আমি অর্ধেক চাইব। আমার সেই অর্ধেক থেকে আপনিও ভাগ পাবেন, প্রফেসরও পাবেন, এমনকি আমার বন্ধুর স্ত্রী লুসিও পাবে— কে কি পরিমাণ পাবে সেটা পরে এক সময় বসে ঠিক করে নেব আমরা।'

'আমার ভাগেরটা আমি যদি দান করে দিই?'

'জানি, আপনি জাতিসংঘের কোন তহবিলে দান করতে চান। কোন সমস্যা নেই।'

'না, জাতিসংঘের কোন তহবিলে নয়,' বলল মারিয়া। 'তবে সে প্রসঙ্গ এখন থাক। চলুন, উঠি এবার।'

ওদের অপেক্ষায় সিনোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বব চ্যাপেল, সঙ্গে মেক্সিকো সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা বিশজন সৈনিক আর তিনজন মেজর। ক্যাম্প সাইটে পাঁচটা হেলিকপ্টার এসে নেমেছে। স্ট্রেচারে তুলে এরইমধ্যে প্রফেসর বেলফোর্সকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা 'কপ্টারে, সামরিক ডাক্তাররা সেখানে তাঁর শুশ্রূষা করছেন। সিনোটের কিনারায় আরও দুটো স্ট্রেচার আনা হয়েছে রানা ও মারিয়ার জন্যে।

পানির ওপর মাথা তুলে ভেলায় চড়তে যাচ্ছে ওরা, সিনোটের কিনারা থেকে আনন্দে হৈ-চৈ করে উঠল সৈনিকরা। চমকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। শোরগোলের মধ্যে চ্যাপেলের চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পেল ও, 'স্যার, আর কোন চিন্তা নেই, আমরা পৌঁছে গেছি!'

ভেলা সিনোটের কিনারায় ভিড়তে রানা আর মারিয়ার কথায় কেউ কান দিল না, ধরাধরি করে স্ট্রেচারে শুইয়ে ফেলা ওদেরকে। সৈনিকরা স্ট্রেচার তুলে নিয়ে ছুটছে, রানার স্ট্রেচারের সঙ্গে ছুটছে চ্যাপেলও। 'দুঃখিত, স্যার, সময় মত পৌঁছুতে পারিনি,' অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে সে। 'ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাই, স্যার। ভাগ্য ভাল যে হারিকেনের শুধু লেজটুকু ঝাপটা মেরেছিল। বাধ্য হয়ে মাঝপথে হেলিকপ্টার নামাতে হয়।'

'তোমরা কোত্থেকে আসছ, বব?' জানতে চাইল রানা।

'কাম্পেচি, ইউকাটানের উল্টোদিক থেকে, স্যার। আজ সকালে আমি এই ক্যাম্পের ওপর দিয়ে উড়ে গেছি···দেখি রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেছে। কাজেই মেক্সিকান আর্মিকে খবর দিলাম। ঝড়ের মধ্যে না পড়লে আরও চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে পৌঁছে যেতাম। স্যার, বাকি সবাই কোথায়? প্রফেসরকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখলাম না।'

'দুঃখিত, বব,' বলল রানা। 'আমাদের সবাই মারা গেছে।'

চ্যাপেল দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আবার ছুটে স্ট্রেচারের পাশে চলে এল। 'আর আর্টিফ্যাক্ট, স্যার?'

'সব আছে, বব। ডায়নামো ডিকানডিয়া কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। তুমি তার লাশ পেয়েছ?'

'শুধু তার লাশ নয়, ক্যাম্পের ভেতর থেকে একের পর এক লাশ বেরুচ্ছে, স্যার।'

ওদেরকে নিয়ে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। রানা আর মারিয়া স্ট্রেচারে উঠে বসল। ওদের মাঝখানে নিজের স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছেন প্রফেসর বেলফোর্স। 'কেমন লাগছে, প্রফেসর? এখন খানিকটা সুস্থ?' তাঁর সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মারিয়া।

প্রফেসর ক্ষীণ একটু হাসলেন। 'ভাল আছি বললে কিছুই বলা হয় না, মারিয়া,' বললেন তিনি। 'তোমাদেরকে ভাল থাকতে দেখে আমার এতই ভাল লাগছে, ইচ্ছে হচ্ছে আরও কিছুদিন বাঁচি। অন্তত আগামী মরশুমে তোমাকে নিয়ে রানা যখন আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার আর মন্দির আবিষ্কার করতে ফিরে আসবেন, তখন যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতাম, জীবনটা সার্থক হত। কিন্তু তা হবার নয়।'

হাত তুলে খোলা দরজা দিয়ে হেলিকপ্টারের বাইরেটা দেখাল রানা। 'মন্দিরটা আপনি দেখেননি, প্রফেসর?'

রানার হাত অনুসরণ করে বাইরে তাকালেন বেলফোর্স, ইয়াম চ্যাচ-এর মন্দিরটা দেখতে পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। 'ওহ্ গড!'

'আর ওই তিন মাসের কথা আপনি ভুলে যান, প্রফেসর,' অভিমানের

সুরে বলল মারিয়া। 'ডাক্তাররা সময় বেঁধে দিলেই মানুষ মরে না। বিধাতার অভিপ্রায় বলে একটা কথা আছে।'

প্রফেসর যে মৃত্যুভয়ে কাতর নন, সেটা বোঝা গেল রানার দিকে ফিরে সকৌতুকে হাসছেন দেখে। 'আপনি কি বলেন, রানা?'

'বিধাতার অভিপ্রায় সম্পর্কে? এ-ব্যাপারে কিছু বলা সত্যি কঠিন। দেখুন না, তিন মাস পর কেন, আজই তো আপনার মরে যাবার কথা ছিল। শুধু আপনারই বা বলি কেন, আমাদের তিনজনেরই মরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কই, মরলাম তো না। এরকম মিরাকল তো ঘটেই আমাদের জীবনে।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, সত্যিই আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে!' বলে এত জোরে হেসে উঠলেন প্রফেসর, মনেই হলো না যে তিনি আহত বা অসুস্থ।

— শেষ —